ILLUSIONS OF TRIUMPH: AN ARAB VIEW OF THE GULF WAR

মধ্যপ্রাচ্য

রাজনীতি যুদ্ধ বাস্তবতা

মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল

ভাষান্তর
আব্দুল মান্নান আজীজ

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল আরব বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি ও পর্যবেক্ষক। তিনি ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে প্রকাশিত নামকরা দৈনিক আল আহরাম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের-এর তিনি ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মরহুম প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের কাছেও তিনি ছিলেন খুবই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু ১৯৭৩ সালের আরব-ইসলায়েল যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট সাদাতের গৃহীত নীতির সাথে তিনি একমত হতে পারছিলেন না। উভয়ের মাঝে মতানৈক্য শুরু হয়, ফলশ্রুতিতে প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের নির্দেশে ১৯৮১ সালে তাকে গেস্থফতার হতে হয়। দুইমাস পর প্রেসিডেন্ট সাদাত ইন্তেকাল করেন এবং মি: হাইকেল কারামুক্ত হয়। এরপর ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক কলাম লেখা শুরু করেন।

এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির ওপর বেশকিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। illusions of Triumph: An Arab View of the Gulf War বইটি তার এ বিষয়ের ওপর সপ্তম বই, যা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের দৃষ্টিতে উপসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতি ও যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর লেখা বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম বই এটি। মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল তার বইয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধে আরবদের দ্বিধাভক্তি, ইরাকের বিরুদ্ধে মিত্র চোটের সামরিক হামলার পেছনের অন্তর্নিহিত কারণ, মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ে পশ্চিমা স্বার্থবাদী রাজনীতির সমীকরণ, আরব নেতাদের পারস্পারিক দ্বন্দ ও বোঝাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে তার কলম চালিয়েছেন। এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি উপসাগরীয় যুদ্ধনাটকের রহস্যভেদ করতে যথেষ্ঠ সচেষ্ট ছিলেন। লেখক নিজেই তার বইয়ের ভূমিকাতে উল্লেখ করেন-

> “১৯৯০ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ বিশ্ব পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে উপনীতি হয় যে, মার্কিন পরাশক্তি এককভাবে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলে। এসময় তাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ ছিল না। সোফিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি, পূর্ব ইউরোপ থেকে কমিউনিজমের অপমৃত্যুর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল একমাত্র সুপার পাওয়ার। এমন অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি

প্রতিদ্বন্দী প্রয়োজন ছিল। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম সেই প্রয়োজন পূরণ করেন। লেখক তার বই পরিচিতি অধ্যায়ের শেষ প্যারায় লিখেছেন, "বইটি আমি নিরপেক্ষভাবে লিখেছি এই দাবি আমি করছি না, তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও বিষয়কে তার নিজস্ব পটভূমি, সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বইটিতে উপসাগরীয় যুদ্ধের সব ক'টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এসব যুদ্ধ কেন সংঘটিত হলো, কে কীভাবে বিজয় লাভ করল, বিজয়ের ধরণ ও প্রকৃতি কী ছিল-এসব বিষয়ের প্রতিও যথেষ্ঠ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সবশেষে মধ্যপ্রাচ্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনি এই বইতে খুঁজে পাবেন।

আব্দুল মান্নান আজীজ
লেখক ও ইমাম

বই কেনার সামর্থ্য থাকলে বইটি কিনে পড়ুন

প্রাক কথন

ইরাক-কুয়েত সংকটের পটভূমি মাধ্যপ্রাচ্যে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধ হয় একটু ভিনরকম। এসব যুদ্ধ দ্বারা যারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা এ বিষয়টি খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে, ১৯৫৬ সালে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও ইসরায়েলের চক্রান্তে মিসরের সুয়েজ খালের উপর অবৈধ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আরববিশ্ব যে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তা স্মৃতির পাতা থেকে সহজে মুছে ফেলার নয়। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে আরব দুনিয়ার মাথায় যে কলংকের তিলক লাগে তা ১৯৭৩ সালে মিসর ও সিরিয়া মিলে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়। তারা প্রমাণ করে ইসরায়েল কোন অপরাজেয় শক্তি নয়। তবে ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের কারণে আমাদের অন্তরে কোন গর্বের অনুভূতির পরিবর্তে ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ, এ যুদ্ধের কারণে আরব দুনিয়া সুদূরপ্রসারী অন্তর্দ্বন্দে লিপ্ত হয়। এটা ছিল তাদের জন্য খুবই কঠিন সময়।

বাস্তবতার আলোকে দেখা যায় আরবর তো বটেই পৃথিবীর অন্য কোন দেশ ইতিপূর্বে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি, এই সংকট সৃষ্টি হওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত আরব সৈন্যরা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনায় লিপ্ত থাকে। অন্যদিকে অদূরে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুচকি হাসি হাসতে থাকে। এই প্রথমবার সে আমেরিকার বিরুদ্ধে ছিল নীরব। আমেরিকার কোন উদ্যোগের ব্যাপারে তার কোন আপত্তি ছিল না। ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের কারণে আরব বিশ্ব এমনভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয় যে, ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।যুদ্ধের কারণে আরবলীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কেবল তাই নয়; বরং প্রতিটি আরব বাসিন্দা নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত দেখতে পায়। আরবরা কেমন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে তা কেবল একটি ঘটনা দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব, মিসর ও সিরিয়ার সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর একটি দল সেসময় সৌদি আরবে নিয়োজিত ছিল।

১৮ই জানুয়ারী ১৯৯১ ইসরায়েলের উপর ইরাক প্রথম এস্কাড মিসাইল নিক্ষেপ করে। এ সংবাদ শুনে মিসর ও সিরিয়ার সৈন্যরা খুশিতে তাকবির দিতে থাকে। এটা ছিল তাদের আবেগ তাড়িত উল্লাস। পরে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যই

তারা এখানে একত্রিত হয়েছে। ভুলটা বুঝতে অবশ্য তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে মিসরের সাতজন আর অসংখ্য সিরিয়ান সৈন্যকে বিধি লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত করে চাকুরী হতে অব্যাহতি দিয়ে নিজ নিজ দেশে পাঠানো হয়। উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে ১৯৮৮'র পর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবীতে শান্তির সূর্য পূর্ব গগনে উদিত হতে শুরু করেছে। ১৯৮৮ সালে সোভিয়েতরা যখন আফগানিস্তান থেকে একতরফা সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় তখনই সর্বপ্রথম এই আশার সঞ্চার হয়। একই বছর আগষ্ট মাসে ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধ হয়। ১৯৮৯-এ পূর্ব ইউরোপে শান্তিপূণ বিপ্লব সংঘটনের পর শান্তি প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর ব্যাপারে দুই পরাশক্তির বিরোধ অনেকাংশে হ্রাস পায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী সরকারের পতনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপ একটি ইউনিয়ন গঠনের কাজ শুরু করে। পূর্ব ইউরোপের একটি বিরাট অংশ পশ্চিম ইউরোপের সাথে একভূমিতে হওয়ার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া একে অপরের দিকে সাহায্যের হাত প্রশস্ত করতে থাকে। এমনকি কম্বোডিয়ার ভয়ংকর ও নিরাশ পরিস্থিতিতেও আশার আলো দেখা দেয়। এসবের মধ্যে বিশ্ব শান্তির পূর্বাভাস। অপরদিকে আন্তর্জাতিক সম্পকের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। এতসব আশার মাত্রা যোগ হবার পরও অনেক পর্যবেক্ষকরা আশংকা করছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে আরেকবার যুদ্ধের কালো ছায়া নেমে আসছে। অথচ ইরাক-ইরান যুদ্ধ তখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকের ধারণায় এ অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। আশার আলো তখন তীব্র হয়ে ওঠে যখন ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের নেতা জনাব ইয়াসির আরাফাত নভেম্বর ৮৮-তে জাতিসংঘের জরুরি প্রস্তাবগুলি মেনে নেন। এসব প্রস্তাবসমূহের ভিতর আলোড়ন সৃষ্টিকারী সর্বাধিক বিতর্কিত ২৪২ নং প্রস্তাবটিও ছিল। প্রস্তাবটি ভিত্তিপ্রস্তরের কাজ করে। এর ফলে পশ্চিমারা ধরে নেয় পিএলও শান্তি আলোচনায় পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টিতে আগ্রহী। তবে এটা স্বতন্ত্র বিষয় যে পিএলও যেভাবে শান্তি আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করে আমেরিকার পক্ষ থেকে সেভাবে সাড়া পাওয়া যায়নি। শান্তি আলোচনায় যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয় তা নিরসনে আমেরিকা তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে বিশ্ব কূটনীতির মঞ্চ থেকে বিষয়টি পর্দার অন্তরালে চলে যায়।

১৯৯০- এর শুরুর দিক পর্যন্ত বিশ্ব শান্তির ব্যাপারে আশাবাদ অব্যাহত থাকে; কিন্তু ১৯৯০ এর বসন্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে অবস্থা ভিন্ন আকার ধারণ করে। পশ্চিমারা সাদ্দাম হোসেনের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা শুরু করে। অথচ, ইরাক পূর্ব থেকেই কুয়েতের তেল নীতির ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। ইতিমধ্যে সাদ্দাম হোসেন কয়েকবার প্রয়োজনে শক্তি প্রদর্শনের প্রদি ইঙ্গিত দেন, কিন্তু তাকে কোন কাজ হয়নি। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের গঠনের পশ্চিমাবিশ্ব নির্বাক হয়ে যায়, আরববিশ্বও হতবম্ব। এই ঘটনার মাত্র দু'দিন পূর্বে বগদাদে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছুটি নিয়ে নিজ দেশে চলে যান। সবকিছু স্বাভাবিক মনে হতে থাকে। তার অবর্তমানে বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটবে এমনটা কেউ কল্পনাও করেনি, এ কারণেই মূলত সবাই হতবম্ব হয়ে যায়। হামলার মাত্র একদিন পূর্বে আমেরিকান ও সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস্ বেকার ও এডওয়ার্ড শেওয়ার্ড নাডজে ভিলাদি অস্টাক - এ এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে জেমস বেকারের আগামী লক্ষ্যস্থল মঙ্গোলিয়া ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে মিস্টার নাডজের মস্কোয় ফেরার কথা। উভয় নেতা আগামী দিন কী হতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ তিমিরে। ইরাকি হামলার পর পরই জেমস বেকার মিঃ নাড়জের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন, যেন আরেক দফা বৈঠকে মিলিত হয়ে পরিস্থিতির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। বৈঠকে উপসাগরকে কেন্দ্র করে পরস্পর সাহায্যের হাত প্রশস্ত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সহিষ্ণু মনাভোব ছিল অনেকটা অনাকাঙ্ক্ষিক্ষত কারণ সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি সে সময় ছিল মারাত্মক চড়াই-উত্রাইয়ের শিকার।

মিঃ নাডজে ছিলেন তখন মিঃ গর্বাচেভের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পূর্ববর্তী সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আন্দ্রেয় গ্রামিকোর থেকে তিনি ছিলেন অনেকটা কর্তৃত্বসম্পন্ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হবে সে সম্পর্কে আগাম কিছু আঁচ করা ছিল খুব মুশকিল। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে ইরাককে তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে করা হতো। মিঃ নাড়জের কাছে এ বিষয়টি খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, কুয়েত দখলের মাধ্যমে সাদ্দাম হোসেন মধ্যপ্রাচ্যের তৃতীয় বৃহৎ তেলভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন একথা খুব ভাল করে জানত যে, সুবৃহৎ তেল ভাণ্ডারের উপর ইরাকি নিয়ন্ত্রণ

সম্পূর্ণ আমেরিকার স্বার্থবিরাধোঁ; কিন্তু তারপরও তারা চুপ ছিল। কারণ, তারা জানত এ ব্যাপারে মুখ খুললে আমেরিকার আশংকা আরও জোরদার হতে পারে। তাই যুদ্ধ চলাকালীন সময়টা সে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ভাবলক্ষণ দেখে পূর্বেই অনুমান করা সহজ ছিল, কুয়েতের উপর ইরাকি আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে উভয় সুপার পাওয়ার কোন প্রকার দ্বন্দ্ব বা বিরোধের ঝুঁকি নিতে যাবে না; বরং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থেকে তারা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর।

অনেক পর্যবেক্ষকও পরিষ্কার বলেই ফেলেছিলেন দুই পরাশক্তি মধ্যপ্রাচ্যের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঐকমত্য হয়ে কাজ করছে। এই সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন যে, ফ্রান্স, ইসরায়েল ও ইংল্যান্ড কর্তৃক সুয়েজ খাল দখলের পর ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি দিয়ে ওদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে দেয়। স্নায়ুযুদ্ধের যুগেও আরব দেশগুলির প্রতি তার অকুণ্ঠ সমর্থন অব্যাহত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্থাপিত শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পরও আরবদের প্রতি তার সমর্থন বলবৎ থাকে এবং তখনও আরবদের উপর তার সমর্থন পূর্ণ বলবৎ থাকে যখন আরবরা তাদের দেশ থেকে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের বের করে দেয়। এই পটভূমিতে সঙ্গত কারণেই ধারণা করা হচ্ছিল যে, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যায় ইরাককে সাহায্য না করলেও সে এ ব্যাপারে থাকবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ; কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এমনটি আদৌ হয়নি। অবিশ্বাস্য রকমভাবে দেশটি আমেরিকার পক্ষ নেওয়ায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত সমর্থনের সাথে আমেরিকান প্রস্তাবগুলি দ্রুত পাস হতে থাকে। যেসব আরব নেতারা ইরাকি আগ্রাসনের পর সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিঃ গর্বাচেভের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন তারা পর্যন্ত সোভিয়েত আচরণে খুবই আশ্চর্য হন। আসলে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১-এ প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে সাক্ষাতের সময় প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ অনুমান করে নিয়েছিলেন, আমেরিকা কী চায়। তিনি তার এক সাক্ষাৎ প্রার্থীকে বলেছিলেন, আমেরিকানরা আমাকে জানিয়েছে, যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক তারা যুদ্ধের জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে। ওদিকে প্রেসিডেন্ট বুশ গর্বাচেভের সাথে হেলসিংকি বৈঠকে মোটামুটি আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, উপসাগর অঞ্চলে তাদের সৈন্য প্রেরণ না করার প্রতিশ্রুতিতে তিনি অবিচল থাকবেন।

মিঃ গর্বাচেভের ধারণায় আফগানিস্তানে রাশিয়ান বাহিনীর পরাজয়ের পর পৃথিবীর আর কোন দেশে সোভিয়েত বাহিনী প্রেরণ না করাটাই হবে সমীচীন।

এদিকে মিঃ বুশও নিশ্চিত ছিলেন যে, আমেরিকান আগ্রাসন প্রতিহত করার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। উল্লেখ্য, হেলসিংক বৈঠকের পর উভয় নেতা একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন উক্ত সম্মেলনে তাঁরা হাত উঠিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তবে একাত্মতার এই বহিঃপ্রকাশ সমতার ভিত্তিতে ঘটেনি, কারণ মাত্র কিছুদিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার কাছে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য মোটামুটিভাবে প্রস্তুতির পালা চুকিয়ে ফেলেছিল। আমেরিকান উদ্যোগের প্রতি সোভিয়েত সমর্থনের ইঙ্গিত তখনও বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন নভেম্বর' ৯১-তে মিঃ জেমস বেকার ও মিঃ নাডজে মিলে জাতিসংঘের ৬৭৮ নং প্রস্তাব পাস করার জন্য প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যান। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল ইতিপূর্বে ইরাকের বিরুদ্ধে যেসব প্রস্তাব পাস করা হয়েছে সেগুলি বাস্তবায়নের পথকে নিষ্কন্টক করা এবং ইরাকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের এখতিয়ার অর্জন করা। মিঃ নাডজে প্রস্তাবের শাব্দিক পরিবর্তনে সমর্থ হলেও তার উদ্দেশ্যে কোনরূপ পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হন। তিনি মিঃ বেকারের কাছে "শক্তি প্রয়াগ" বাক্যের উপর অধিক জোর না দেওয়ার অনুরাধে জানিয়ে বলেন, এর পরিবর্তে সকল প্রয়াজেনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই কথাটি প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হাকে। মোটকথা সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকাকে ইরাকের উপর চড়াও হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে। ৬৭৮ নং প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল ৬৬০ নং প্রস্তাব বাস্তবায়নকে নিশ্চিত করা। এই প্রস্তাবে ইরাকের কাছে কুয়েত থেকে পূর্ণ। অপসারণ দাবী করা হয়। প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করার পর মিঃ নাডজে মিঃ বেকারকে লক্ষ্য করে বলেন, "আপনি-আমি এবং আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি আমরা সবাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত। আমরা সবাই এর উদ্দেশ্যের সাথেও একাত্মতা ঘোষণা করছি।"

ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ তারেক আজীজ যখন সেপ্টেম্বর ৯১ তে মিঃ গর্বাচেভের সাথে মস্কোয় সাক্ষাৎ করেন, তখনই সোভিয়েত ইউনিয়নের মনাভোব পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। কারণ, মিঃ আজীজ যে নরম সুরের আশা করেন মিঃ গর্বাচেভের কাছ থেকে তিনি তা পাননি! বরং তিনি গর্বাচেভের অনাকাঙ্কিত এক নতুন সুর লক্ষ্য করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সাথে আমেরিকার সুদূরপ্রসারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। একথাটি আমরা যেমন স্বীকার করি তেমনি

আপনাদেরও স্বীকার করে নেওয়া উচিত। আমরা আরও স্বীকার করি যে, আমেরিকার স্বার্থে ঘা পড়লে সে অবশ্যই শক্তি প্রয়াগ করবে। এ বিষয়ে আমরা এখন কিছুই করতে পারব না। আমেরিকা যদি ইরাকের উপর হামলা করে বসে তাহলে এই বিপদের দিনে কেউ আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবার সামর্থ্য রাখে না। তারেক আজীজ একথা শুনে বললেন, আমরা মনে করেছিলাম নীতিগতভাবে আপনারা আমাদের পক্ষাবলম্বন করবেন। এর উত্তরে মিঃ গর্বাচেভ বললেন আপনারা যা করেছেন তা আগ্রাসনই বলতে হয়।

এমতাবস্থায় আমরা কোনভাবেই আপনাদেরকে সমর্থন করতে পারি না। তবে আমরা আপনাদের সাহায্য করতে পারি একটি শর্তে তা হচ্ছে, কুয়েত থেকে সকল ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এ সময় ইরাকিরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যে, এই মুহূর্তে বিপদের দিনে কেউ তাদের পাশে নেই। আরববিশ্ব সহজেই অনুধাবন করে নেয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে আমেরিকা-সোভিয়েত সম্পর্কে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এ ইস্যুতে তারা একে অপরের সমর্থক। নতুন সম্পর্ক পারস্পরিক সাহায্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে এসব কিছু হঠাৎ করে হয়নি, আরবদের অনেক আগেই এই পরিবর্তন আঁচ করে নেওয়া উচিৎ ছিল। কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার অনেক পূর্বে পিএলও নেতা মিঃ ইয়াসির আরাফাত মিঃ গর্বাচেভের সাথে এক সাক্ষাতে ফিলিস্তিনে আমেরিকার বর্বরোচিত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করার পর এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। মিঃ গর্বাচেভ নারাজ হয়ে অনেকটা কর্কষ ভাষায় বলেন, আমি এবং মিঃ রিগ্যান পরস্পর পরস্পরের শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে একটি স্বচ্ছ ধারণায় উপনীত হয়েছি, আমরা জানি যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা পারস্পরিক কোন্দল আমাদের কারও জন্য কল্যাণ ডেকে আনবে না। অতএব আপনি আমাদের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করবেন না বলেই আমি আশা রাখি। আরবদের অনেক আগেই বাঝো উচিত ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন আগামীতে তাদের জন্য সাহায্যের হাত খুব একটা প্রসারিত করবে না। যদিও তারা কয়েক বছর ধরে এদিকে বারবার ইঙ্গিত দিয়ে আসছিল; কিন্তু আরবরা এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না, শেষে যখন সোভিয়েতরা অনমনীয় মনাভোব গ্রহণ করল তখন আরবদের জন্য এই বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না।।

১৯৮৯ সালে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত পেরোস্ত্রাইকা ও তৃতীয় বিশ্ব শীর্ষক সম্মেলনে ফিলিস্তিনী নেতা ও পপুলার ফ্রন্টের চেয়ারম্যান জর্জ হাবাশ ও অন্যান্য আরব নেতারা মারত্মক নিরাশ হন। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদও মিঃ গর্বাচেভের সাথে এক সাক্ষাতে খুবই নিরাশ হন। হাফেজ আল আসাদের পক্ষ থেকে ঐ বৈঠকে সাহায্যের আবেদন জানানো হলে মিঃ গর্বাচেভ নিতান্ত রসকষহীন ভাষায় উত্তর দেন, মধ্যপ্রাচ্যের ব্যপারে আমরা আর বেশি জড়াতে চাই না। এই উত্তর শোনার পর হাফেজ আল আসাদ আশাহত হৃদয় নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর তিনি আমেরিকার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করণের ব্যাপারে উদ্যোগী হন।

মিঃ আসাদের এই পরিবর্তনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি-চরিত্রই একমাত্র দায়ী। আসলে সিরিয়া সামরিক ক্ষেত্রে ইসরায়েলের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে চেয়েছিল, সোভিয়েতদের ভ্রষ্ট চরিত্রের কারণেই সিরিয়া উপসাগরীয় যুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তিত নীতি উপসাগরীয় যুদ্ধে বিরাট আলাড়েন সৃষ্টি করে।

অতীতের মত সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি পরাশক্তিসুলভ আচরণে অবিচল থাকত তাহলে উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলাফল অবশ্যই ভিন্নতর হতো। কল্পনাতীতভাবে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তড়িঘড়ি করে ইরাকের বিরুদ্ধে আনীত সকল প্রস্তাব পাস করে নেয়। তৃতীয় বিশ্ব ও জোটনিরপেক্ষ ভুক্ত দেশগুলোর ব্যাপারেও ইরাকের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ইরাককে অনেক আগেই বুঝে নেওয়া উচিত ছিল জাতিংঘের ব্যাপারে তার ধারণা অনেকটা সেকেলে হয়ে গেছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের (cold war) পর নিরাপত্তা পরিষদে পরাশক্তিদ্বয়ের মাঝে প্রস্তাব ভেটো করে দেওয়া নাটকের অবসান ঘটে। এ কারণেই ইরাক-ইরান যুদ্ধ অথবা আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদ যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। ইরাফল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের এই পরিবর্তিত রূপ বুঝতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

ইরাকি আগ্রাসনের পর জাতিসংঘ মিত্রশক্তির পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ ও আরবদের দ্বিধাবিভক্তি

কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার প্রথমদিন নিরাপত্তা পরিষদে ইরাকের বিরুদ্ধে জোরদার ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করে ৫৬০ নং প্রস্তাব পাস করা হয়। তারপর আগামী ১৭ সপ্তাহের মধ্যে তার বিরুদ্ধে আরও ১০টি প্রস্তাব পাস করা হয়। এসময় জাতিসংঘ মহাসচিব শংকিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, তাকে ভবিষ্যতে যেন এমন সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে স্মরণ না রাখা হয়, যে আমেরিকাকে সামরিক শক্তি ব্যবহার করার ব্যাপারে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছিল। অতএব তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এটা জাতিংঘের যুদ্ধ নয়। তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিতে আরও জানিয়ে দেন, আমেরিকান জেনারেল নরম্যান জাতিসংঘ বাহিনীর বিশেষ ইউনিফরম ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে আমেরিকা বিশ্বকে বরাবর বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এটা আমেরিকার একার যুদ্ধ নয়; বরং জাতিসংঘ আরোপিত যুদ্ধ। এ কারণে যারা উপসাগরীয় যুদ্ধে সামান্য সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেছে আমেরিকা তাদেরকেও মিত্র বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। এভাবে সে ২৮টি দেশের একটি সম্মিলিত মিত্রজোট গঠন করতে সক্ষম হয়।

মজার ব্যাপার হলো, ইরাকের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির পারস্পরিক স্বার্থ ছিল বিভিন্নমুখী। মধ্য আফ্রিকার একটি দেশ কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সেদেশের সেনা বাহিনীর একটি দল কায়রো এয়ারপার্টে পৌঁছার পর জনৈক সেনা অফিসারকে একজন মিসরীয় কর্মকর্তার সাথে গোপন আলাপের সময় বলতে শোনা যায় “আমাদের কিছু সাহায্য দরকার। শুনেছি আমেরিকা তার মিত্র দেশগুলির মাঝে সাহায্য বিতরণ করছে, সাহায্যের একটা অংশে আমরাও ভাগ বসাতে চাই।” কিন্তু আগাম ঘোষণা ছাড়াই যখন উক্ত দলটি সৌদি আরব পৌঁছে তখন তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় এ মুহূর্তে তাদের কোন প্রয়াজেন নেই। পরে আমেরিকার অনুরোধে সৌদি কর্মকর্তারা তাদের মত পরিবর্তন করে। আমেরিকার কার্যকলাপে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, বেশির বেশি দেশ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক এটাই ছিল তার একান্ত কাম্য।

আরেকটি মজার ঘটনা হলো, সেনেগাল মিত্রজোটে অংশগ্রহণের জন্য মাত্র এক ব্যাটালিয়ান সৈন্য পাঠায় অথচ এই যুদ্ধে তাদের সৈন্যরাই সব থেকে বেশি নিহত হয়। সেনেগালের সৈন্যরা এ যুদ্ধে মোটেই অংশগ্রহণ করেনি। মিত্র বাহিনী কর্তৃক কুয়েত স্বাধীন হওয়ার পর সেনেগাল বাহিনী পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার পথে একটি বিমান দুর্ঘটনায় তার ২০০ সৈন্য মারা যায়। মৃতের এই সংখ্যা ছিল সেনেগালী ব্যাটালিয়ানের আনুমানিক দুই তৃতীয়াংশ। তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারের আচরণকে আরববিশ্বে শ্রদ্ধার নজরে দেখা হয়নি।

২রা আগস্ট ১৯৯০ তিনি ওয়াশিংটনে উপস্থিত ছিলেন। উপসাগরের বিষয়ে অনমনীয় মনাভোব গ্রহণে প্রেসিডেন্ট বুশকে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেন। প্রেসিডেন্ট বুশ তো আগে ভাগেই ইরাকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। থ্যাচারের সহযোগিতা তাকে আরও উৎসাহী করে তোলে। কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার কারণে ফ্রান্সকে যথেষ্ট বিপাকে পড়তে হয়। এই হামলার পর আরব দুনিয়ার সাথে সম্পর্কে ভারসাম্য রক্ষা করা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। উদ্ভূত সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট মিতেরা তাঁর সাধ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যান; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন।

অবশেষে ফ্রান্স ইরাকের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেও মিত্র শক্তির সাথে সামরিক হামলায় অংশ নেয়। উল্লেখ্য, উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্স ছিল ইরাককে অস্ত্র সরবরাহকারী একটি বৃহৎ দেশ। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকি আগ্রাসনের ফলে গোটা পৃথিবী জুড়ে একটি আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কারণ তখন আরবরা ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত। যারা নিজেদেরকে এক জাতি মনে করত, এ যুদ্ধের কারণে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আরব লীগের সংবিধান অনুযায়ী সমস্ত আরব দেশ একটি প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ। অথচ আগ্রাসনের ফলে তারা পরস্পর বিরাধেী সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরব কমান্ডাররা আমেরিকানদের ইরাকি বাহিনীর দুর্বল দিক ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে। মিসরীয় বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল মুহাম্মাদ আলী বিলাল-এর অনুভূতি নিশ্চয়ই আশ্চর্য ধরনের হয়ে থাকবে। কারণ, তিনি ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় 'ফা' সেক্টরে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ

নিয়েছিলেন। এই উপদ্বীপটি ইরানের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

প্রসঙ্গত, কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার মাত্র দুইমাস পূর্ব পর্যন্ত মিঃ বিলাল ইরাকি সেনাপ্রধানের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসাবে ডিউটি পালন করেছেন। অথচ এখন তিনি সেই ইরাকি সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়তে ছিলেন বাধ্য। একসময় তিনি এই বাহিনীর জন্য দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করেছেন। আর আজ তারই বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য রণসজ্জায় এগিয়ে এসেছেন। শুরুতে তার ভাষ্য ছিল মিসরীয় বাহিনীর আগমন সৌদি ডিফেন্সকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ঘটেছে; কিন্তু আমেরিকান আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর মিসর তার দেওয়া ভাষ্যের উপর টিকে থাকতে সক্ষম হয়নি।

বহুল আলোচিত ইরাকের রিপাবলিকান গার্ড

উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকি রিপাবলিকান গার্ড-এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। এই বাহিনী প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়; কিন্তু পরে তাদের অন্য উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। ইরাক-ইরান যুদ্ধে তারা আগ্রাসী বাহিনীর ভূমিকায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। তবে তাদের পেশাগত যোগ্যতা আমেরিকান পর্যবেক্ষকদের বাড়াবাড়ির তুলনায় ছিল যথেষ্ট কম। আমেরিকানরা তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রচার করে। পাশ্চাত্যে রিপাবলিকান গার্ডকে একটি আতংক হিসাবে প্রচার করা হয়। তাদের ব্যাপারে এতাটো অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেওয়া হয় যে, অধিকাংশের ধারণায় এই গার্ডকে হিটলারের বিশ্ব বিখ্যাত সাঁজোয়া বহরের সমপর্যায়ের মনে করা হয়। এই অতিরঞ্জনের ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, ইরাকি বাহিনীকে অত্যন্ত শক্তিশালী বাহিনী মনে করা হয়। অথচ ইরাকি বাহিনীর এখন আর কিছুই গোপন নেই। ইরাকের সমরশক্তি সম্পর্কেও এখন আর কোন কিছু গোপন রইল না। কারণ, একদিকে মিসরীয়রা ছিল তাদের সমর দক্ষতা সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল, অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্স তাদের সরবরাহকৃত সকল সমরাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ছিল পরিজ্ঞাত। এসব বিশদ বিবরণ যুদ্ধের সময় ছিল আমেরিকার নখদর্পণে। মিসরের সামরিক বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা ফিল্ড মার্শাল আব্দুল হালীম আবু গাযালার মতে ইরাকি ক্ষেপণাস্ত্রের মান ও ধ্বংসাত্মক যোগ্যতা সম্পর্কে খুবই অত্যুক্তির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। মিসর বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি হোসনী মোবারক বলেন, আমরা ইরাকি পাইলটদের যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত। কারণ, আমরাই তাদের কিছু সংখ্যককে ট্রেনিং দিয়েছি। আমি একজন পাইলট ও চীফ ইন্সট্রাক্টরর হিসাবে জানি ইরাকি পাইলটরা যোগ্য নয়।

উপসাগরীয় যুদ্ধে আরব জনগণের প্রতিক্রিয়া

ইরাক-কুয়েত সমস্যা চলাকালীন সময় অধিকাংশ আরব দেশের রাজধানীতে ইরাকের পক্ষে ও আমেরিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। ডিসেম্বর ১৯৯০-এ লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলীতে পাঁচ লক্ষ মানুষ কর্ণেল মুয়াম্মার কাজাফীর (গাদ্দাফী) নেতৃত্বে একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ব্যতিক্রমধর্মী কিছু রসাত্মক ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসময় শুনতে পাওয়া যায়। যেমন আলজেরিয়ার ফাতিমা বিনতে সাইয়েদ তাঁর নবজাতকে নাম 'এস্কাড' রাখেন কারণ ইরাক যখন ইসরায়েলের উপর প্রথম এস্কাড মিসাইল নিক্ষেপ করে ফাতিমার নবজাতকটি ঠিক তখনই ভূমিষ্ঠ হয়। তাই তার নাম এস্কাড রাখা হয়, পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আদালত কর্তৃপক্ষ তাঁকে এই নাম রাখার অনুমতি না দিলে তিনি তার নাম সাদ্দাম রাখেন।

আরব নেতারা আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার

পশ্চিমারা আরব জনগণের উল্লিখিত অনুভূতির কথা জানত, তারা ছিল উৎকণ্ঠিত। ফ্রান্স কর্তৃক একটি গানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যার প্রথম কলিগুলো ছিল সাদ্দাম ও সাদ্দাম...। বিবিসি'র আরব শ্রোতারা এসময় এমন সব গান শোনার আগ্রহ প্রকাশ করে যেসব গানে যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশ্চাত্য সরকার প্রধানদের একথা খুব ভাল করে জানা ছিল যে, ইরাক ও পিএলওর মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তারা শংকিত ছিল এই ভেবে যে, উভয়ে যদি পশ্চিমা দেশগুলিতে চোরাগোপ্তা বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে শুরু করে তাহলে ইরাকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে নিজ নিজ দেশের জনগণের সমর্থন পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে; কিন্তু তাদের এই শংকা ভুল প্রমাণিত হয়। কোন পাশ্চাত্য দেশে পিএলওর পক্ষ থেকে এধরনের কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দৃষ্টিগোচর হয়নি। পিএলওর ধারণায় ইরাক নিজেই এমন শক্তিশালী যে, যুদ্ধের শুরুতেই সে কেল্লাফতে করার যোগ্যতা রাখে। দ্বিতীয়তঃ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশ্রয় নিলে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে তাদের বিভিন্ন গ্রুপ যে সাহায্য পেয়ে আসছিল তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। সৌদি আরবের তায়েফে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কুয়েত সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সকল কিছুই ছিল। কারণ কুয়েতীরা বহির্বিশ্বেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল, কুয়েতের উপর ইরাকি আগ্রাসনের পূর্ব হতেই কুয়েত ফিলিস্তিনী দল-উপদলগুলিকে মোটা অংকের আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে আসছিল। যাতে তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে।

ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর ফিলিস্তিনীরা প্রবাসী কুয়েত সরকারের কাছ থেকে পূর্বের ন্যায় সাহায্য ঠিকই পেয়ে আসছিল তবে তা ছিল নিম্নরূপ নির্দেশের সাথে, এই যুদ্ধের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই'- তোমাদের সময় পরে আসবে', ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যখন পুনরায় সংগ্রাম শুরু করা হবে তখন তোমাদের সমস্যার ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা হবে এই আর্থিক সাহায্য গ্রহণ কর আর নিজেদের ইসরায়েলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা' ইত্যাদি ইত্যাদি। ফিলিস্তিনী গ্রুপগুলির বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র খুবই কার্যকর ছিল। কারণ কুয়েতীদের আর্থিক সহযোগিতা ও নির্দেশ দুটোই তারা এক সাথে

গ্রহণ করছিল। ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের যেসব দলগুলি সিরিয়ায় ছিল আশ্রিত তাদেরকে কীভাবে ঠেকারনা যায় সেপথ আমেরিকানদের সিরিয়ানরাই বাতলে দেয়। ফিলিস্তিনী উগ্রপন্থী গ্রুপের নেতা আবু নেদালকে সৌদি আরবে অফিস খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। এই গ্রুপের হেডকোয়ার্টার বাগদাদে অবস্থিত। ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের উন্নতির লক্ষ্যে এই গ্রুপকে সৌদি আরবে অফিস খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। সৌদিরা এখনও যে ফিলিস্তিনীদের সাথে আছে সে ব্যাপারে আবু নেদালকে আশ্বস্ত করাই ছিল এর পিছনে মূল কারণ। সৌদিদের এই কার্যকলাপ ছিল অনেকটা পরস্পর বিরাধেী। পশ্চিমারা এই গ্রুপটিকে একটি সন্ত্রাসবাদী দল মনে করে। অপরদিকে আরবরা তাদেরকে ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রামের একটি মিলিশিয়া দল হিসাবেই জ্ঞান করে। উপসাগরীয় যুদ্ধে আরববিশ্ব অনিশ্চয়তার সাগরে হাডুডুবু খেতে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আজব ধরনের অনুমান করা হতে থাকে। যুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত কর্নেল কাফফী মনে করতেন এটা আমেরিকা-ইরাকের সাজানো নাটক।

১৯শে আগস্ট ১৯৯০ আলজেরিয়ার রাজধানী আলজাঝিরায় সাজলী বিন জাদিদের সাথে এক সাক্ষাতে গাদ্দাফী বলেন, এটা একটি ষড়যন্ত্র মাত্র। আমেরিকানরা সর্বদাই মধ্যপ্রাচ্যে ঘাঁটি তৈরী করতে ছিল উদগ্রীব। ইরাক-আমেরিকা মিলেই এই ষড়যন্ত্র তৈরী করেছে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অনুমতি নিয়েই আমেরিকা তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়। পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মীর্জা আসলাম বেগও এ ধরনের একটি পরস্পর বিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। একদিকে তিনি সেনাবাহিনীর একটি ম্যাকনহিজড ব্রিগেড সৌদি আরবে প্রেরণ করেন, অপরদিকে তিনি আমেরিকাকে দোষারাপে করে বলেন, সে ইরাকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। উপসাগরীয় সমস্যার ক্ষেত্রে মীর্জা আসলাম বেগই যে কেবল দু'মুখো নীতি অনুসরণ করে চলছিলেন তাই নয়; বরং বলা চলে পুরো মুসলিম বিশ্ববুদ্ধি-বিবেচনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বসেছিল। এসময় পরিস্থিতি ছিল এমন যে, বিবৃতি প্রথমে দেওয়া হচ্ছিল আর ভাবা হচ্ছিল পরে। মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক সর্বদা নিজেকে বাস্তববাদী মনে করেন। একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর সৃষ্ট পরিস্থিতিকে সুনজরে দেখেননি কিন্তু সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তার ধারণায় যুদ্ধের ফলাফল ছিল খুবই পরিষ্কার। ইরাকের পরাজয় নিশ্চিত, তিনি মিসরকে বিজয়ীদের কাতারে শামিল দেখতে

চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট বুশ মিসরের সাতশ' কোটি ডলার ঋণ মাফ করে দেন। ফলে হোসনী মোবারক নিজ জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ মিসরের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। পরিস্থিতির নির্মম পরিহাস দেখুন, কয়েকটি তেলসমৃদ্ধ দেশ, জার্মানি ও জাপান মিলে মিসরের সাতশ' কোটি ডলার ঋণ আমেরিকাকে আদায় করে দেয়।

উপসাগরীয় যুদ্ধে আরব দুনিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলি যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে কালাতিপাত করে তা কারো অজানা নয়। তবে এক্ষেত্রে কুয়েতবাসির উৎকণ্ঠাকে অনুধাবন করা সহজসাধ্য নয়। পহেলা আগস্ট ১৯৯১ এর রাত্রে শোয়ার আগে কুয়েতবাসিরা কল্পনাও করেনি যে তাদের মাতৃভূমিকে জবরদখল করে নেয়া হবে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্বচক্ষে নিজেদের মাতৃভূমির পথে পথে ইরাকি ট্যাংকবহর ঘোরাফেরা করতে দেখলো।

ইরাকি আগ্রাসনে কুয়েতিদের প্রতিক্রিয়া

কুয়েত দখলকারী ইরাকি সেনাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিলে, কুয়েতের জনগণ তাদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানাবে। কারণ, তাদের ধারণায় কুয়েত ইরাকেরই অংশ। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ তাদের পৃথক করে দিয়েছে। কুয়েতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতাসীন রাজপরিবারের ক্ষমতা সীমিতকরণ নিয়ে কুয়েতি জনগণের পক্ষ থেকে বারবার দাবি উত্থাপিত হয়েছে। এই পটভূমিতেও ইরাকি বাহিনী মনে করেছিলো কুয়েতি জনগণ এই হামলাকে তাদের স্বাধীনতার সমতুল্য মনে করবে। এবং তাদেরকে নিজেদের পরিত্রাণদাতা মনে করবে। ইরাকিদের আশার গুড়ে বালি, কুয়েতি জনগণের বিমর্ষ মলিন চেহারা বলে দিয়েছে এই হামলায় তারা মোটেই সন্তুষ্ট নয়।এই হামলার কারণে কোনো কুয়েতির চেহারায় খুশীর রেখা ফুটে উঠেনি। কুয়েতে অবস্থানরত এশিয়ান কর্মচারীরাও ইরাকি হামলাকে স্বাগত জানায়নি। মোটা অংকের বেতনের কারণে কুয়েত ছিলো তাদের স্বর্গরাজ্য। ইরাকি হামলার কারণে তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যায়। আর কুয়েতি জনগণ! তারা ছিলো একটি উন্নত দেশের সচ্ছল নাগরিক। ইরাকি হামলার ফলে তাদের আনন্দিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না তাই ইরাকি বাহিনিকে স্বাগত জানানোর প্রশ্নই এখানে অবান্তর। কুয়েতিদের ব্যাপারে ইরাকিদের সকল ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়। তবে হ্যাঁ, কুয়েতের অস্ত্রধারী শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের ভরাকি হামলায় আনন্দিত হওয়ার কথা; কিন্তু এমনটি হয়নি। কারণ, সাদ্দাম হোসেইনকে শিয়াদের 'দাওয়াত' নামক বিরোধী দলটিকে নির্মমভাবে দমন করেন। মোটকথা ইরাকি দখলদার বাহিনী প্রথমে মারাত্মক চোট পায় কুয়েতিদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে। ইরাকি সেনারা তো ভেবেছিলো কুযেতি জনগণ তাদের হামলাকে নবজেদের স্বাধীনতা ও ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ মনে করবে। অপরদিকে কুয়েতিরা ইরাকি হামলায় দারুণভাবে মর্মাহত হয়। কারণ ইরাকিরা ছিলো একদিকে মুসলমান অপরদিকে তাদের সমগোত্রীয় আরব ভাই। ইরাকি হামলার সময় রাজপরিবারের জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর মেয়ে একজন ইরাকি অফিসারকে তাদের গুদামের চাবি দিয়ে দেয়। এই গুদামে দশলাখ কুয়েতি দিনারেরও অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ ছিলো। তার ভায়ষায় ইরাকিদের দুশমন মনে করা আমার জন্য ছিলো খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিলো তারা খুবই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত।

কুয়েতিরা দীর্ঘ সময় ধরে ইরাকিদের ব্যাপারে দোটানায় থাকেনি। তাই ইরাকি আগ্রাসনের পরপরই প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। ৬ই সেপ্টেম্বর প্রবাসী কুয়েত সরকারের পক্ষ থেকে এক ফরমানে বলা হয়, কুয়েতিরা যেনো ইরাকিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়। নয়তো তারা কুয়েতিদের ধনসম্পদ লুট ও জনগণের উপর অত্যাচার করার সুযোগ পাবে। প্রবাসী সরকারের এই ফরমান যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অক্টোবরের শেষে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কুয়েত কংগ্রেস - এর মিটিংয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা কুয়েতি জনগণকে ইরাকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ না হওয়ায় সাবাহ পরিবারের নীতিকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। ইরাকি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হযেছিলো তারা যেনো কুয়েতি জনগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। শুরুতে এই নির্দেশ মোতাবিক কাজ করা হয় ; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যো অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়। ইরাকি সেনারা প্রথমে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দেয় অতঃপর লুটপাট শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ইরাকি বাহিনী কুয়েতকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে শুরু করে। নিঃসন্দেহে একাধারে কয়েকমাস কুয়েতবাসি নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভিতর কালাতিপাত করে।

ইরাকি হামলার পূর্বে যেসব কুয়েতি পুঁজিপতিরা বিভিন্ন দেশে অবসর কাটাচ্ছিলো তারাও এই হামলার কারণে ভীষণ বিপাকে পড়ে। তাদের কাছে মনে হয় ইরাকি আগ্রাসনের কারণে তারা হঠাৎ করে গরীব হয়ে গেছে। এ সময় পশ্চিমা ব্যাংকগুলি কুয়েতি দিনারসহ সকল আরব কারেন্সি গ্রহণ করতে অস্বীকার জানায়। বিভিন্ন শপিং সেন্টারে নোটিসবোর্ড টানিয়ে দেয়া হয় যে, কুয়েতিচেক বা ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করা হবে না। ইরাকি হামলার কারণে কুয়েতি দিনারের মারাত্মক অবমূল্যায়ন শুরু হয়। হামলার পূর্বে ১ দিনারে চারটি আমেরিকান ডলার পাওয়া যেতো। আর হামলার পর ১টি আমেরিকান ডলারের পরিবর্তে পাঁচটি দিনার দিতে হতো। বিদেশে অবস্থানরত কুয়েতিদের জন্য হোটেল ভাড়া পরিশোধ করার আর সামর্থ্য রইলো না। কুয়েত খুবই ধনী দেশ। উপসাগরীয় অঞ্চলে তার যথেষ্ট সম্পদে অপচয় করা হয়েছে। ইরাকি দখলদারির সময় সৌদি আরবে প্রবাসী কুয়েতি সরকার সৌদি সরকারকে ৩৫'শ কোটি ডলার প্রদান করে।

যুদ্ধকালীন সময় আরব দেশগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ইউরোপের বিভিন্ন ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়। আরব ব্যাংক সমিতির ভাষ্য অনুযায়ী ইরাকি হামলার পর

মাত্র চারদিনের ভিতর ৯'শ কোটি ডলার পশ্চিমা ব্যাংকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ এই পরিমাণ দাঁড়ায় ২২শ' কোটি ডলার। তবে ধারণা করা হয়, আসল পরিমাণ এর থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি হবে। কারণ লন্ডন, নিউইয়র্ক ও প্যারিসে অবস্থানরত কুয়েতি পুঁজিপতিরা তড়িঘড়ি করে তাদের অর্থ সুইস ব্যাংকগুলিতে জমা করতে শুরু করে। তারা শংকিত ছিলেন এই ভেবে যে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যদি কুয়েতিদের অর্থসম্পদ আটক করার নির্দেশ জারি করে, তাহলে তাদের সকল সম্পদ পানিতে ডুবে না যায়। কারেন্সি স্থানান্তরের এই প্রক্রিয়ার ফলে কুয়েতি দিনারের গুরুত্ব কমে যায়।

কারেন্সী স্থানান্তরের এই প্রক্রিয়ার ফলে কুয়েতী দিনারের গুরুত্ব কমে যায়। সয়লাব আকারে কুয়েতি অর্থ সুইস ব্যাংকগুলির দিকে ছিল ধাবমান। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে তাদেরকে অপরাগ মনে হয়। জনৈক প্রসিদ্ধ কুয়েতি পুঁজিপতি ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার নিয়ে একটি সুইস ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে যখন মোটা অংকের সুদ দাবি করেন তখন তাকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আপপনাকে সাধারণ হারের থেকেও কম সুদ দেওয়া হবে। ইচ্ছা হলে অর্থ জমা করাতে পারেন অন্যথায় আপনার অর্থ আপনি নিয়ে যান। আপনার অর্থের আমাদের কোন প্রয়াজেন নেই। উক্ত পুঁজিপতি এই উত্তর শ্রবণে স্তম্ভিত না হয়ে পারেননি। কারণ মাত্র ১ মাস পূর্বে যদি মোটা অংকের এই অর্থ তিনি এই ব্যাংকে জমা করাতে আসতেন তাহলে তাঁকে তোয়াজের অন্ত থাকত না।

উপসাগরীয় যুদ্ধে কুয়েতিরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমনি অন্যান্য আরব দেশগুলিও এর কারণে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে অনেক আরব অধিবাসী এমন ছিলেন যাদের আচরণে কোন পরিবর্তন আসেনি। সৌদি আরবের জনৈক পুঁজিপতি কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার দ্বিতীয় রাতে ৮০ লক্ষ পাউন্ড জুয়া খেলতে গেয়ে হেরে যান, অন্যান্য কিছু আরব ধনকুবের এ ধরনের বিভিন্ন ভাগে বিলাসিতায় জড়িয়ে থাকেন। অন্যদিকে সৌদি বাদশাহ ফাহদ ইবনে আব্দুল আজীজ সৌদি আরবে মার্কিন বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে, রাজপরিবার যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হয়। পশ্চিমাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ একথা ঠিক যে ইরাক-কুয়েত

সংকটকালে আরব বিশ্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তবে সৌদি আরবে মার্কিন সেনা উপস্থিতির কারণে আরবদের এই দ্বিধাবিভক্তি গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমাদের ধারণা ছিল সম্মিলিত বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত আরব দেশগুলি সৌদি আরবে আমেরিকান সেনা উপস্থিতি মেনে নেবে। পবিত্র কাবা, মসজিদে নববি, রওজায়ে রসূল (সাঃ) ও বিভিন্ন পবিত্র স্থানসমূহ সম্পর্কে আরবদের আবেগ-অনুভূতি উপলব্ধি করতে পশ্চিমারা মারাত্মক ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। পবিত্র স্থানসমূহে আমেরিকান সৈন্যদের উপস্থিতিতে আরবদের নিকট ছিল সেসব স্থানসমূহের অবমাননার শামিল। আমেরিকান ফৌজদের উদ্ভট উপহাস আর বিবেকহীন চুটকি পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে ছেড়েছে। আমেরিকান টিভি চ্যানেল সিএনএন একটি হাওয়াই জাহাজের দৃশ্য দেখায়। ঐ জাহাজে ছিল অনেকগুলি ক্ষেপণাস্ত্র রক্ষিত। একটিতে লেখা ছিল "তোমার খোদার কাছে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করা। সে যদি উত্তর না দেয় তাহলে যীশুকে স্মরণ করা।" আরেকটিতে লেখা ছিল 'সাহায্যের জন্য তোমরা আল্লাহকে ডাকো, সে উত্তর না দিলে শারোজ (আমেরিকান কমান্ডার) - কোফকে ডাকো।' (আল্লাহ হেফাজত করুন)

আরবরা তখনও তীব্র প্রতিবাদ জানায় যখন হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর কারবালায় অবস্থিত মাজারের পাশে যুদ্ধ শুরু হয়। এসব পবিত্রস্থানে পশ্চিমা সেনাদের উপস্থিতি আরবদের কাছে সবসময় অবমাননাকর মনে হয়েছে। মোটকথা ইরাকি হামলা আরবদের দারুণ আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত করেছে। মিসর চেয়েছিল এই যুদ্ধে সে একটি বৃহৎ আকারের কার্যকর ভূমিকা পালনকারী সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে। অপরদিকে সৌদি আরবের ধারণায় মিসরের এক ব্রিগেড সৈন্য এই যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং মিসরের সৈন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা নিয়ে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আমেরিকান কামান্ডার জেনারেল নরম্যান শারোজা কোফ-এর মধ্যস্থতায় ৩৫ হাজার সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আসলে জেনারেল নরম্যান চাচ্ছিলেন কুয়েতের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের সময় আরব সৈন্যরাই প্রথমে কুয়েতে প্রবেশ করুক। সৌদি আরবের ভাব-লক্ষণ দেখে মরক্কোর প্রেসিডেন্ট শাহ হাছান মাত্র ১ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি পরিষ্কার ভাষায় আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমাদের বন্ধুরা এর বেশি সৈন্য চায় না।

উপসাগরীয় যুদ্ধে প্রত্যেকেই আগাম জল্পনা-কল্পনায় ব্যতিব্যস্ত ছিল। তবে তাদের অধিকাংশের ধারণা ছিল ভুল। আমেরিকানরা মনে করেছিল কুয়েতকে যদি ইরাকি দখলমুক্ত করা যায় তাহলে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম সরকারের পতন অবশ্যাম্ভাবী। সে অনুযায়ী তারা আগে ভাগেই প্লান করে রেখেছিল।

আমেরিকা মনে করেছিল সাদ্দামের পতনের পর ক্ষমতাসীন বাথপার্টি থেকেই কিছু লোক নিয়ে নতুন সরকার গঠন করা হবে। সম্ভাব্য নতুন সরকার গঠনের সময় কাদেরকে নিয়েগে দেওয়া যায় সে বিষয়টি বিবেচনার দায়িত্ব সৌদি আরবকে দেওয়া হয়। সৌদিরা যাদের মনানৗত করে তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি অত্র অঞ্চলে অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাত ছিলেন। আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর সাথে তার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নতুন সরকার গঠনের এই আগাম জল্পনা-কল্পনাও ছিল এক ধরনের আহাম্মকী। এই আহাম্মকীতে ছিল সবাই শরীক। তবে এক্ষেত্রে ইরাক ছিল সকলের অগ্রগামী। এই যুদ্ধে সে মারাত্মক মারাত্মক ভুলের স্বাক্ষর রেখেছে। উপসাগরীয় সংকটের এটাও ছিল একটা প্রধান দিক যে, সংকট নিষ্পত্তির জন্য যদি পারস্পরিক আলাপ-আলাচেনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হতো তবে আশা করা যায় সহজেই সংকটটির নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল।

ইরাক-কুয়েত সংঘাতের নেপথ্যে

ইরাক এমন একটি দেশ যার রয়েছে প্রাচীন ইতিহাস, তাছাড়া এ অঞ্চলের সে ছিল একটি বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ। সামরিক দিক থেকেও সেছিল একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। এসব কারণে সে নিজেকে আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার জ্ঞান করত। তারপরও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল। এসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পিছনে হাত ছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের। তারা এসব প্রতিবন্ধকতা সে সময় সৃষ্টি করে যখন জাতিসংঘের মাতব্বরিতে ইরাককে তাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হয়। সাবাহ্ পরিবারের বিশেষ অবদানের কারণে ইংল্যান্ড কুয়েতকে তাদের হাতে অর্পণ করে। ফলে, ইরাক কুয়েতের সমুদ্র বন্দর থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে যায়। ইরাকিরা দূর থেকে সমুদ্র দেখতে পারে; কিন্তু তার থেকে উপকৃত হওয়ার কোন সুযাগে তাদের নেই। শাতিল আরবের জলপ্রণালী গভীর পানিতে অবস্থিত। এই জলপ্রণালী কোন সমুদ্র বন্দরের বিকল্প হতে পারে না। শাতিল আরব প্রণালীর অথৈ পানিতে একটি সমুদ্র বন্দর যদিও ছিল; কিন্তু পার্শ্ববর্তী দুইটি কুয়েতি দ্বীপের কারণে তাকে উন্নত করা ইরাকিদের পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিল না।

স্বাধীনতা লাভের পর ইরাক তার এই সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালায়। তেল সরবরাহের জন্য সে সিরিয়ার মধ্য দিয়ে পাইপ লাইন বিছানোর প্লান করে। রামোন উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছানো ছিল তার আসল উদ্দেশ্য; কিন্তু সিরীয় সরকারের আগ্রহহীনতার কারণে এমনটি সম্ভব হয়নি। অতঃপর আটশ' কোটি ডলার খরচ করে তুর্কীর উপর দিয়ে ইরাক একটি পাইপ লাইন বিছাতে সক্ষম হয়, অপরটি বিছান হয় সৌদি আরবের উপর দিয়ে। এভাবে সে লোহিত সাগর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ইরাকের এতসব যোগাড়যন্ত্র সম্পূর্ণ বিফলে যায়। কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার সময় এসব পাইপ লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়। সমুদ্র বন্দর ছিল ইরাকের প্রয়োজন। তা মেটাতে ইরাকের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছার প্রচেষ্টাও ছিল ইরাকি আগ্রাসনের আরেকটি কারণ। অন্যদিকে ইরাকের সাথে কুয়েতের ব্যবহারও সন্তোষজনক ছিল না। কুয়েত কর্তৃক তেলের মূল্য হ্রাস করার কারণে ইরাকের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। ইরাক, কুয়েত এবং আরব আমিরাতকে তেলের উৎপাদন হ্রাস করতে বলে; কিন্তু তারা ইরাকের প্রস্তাবে সম্মতি জানায়নি। ইরাক শাতিল আরব সংলগ্ন কুয়েতের দু'টি দ্বীপের লীজ নিতে চায়। কুয়েত এই প্রস্তাবেও সম্মত হয়নি। ঋণ

মাফ সংক্রান্ত কুয়েতকে দেওয়া ইরাকি দরখাস্তও কুয়েত অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ইরানের সাথে যুদ্ধের সময় ইরাক কুয়েতের কাছ থেকে এই ঋণ গ্রহণ করেছিল। সুতরাং ইরাক মনে করে কুয়েতের অনমনীয় মনোভাবের পিছনে মার্কিন আশীর্বাদ সক্রিয়। সে ইরাককে আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার দেখতে চায় না। এসব কারণে ইরাক কুয়েতের উপর হামলা করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়। যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে ইরাকের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়। যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক প্রতিটি দেশের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করা অবশ্যই জরুরি। ১. যুদ্ধ করতে আগ্রহী দেশের জনগণকে দৈহিক কুরবানির জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। ২. যে ইস্যুকে ভিত্তি করে সে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে সে ইস্যুর পক্ষে ঐতিহাসিক ও আইনগত প্রমাণাদি মওজুদ থাকতে হবে। ৩. এ যুদ্ধে বিজয়ের সম্ভাবনা খুবই স্পষ্ট হতে হবে।

ইরাক যদি পুরে কুয়েতকে গ্রাস না করে প্রয়াজেনীয় অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করত তাহলে অবস্থা অন্যরূপ ধারণা করত; কিন্তু সাদ্দাম হোসেন-এর গৃহীত উদ্যোগের ব্যাপারে বিশ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তার ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়। তার ধারণায় আরবরা কোন অবস্থাতেই আমেরিকান সেনাদের নিজেদের ভূখণ্ডে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। সাদ্দামের এই ধারণাও বাস্তবতার নিরিখে ভুল প্রমাণিত হয়। মার্কিনীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও সে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে।

নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের আকাঙ্খা

কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার কারণে বিশ্বব্যাপী যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার পিছনে অন্তর্নিহিত কারণ কী ছিল? এই প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ ইরাকের বিরুদ্ধে গৃহীত কঠোর পদক্ষেপ কি আমেরিকার নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের একটি অংশ মাত্র ছিল? সে সময় বিশ্বব্যাপী যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। স্নায়ুযুদ্ধের অবসান আর জার্মানী ও জাপানের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি বিশ্ব পরিস্থিতিতে একটা আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন মধ্যপ্রাচ্য, বিভক্ত জার্মানী, আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে দুই পরাশক্তির আদর্শগত যুদ্ধ ছিল বিদ্যমান। এসময় ইসরায়েল ও আরবদেশগুলি দুই পরাশক্তির বোমারু বিমান, ফাইটার জাহাজ, তোপ আর ট্যাংকগুলিকে নিজ নিজ ক্রু ক্ষেত্রে সরবরাহ করছিল। এসময় উভয় সুপার পাওয়ার নিজেদের অত্যাধুনিক অস্ত্রসস্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার একটা ভাল সুযোগ পায়। তারপর অবশ্য পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যে আগামীতে আর সাঙ্গ দেবে না বিষয় সে আমেরিকাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিকে কি নতুন বিশ্বব্যবস্থা বলা যায়? এর উত্তর একটু গভীরে গেয়ে দিতে হয়। নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে কিছু প্রয়াজেনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল পূর্বশর্ত। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-এর যুগে সংঘটিত যুদ্ধের পর থেকেই একটি রাজনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছিল। ঐ সময় থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত দুটি বিশ্বব্যবস্থার সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। প্রথমটি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর। এই বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি ছিল বিজনেস বা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মাঝে ব্যবসা। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ফলে এর সূত্রপাত ঘটে। পরে অবশ্য জার্মানীও এই খেলায় অংশ নেয়। তবে শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডই এক্ষেত্রে সবাইকে ছাড়িয়ে যায়।

রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগে যুক্তরাজ্য পৃথিবীর অপরাপর দেশের জন্য সাহিত্য, সংবাদমাধ্যম, গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রে একটি মডেল পেশ করে। এসময় গোটা পৃথিবীর সমুদ্রজুড়ে ছিল যুক্তরাজ্য নৌবহরের একচ্ছত্র আধিপত্য। ফলে, বৃটিশ কালচার সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে।

এ বিশ্বব্যবস্থার প্রবর্তক ছিল যুক্তরাজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যুক্তরাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়। তবে ইংল্যান্ডের স্থান দখল করতে পারে এমন শক্তি তখন আমেরিকার ছিল না। তাই সে অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখে। এমনকি জাতিসংঘের সদস্যপদও গ্রহণেও সে সম্মত হয়নি। এ সময় সে নিজেকে সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার উপযাগেী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির মাজা ভেঙে দেয়। যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধোত্তর মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট সুযাগে-সুবিধা হতে সে বঞ্চিত হয়। এটা ছিল এমন একটা সময় যখন বৃটিশ আধিপত্যের সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল। তদস্থলে মার্কিন প্রভাবের সূর্য সদর্পে উদিত হচ্ছিল। এটা ছিল দ্বিতীয় নতুন বিশ্বব্যবস্থা। প্রাক্তন ও নতুন পরাশক্তিদ্বয়ের মাঝে (ইংল্যান্ড-আমেরিকা) একটি ক্ষেত্রে বিশেষ মিল লক্ষ্য করা যায়। তা হচ্ছে, উভয় পরাশক্তির অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো মধ্যপ্রাচ্যের তেল। উল্লিখিত দুটি বিশ্বব্যবস্থাকেই বিভিন্ন সমস্যার মুকাবিলা করতে হয়েছে।

বিশেষত: যুক্তরাজ্যের প্রবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা অনেক সমস্যার মুকাবিলা করেছে। জার্মানী নিজে যদিও শেষ হয়ে গেছে কিন্তু সে যুক্তরাজ্যের নতুন বিশ্বব্যবস্থার বারাটো বাজিয়েই তবে নিজে শেষ হয়েছে। আমেরিকা প্রবর্তিত নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরাপের দেশগুলো মিলে চ্যালেঞ্জ করেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে। নিকট অতীতে আমেরিকার নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে তিন দিক থেকে টার্গেট বাননো হয়। জার্মানী আর জাপান মিলে বিশ্ব অর্থনীতিকে তিনটি ব্লকে বিভক্ত করে দিতে সফল ভূমিকা পালন করে। তিন ব্লকের প্রধান ভূমিকায় রয়েছে তিনটি আন্তর্জাতিক কারেন্সী- ইয়েন, মার্ক, ডলার। অপরদিকে ইউরাপেীয় দেশগুলারে মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকেই আমেরিকার রফতানী বাণিজ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মাঝে সৃষ্ট নতুন সুসম্পর্কও আমেরিকাকে নতুন করে বিপাকে ফেলে।

ইরাক যদি আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসাবে প্রতিভাত হতে সক্ষম হতো তাহলে আমেরিকার নতুন বিশ্বব্যবস্থা আর একবার হুমকির সম্মুখীন হতো। প্রথমাক্তে দু'টি শক্তির তুলনায় ইরাকের ব্যাপারটি ছিল একটু ভিন্নতর। ইরাক যদি আঞ্চলিক পরাশক্তি হতে সমর্থ হত তাহলে তার মুকাবিলা করা আমেরিকার জন্য এমন কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না, কুয়েতের উপর আগ্রাসনের কারণে ইরাকের বিরুদ্ধে

তেড়ে যাওয়াটা আমেরিকার নতুন বিশ্বব্যবস্থার সূচনা মোটেই নয়; বরং এটা ছিল তার দাদাগিরি আর নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার-এর প্রতি আস্থার স্বরূপ। সহজ কথায় আমেরিকার নতুন বিশ্বব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান। তবে এর মূলনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। উদ্ভূত উপসাগরীয় সংকট সম্পর্কে সকল পক্ষই ছিল ভুল ধারণার শিকার। সবার ধারণায় ইরাক একটি সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। আসলে এমন কোন সীমাই সৃষ্টি হয়নি। কোন সীমাই যখন সৃষ্টি হয়নি তখন তা অতিক্রম করার প্রশ্নই আসে না। বস্তুত এটা ছিল আমেরিকার নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রতি স্বীকৃতি আদায়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মাধ্যমে সে সারাবিশ্বের কাছ থেকে তার সৃষ্ট নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন আদায় করতে চেয়েছিল- সে সমর্থন সে পেয়েও গেছে। কুয়েত সরকার পুনর্বহাল করার জন্য এ যুদ্ধ মোটেই সংঘটিত হয়নি। এ যুদ্ধ ছিল একুশতম শতাব্দীর শক্তি অর্জনের যুদ্ধ।

উপসাগরীয় যুদ্ধে তেলের ভূমিকা

কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকি হামলার পর কয়েক মাস যাবৎ পাশ্চাত্য দুনিয়া ইরাকের প্রতি কঠোর ভাষায় তাদের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করতে থাকে। তখন জোর দিয়ে বলা হয়, কোন বড় দেশ যদি তার প্রতিবেশী ছোট দেশকে এভাবে গিলে ফেলতে থাকে আর আক্রান্ত ছোট দেশের পক্ষ থেকে যদি এই গুণ্ডামীর প্রতিবাদ না করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে, অতীত পঞ্চাশ বছরে অর্জিত সকল সফলতা নিমিষে ধুলায়ে মিশিয়ে দেওয়া। পশ্চিমারা সকল প্রতিবাদের মাঝে জেনে শুনে ইচ্ছা করেই দুই অক্ষরবিশিষ্ট একটি শব্দ ব্যবহার করছিল না তাহলো "তেল" অথচ তাদের সকল প্রতিবাদমূলক বিবৃতির পিছনে এই তেলই চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করছিল। তেলের সাথে তাদের বহুমুখী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। আসলে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড আগেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল। তারা জানত বিষয়টিকে কীভাবে চিত্রিত করে জনসমর্থন আদায় করতে হয়।

কুয়েতের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব পুনর্বহালের নামে যদি যুদ্ধ করা হয় তাহলে তা হবে প্রশংসার বিষয়। আর যদি পশ্চিমাস্বার্থ উদ্ধারকে প্রাধান্য দিয়ে কুয়েতের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে গৌণ করে যুদ্ধ করা হয় তাহলে এ যুদ্ধ তার আদর্শগত মর্যাদা হারাতে বাধ্য। আর যদি সরাসরি তেলকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করে যুদ্ধ করা হয় তাহলে জনগণের কাছে এর আদর্শগত কোন মূল্যই থাকবে না। সুতরাং কুয়েতের স্বাধীনতা পুনর্বহালের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। আধুনিক যুগে যতগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, এর প্রত্যেকটির পিছনে কেবল মাত্র একটি উদ্দেশ্য নিহিত নয়; বরং এর পিছনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কারণ নিহিত রয়েছে। তবে তেল এমন একটি বস্তু, যা বিভিন্ন ঝগড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তত তিনটি যুদ্ধের পিছনে তেল মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই তিনটি যুদ্ধের প্রথমটি সংঘটিত হয় ১৯৭৩ সালে, যখন মিসরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আনায়োর সাদাত মিসরীয় বাহিনীকে সুয়েজ খাল পার হয়ে ইসরায়েলের উপর হামলার নির্দেশ দেন। তাঁর ধারণা ছিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইসরায়েল সমর্থক পশ্চিমা দেশগুলিকে আরবরা তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেবে। তেলকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বড় যুদ্ধটি ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ যথাক্রমে ইরাক ও ইরানের মধ্যে। এই যুদ্ধে প্রমাণিত হয় তেলের আমদানি ব্যতীত দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এই যুদ্ধের কারণে উপসাগরীয় অঞ্চলে পশ্চিমারা সৈন্য পাঠানারে সুযোগ

পায়। তেলকে কেন্দ্র করে তৃতীয় বৃহৎ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ১৯৯১ সালে। ইউরোপে তেল সরবরাহ নিশ্চিত ও নিষ্কন্টক করার জন্যই ১৯৫৬ সালে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড মিলে সুয়েজ খাল দখল করার চেষ্টা করেছিল। কারণ প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাছের কর্তৃক সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করার ফলে পশ্চিমাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১৯৫৬ সালের এংলো-ফ্রান্স অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার বড় কারণ ছিল আমেরিকার বিরোধিতা। কারণ, সে রামে উপসাগরকে নিজস্ব ঝিল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ছিল উদগ্রীব। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ আর ইসরায়েলের সাথে তার নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তার পজিশনকে সুদৃঢ় করতে সহায়ক হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট আমেরিকান স্বার্থের ব্যাপারে আমেরিকানরা সর্বদা খুবই সেনসেটিভ। অতীতে একটি সফল অভ্যুত্থানের পর ইরাকে আবদুল করীম কাশেম-এর সরকার গঠিত হওয়ার পর আমেরিকা এই পরিবর্তনকে নিজের স্বার্থের পরিপন্থী জ্ঞান করে ষষ্ঠ নৌবহরকে দ্রুত উপসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেয়। কারণ, ইরাকি অভ্যুত্থানের ফলে পুরো এলাকায় একটি আলাড়েন সৃষ্টি হয়। মিসরীয় প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের এ সময় যুগাস্লোভিয়ায় ছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন না করে সরাসরি মস্কোয় যাওয়া জরুরি মনে করেন। উল্লেখ্য, এংলো-ফ্রান্স কর্তৃক সুয়েজ খাল দখলের প্রচেষ্টার সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে তার হুঁশিয়ারী উচ্চারণটি ছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক সম্মিলিত হামলার এগার দিন পর। দেরিতে হলেও সোভিয়েতদের বিবৃতিটি এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ইরাকি অভ্যুত্থানের পর কালক্ষেপণ না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। প্রেসিডেন্ট নাছের একটি সোভিয়েত বিমানে করে মস্কোয় পৌঁছান। এসময় আমিও (লেখক হাসনাইন হাইকল) তাঁর সাথে ছিলাম। সেসময় সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশচেভ উদ্ভূত পরিস্থিতির ব্যাপারে ছিলেন দারুণ অগ্নিশর্মা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, পশ্চিমা সম্রাজ্যবাদী অত্যাচারীরা মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর নির্ভরশীল। তারা তাদের স্বার্থ বিপন্ন হতে দেখলে অবশ্যই যুদ্ধ করবে। আসলে মিঃ ক্রুশচেভ ১৯৫৬ সালে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এনথনীর ভাষ্য সরাসরি শুনতে সক্ষম হয়েছিলেন। মিঃ এনথনী এডেন বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যে আমরা আমাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে দেখলে যুদ্ধে ঝাপিয় পড়ব। এ যুদ্ধ আমাদের পারস্পরিক যুদ্ধও হতে পারে।

মিঃ কুশচেভ জামাল আবদুন নাছেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, মারমুখী মনোভাব পরিত্যাগ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পর্ক স্বাভাবিক করণার্থে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করুন, ইরাকে ক্ষমতাসীন নতুন সরকারে আপনার বন্ধুদের মাধ্যমে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডকে আশ্বস্ত করুন যে, তেল সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে তারা কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না। জেনারেল নাছের সোভিয়েতদের মতামত ইরাককে জানিয়ে দেন। অতপর ইরাকের বিপ্লবী হাইকমান্ড কাউন্সিল-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, তেল সরবরাহ পূর্বের ন্যায় বলবৎ থাকবে। এসময় কুয়েত একটি বিশেষ তেল উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে আপন মর্যাদায় ভাস্বর হতে সক্ষম হয়েছে। তবে কুয়েত তখনও পুরাপুরি স্বাধীন নয়। সে ছিল তখন ইংল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন। কুয়েত তখন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তবে ইংল্যান্ড তখন তাকে আরব জাতীয়তাবাদ থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। এমনকি ঐ সময় সে কুয়েতে মিসরের দূতাবাস খোলারও অনুমতি দেয়নি।

১৯৬১ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য কুয়েতের উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তারপর কুয়েত বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়। শায়েখ জাবের আমির উপাধীতে ভূষিত হন। কুয়েত স্বাধীনতা লাভ করার পরপরই আরব লীগের সদস্য পদ লাভের জন্য দরখাস্ত দেয়। ইরাক এই দরখাস্তের চরম বিরোধিতা করে। বৃটিশ উপনিবেশিক যুগ থেকেই তার দাবি ছিল কুয়েত ইরাকের বসরা প্রদেশের একটি অঞ্চল।। কুয়েত স্বাধীনতা লাভ করার পরপরই তার বিরুদ্ধে সামরিক হামলা পরিচালনার জন্য ইরাক বসরা প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করে এবং যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়। অন্যান্য আরবদেশগুলি ইরাকের বিরুদ্ধে তখন সোচ্চার হয়ে ওঠে। ইরাকের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যজোট গঠন করে। নতুন প্রতিষ্ঠিত একটি আরব দেশ কুয়েতকে বাঁচাবার জন্য সম্মিলিত আরব বাহিনী কুয়েতে প্রেরণ করা হয়। এই বাহিনীতে দশ হাজার মিসরীয় সৈন্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরব দেশগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে ইরাক কুয়েত দখল করা থেকে নিবৃত্ত থাকে। শেষ পর্যন্ত সে তার সৈন্য পিছে হটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

আরবদের সীমান্ত সমস্যা

তেল সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে আরব দেশগুলির মাঝে স্পষ্ট কোন ভৌগোলিক সীমারেখা ছিল না। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। সীমান্ত নির্দিষ্ট করার দায়িত্ব আরব শায়েখদের পরিবর্তে তেল অনুসন্ধানকারী কোম্পানীগুলিকে অর্পণ করা হয়। কোম্পানীর মালিকরা আরব শায়েখদের কাছে জিজ্ঞাসা করে, আপনাদের গবাদিপশুর চারণভূমি কতদূর বিস্তৃত? অথবা জিজ্ঞাসা করা হতো আপনাদের জেলেরা কতদূর জাল ফেলে? শায়েখদের স্বীকারোক্তি মত সীমান্ত নির্ধারণ করা হতো।

এ পন্থা অবলম্বনের ফলে আরব দেশগুলির মাঝে সীমান্ত বিরাধে লেগেই আছে। ১৯৭৩ সালে কুয়েত ছিল একটি ছোট্ট, সুন্দর, মনোরম শহর। স্মরণ রাখতে হবে, তেলের মূল্য বৃদ্ধির সুবাদে কুয়েত বিত্তশালী হয়। কুয়েতের মনমুগ্ধকর পরিবেশের কারণে অনেকের আশা ছিল এই শহরটি মধ্যপ্রাচ্যের একটি সুন্দর, মনোরম, চিত্তাকর্ষক শহরে পরিণত হবে। যা হবে শিল্পকলার একটি বিরল দৃষ্টান্ত; কিন্তু বাস্তবে এমনটি হয়নি। এখানে ফ্লোরেন্স-এর মত ঐতিহ্যবাহী মিডিচী' বংশের অস্তিত্ব ছিল না, যারা শিল্পকলার পৃষ্ঠপেযেকতা করবে। আরব দেশগুলির মধ্যে মিসর, সিরিয়া, সুদান এবং মরোক্কোর কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে জনশক্তি রয়েছে; কিন্তু উল্লিখিত দেশসমূহ নিতান্ত কষ্টের সাথে তাদের তেলের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। এদের মধ্যে কিছু কিছু দেশ এমনও আছে যারা তেল সম্পদ থেকে বঞ্চিত। তবে ইরাক এমন একটি দেশ যার জনসংখ্যা ও তেল ভাণ্ডারের মাঝে ভারসাম্য বজায় ছিল। তেলের অসম ভাণ্ডারের ফলে বিভিন্ন আরব দেশের জনগণের জনপ্রতি আয়ের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, আরব আমিরাতের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় ছিল ২১ হাজার ডলার। অন্যদিকে মিসরের ছিল মাত্র পাঁচশত ডলার। সুতরাং মিসর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আরব কৃষ্টি-কালচারের প্রাণকেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও সে মনে মনে অনুভব করছিল তাকে অন্যায়ভাবে আরব দুনিয়া থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। যেসব আরব শায়েখদের নিকট জনগণের চেয়ে নিজ নিজ অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল বেশী তাঁরা তাঁদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ মনাযোগী হন। অর্থের প্রাচুর্য প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলির মাঝে সন্দেহপ্রবণতা আর আস্থাহীনতার বীজ বপন করে। এই প্রবণতা বিশেষভাবে ঐ সকল প্রতিবেশী দেশগুলির মাঝে দেখা দেয় যাদের ভৌগোলিক সীমান্ত নির্দিষ্ট করা হয়নি। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, ওমান, কাতার, বাহরাহন, ইরাক ও কুয়েত। এসব দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা প্রতিবেশীর সম্ভাব্য হামলার ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত। প্রতিটি রাষ্ট্র প্রধান সঙ্গত কারণেই সামরিক সাজসজ্জায় প্রতিবেশীর তুলনায় অগ্রগামী থাকতে ছিলেন আশাবাদী।

আরবরা প্রতারিত

আরবদের অঢেল ধন-সম্পদের কারণে বিভিন্ন দেশের বড় বড় নেতা, ব্যাংকার, কোম্পানির মালিকদের আরব তোষণনীতির ফলে তারা ভাবতে থাকে পুরো পৃথিবী এখন তাদের হাতের মুঠোয়। ৭০-এর দশকে আরব অর্থ আর আরব শক্তি একই জিনিস মনে করা হতো। এসময় পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো আরবদের শক্তি-সামর্থ্যরে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। তখন এমন একটা ধারণা দেওয়া হয় যে, আরবরা ইচ্ছা করলে যখন তখন পৃথিবীর বড় বড় কোম্পানিসহ যা ইচ্ছে তাই কিনে ফেলতে পারে। পাশ্চাত্যের এই ভিত্তিহীন প্রচারণায় আরবরা যথেষ্ট আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়। অনেকে ওদের প্রচারণাকে বাস্তব মনে করতে থাকে। অনেক আবর শায়েখ নিজস্ব ৭৪৭ বোয়িং-এ আকাশ পাড়ি দিতে থাকেন। এসব বোয়িং-এর উপরের অংশকে রকমারি বিনোদন সামগ্রী দ্বারা সাজানো হয়। সেসময় ওয়েষ্ট এন্ড লন্ডনে “চক্ষু বন্ধ করো ইংল্যান্ড ভ্রমণ করো” নামক একটি নাটক দেখানো হয়। এ নাটকের একটি দৃশ্যে দেখান হয় জনৈক আরব মেহমানের মনতুষ্টির জন্য একজন তেল কোম্পানির চেয়ারম্যান প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছেন। এক পর্যায়ে দেখানো হয়, চেয়ারম্যান তার স্ত্রীকে বলছেন, আরব মেহমানের প্রতিটি আশা যেন পূরণ হয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখান হয়, স্ত্রী বলছে, ডার্লিং সে আমাকে চায়। চেয়ারম্যান বলে- ওহ্! ডার্লিং! এতে ক্ষতি কী?

এই নাটক কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত অত্যন্ত সফলতার সাথে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৮০ সালে সৌদি আরবের প্রাক্তন বাদশাহ খালেদ স্বীয় পুত্র প্রিন্স আবদুল আজিজকে সঙ্গে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন, হোয়াইট হাউস পৌঁছে তিনি প্রসিডেন্ট রিগ্যানের দিকে ইশারা করে ছেলেকে বলেন, যাও তোমার আংকেলকে সালাম করে আসো। এ দৃশ্য সরাসরি টিভিতে সম্প্রচার করা হয়। কয়েক বছর পূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পারত না, আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সাথে কেউ এভাবে ফ্রি হয়ে কথাবার্তা বলার সাহস পাবে। অথচ এ ছিল বাস্তব সত্য। এটা ছিল সৌদি বাদশা আর তার পুত্রের ব্যাপার। এখানে নাক গলাবার অধিকার করো ছিল না। আমেরিকানদের ধারণায় এ ধরনের আচরণ দ্বারা আন্তরিক বন্ধুত্বের তুলনায় বন্ধুত্বের প্রলেপটাই বড় করে দেখানো হয়েছে। এটা ছিল এমন একটা সময় যে সময় আরব বাদশাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন।

আরবের অর্থ দ্বরা অনেকেই আখের গোছানোর সুযোগ পেয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন বড় বড় তেল কোম্পানির মালিক, ব্যুরোক্রেস, অস্ত্র বিশেষজ্ঞ, কুটনীতিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ব্রকার, গোয়েন্দা, উপদেষ্টা ও বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। আরবদের সম্পদ ছিল তাদের হাতের মুঠোয়। এদের মধ্যে আরব-অনারব উভয় জাতির লোক রয়েছে। আসলে এরা আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের সরলতার সুযোগ নিয়েছে। আরবদের বোকা বানাবার ব্যাপারে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে ফ্রান্সের বহির্বিশ্ব নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্থার প্রধান মি. কোমি দোমিরা এবং নিউইয়র্কের প্রিন্স ডিউড রকফেলার'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট মি. থিউডোর রুজভেল্ট-এর পৌত্র 'কেরমিট রুজভেল্ট' ছিলেন ঐ সকল ব্যক্তির অন্তর্ভূক্ত যারা আরব সম্পদ থেকে খুব ফায়দা লুটেছে। মি. কেরমিট একজন উদীয়মান সংবাদিক হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে তার আগমন ঘটে; কিন্তু পরে তিনি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। এখানে একজন স্বল্পভাষী জার্মান মন্ত্রীও বহাল তবিয়তে উপস্থিত ছিলেন। নাম ছিল তার 'হারহানিন" জার্জান" অসময় তিনি আবর প্রশাসকগণকে অনেক কল্পকাহিনী শোনাতেন। এসময় পূর্বে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সভাপতি ইউজিন ক্লাক কুয়েতি রাষ্ট্র প্রধানের উপদেষ্টা। পরে তিনি কুয়েত ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড-এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকেন। অথচ তার প্রতি আরব জনগণ ছিল বিক্ষুব্ধ। কারণ তার যুগেই মিসরের আসোয়ানডেম প্রকল্পের জন্য মঞ্জরকৃত ঋণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মোটকথা, প্রত্যেক আরবরাষ্ট্র প্রধানের সঙ্গে স্বার্থান্বেষীদের একটি দল ছায়ার মত ঘিরে থাকত। সুবিধামত নিজেরদের স্বার্র্থ উদ্ধার করে। এই দশকে আরব কূটনীতিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পুত্র প্রিন্স বন্দর তার দেশের জন্য অ্যাওয়াক্স বিমান সংগ্রহের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সে সময় উদীয়মান যে কোন আরব শক্তির জন্য আওয়াক্স অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো।

এ সময়টা ছিল আরদের সম্পদ আর স্বচ্ছন্দ্যের যুগ। বড় বড় আরব শায়েখ তো বটেই এমনকি যারা ভায়া-মাধ্যম আর মধ্যস্বত্বভোগী হিসাবে কাজ করছিল, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সাথে জড়িত ছিল তারাও নিজস্ব প্লেন ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই গ্রুপের শীর্ষে ছিলেন মাহদী আততাজির যিনি ছিলেন দুবাই-এর শাসক শায়েখ রাশেদ-আলমাকতুমের উপদেষ্টা। পরে তাকে আরব

আমিরাতের পক্ষ থেকে পুরো ইউরোপের রাষ্ট্রদুত করে পাঠানো হয়। মাহদী আততাজির প্রথমে স্বর্ণ ব্যবসা শুরু করেন। এই ব্যবসায় তিনি যথেষ্টে সাফল্য অর্জন করেন। একসময় তিনি মধ্যম ধরনের আন্তর্জাতিক স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের কাতারে শামিল ছিলেন। তারপর তিনি শায়েখ রাশেদ আল মাকতুমের সহযোগী হিসাবে কাজ শুরু করেন। ১৯৮০ সালে তার নিজস্ব পুঁজি দাঁড়ায় তিনশ' কোটি ডলারের উপর। মাহদী আততাজির ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের কয়েকটি রাজকীয় প্রাসাদ খরিদ করেন, এসব রাজকীয় প্রাসাদের মধ্যে একটি ছিল দ্বিতীয় হেনরী ফোর্ড-এর। এই প্রাসাদটি তিনি ৬০ লক্ষ ডলার দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। প্রাসাদ খরিদ করা কোন অন্যায় নয়; কিন্তু পয়সার অপচয় দেখুন! প্রাসাদটি খরিদ করার পর মাহদী আততাজির সেখানে মাত্র দশ মিনিটকাল অতিবাহিত করেন। মজার কথা হলো প্রসাদটির শয়ন কক্ষটি পর্যন্ত তিনি দেখতে যাননি।

আরবের রেওয়াজ ছিল পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলে সম্বোধন করা; কিন্তু অর্থের প্লাবন তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে স্রোতের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সম্পদশালী আরব অন্য গরিব আরব দেশের নাগরিকদের ঘৃণার চোখে দেখা শুরু করে। সৌদি রাজবংশের যে সকল সন্তানের মায়েদের সম্পর্ক ভিন্ন গোত্রের সাথে অথবা যারা ভিনদেশী মায়েদের সন্তান তাদেরকে যুবরাজের লিষ্ট থেকে খারিজ করে দেওয়া হয়। অর্থের প্রাচুর্যের একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, আবুধাবীর শাসক শুরুতে তার অর্থ রাজপ্রসাদের এক গোপন কামরায় লুকিয়ে রাখতেন। তার অভিযোগ ছিল ইঁদুর তার কারেন্সী নোট কেটে দেয়। ইংল্যান্ডের জনৈক ব্যাংক ম্যানেজার তাকে অনেক কষ্টে রাজি করাতে সক্ষম হন যে, আগামীতে তিনি তার অর্থ ব্যাংকে জমা রাখবেন। আসলে তিনি ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রতি আস্থাশীল হতে পরছিলেন না। শুরুতে তিনি পরীক্ষামূলক দশ লাখ পাউন্ড জমা করান আর ঠিক ঐ দিনই ব্যাংক পাইম শেষ হওয়ার পূর্বে পুরো বের করে নেন। পরপর কয়েকদিন ধরে তিনি এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন। তারপর তার দৃঢবিশ্বাস জন্মে, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ কেবল নিরাপদই নয়; বরং যখন ইচ্ছা তার অর্থ তিনি বের করতে পারবেন। এরপর আবুধাবীতে ব্যাংকিং সিস্টেম উন্নতি লাভ করে।

১৯৭০- এর দশকে আরব রাষ্ট্রপতিগণ নিজ নিজ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের অবাস্তব আকাশ কুসুম চিন্তায় বিভোর থাকেন। মিসরের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত মনে করতেন আমেরিকার সাহায্যে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি ক্যাম্পডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

জনাব সাদাত মি. হেনরী কিসিঞ্জারের এই অভিমতও মেনে নেন যে, আরব-ইসরায়েল বিরোধের শতকরা ৭০% মসস্তাত্ত্বিক। অধিকন্তু ইসরায়েলকে তার অস্তিত্ব রক্ষার আশ্বাস যদি দেওয়া যায় তাহলে নিরাপত্তা বিষয়ক সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু জনাব সাদাত এসব বিষয় জনগণের আস্থা অর্জনে চরমভাবে ব্যর্থ হন। এটা বাস্তব, আরবরা মিসরকে বাদ দিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বড় ধরনের যুদ্ধ করতে পারবে না। অনুরুপ অন্যান্য আরব দেশগুলির সাহায্য ব্যতীত মিসরের একারপক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট সাদাতের আত্মপ্রতারিত নীতি তাকে এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে দেয়নি। আমেরিকার সাথে মিসরের সখ্যতাও আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। সোভিয়েত অস্ত্রের পরিবর্তে মার্কিন অস্ত্রের খরিদ অর্থনীতির বিচারে মিসরের জন্য ছিল খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

মিসর সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত এক দশমিক সাতশ' কোটি রুবেলের অস্ত্র ক্রয় করে। আর ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পঞ্চাশ কোটি রুবেলের অস্ত্র খরিদ করে। এই তুলনায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র খরিদ করতে গিয়ে মিসর সাতশ' কোটি ডলার ঋণ হয়ে পড়ে। ঠিক এই পরিমাণ অর্থ সে কয়েকবার আমেরিকাকে সুদ বাবদ আদায় করেছে। ঋণের এই বোঝা মোটেই বিস্মৃত হবার নয়; কিন্তু ইরাক-কুয়েত সংকটকালে মিত্র জোটের পক্ষ অবলম্বন করার কারণে মিসরের এই ঋণ মাফ করে দেওয়া হয়। আরবদের মরীচিকার পিছনে ধাবিত হবার এই চমকপ্রদ দশকে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মি. জিমিকার্টার ইরানি বিপ্লবের মাত্র ছয়মাস পূর্বে ইরানকে দরিদ্রতা আর সংঘাতের সমুদ্রের মাঝে গজিয়ে ওঠা শান্তি ও নিরাপত্তার স্বপ্নদ্বীপ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ইরানে বিপ্লব শুরু হওয়ায় মি. জিম কাটার জনাব আনোয়ার সাদাত ও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী মি. মেনাহেম বেগীনের সাথে ক্যাম্পডেভিডে শান্তি আলোচনায় ব্যস্ত। এসময় মি. কার্টারের পক্ষে ইরানি বাদশাহর জন্য কিছু করা ছিল প্রায় অসম্ভব। কেবলমাত্র দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার এই করুণ পরিণতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তবে বিপ্লবকে প্রতিহত করা তখন আর আমেরিকার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ইরানের ইসলামি বিপ্লব

ইরানের ইসলামি বিপ্লব ইরানি জাতির ভাগ্যে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। এই বিপ্লব আরব জাতির উপরও বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। গোটা এক দশক ধরে আরবরা মরীচিকার পেছনে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এসময় আরবদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যে বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের কারণে আরবরা ইরানি বিপ্লবের প্রভাব থেকে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারেনি। দুর্নীতি, ভোগবিলাসিতা আর ধনী-গরীবের মাঝে পার্থক্যের কারণে ইরানি বিপ্লবকে নিজেদের মুক্তির দিকনির্দেশক মনে করে। মিসরসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে কয়েকটি ইসলামি দল পূর্ব থেকেই কাজ করে আসছিল; কিন্তু ইরানের ইসলামি বিপ্লব তাদেরকে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। এছাড়া ভারত উপমাহাদেশের বিশেষ করে পাকিস্থান-হিন্দুস্থানের ইসলামি মতাদর্শ দ্বারাও আরবরা প্রভাবিত হতে শুরু করে। পাকিস্তান যেহেতু ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অতএব ইসলাম পাকিস্তানীদের কাছে একটি ফাইটিং ফোর্স-এর মত মর্যাদাশীল। পাকিস্তানীদের এই ধর্মীয় মতাদর্শ অনেক আরব অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছে। ফলে পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করেছিল, যে ইসলাম একসময় আরব অঞ্চল থেকে বেরিয়ে ভারত উপমহাদেশে গিয়েছিল সেই ইসলাম আঞ্চলিক প্রভাব ও নতুন পয়গাম সাথে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে। এর ফলে গরীব অধিবাসীদের মনে উচ্চবিত্ত ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিশ্বাসী আরবদের ব্যাপারে দারুণ মারমুখী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। বিশেষকরে মিসরের গরীব জনগণের কাছে তেহরান ও ইসলামাবাদ ছিল একটি আদর্শ। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের একবছর পরই মুসলিমবিশ্বের সবচে' পবিত্র স্থান ক'বা শরিফকে একদল উগ্রপন্থী দখল করে নেয়। এই ঘটনায় আরব দুনিয়া দারুণভাবে উৎকণ্ঠিত হয়। সৌদি প্রশাসনকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত নির্বিকার থাকতে দেখা যায়। কা'বা দখলকারী উগ্রপন্থীদের দাবি ছিল সৌদি আরবে নিরেট ও নির্ভেজাল ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা হোক। আর এই ইসলামি হুকুমতকে অবশ্যই পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত হতে হবে। পাশ্চাত্য দেশগুলির সাথে সৌদি আরব কোন সম্পর্কই রাখতে পারবে না।

ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের দ্বারা দ্বিতীয় বড় হামলাটি পরিচালিত হয় মিসরে। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত তাদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। আনোয়ার সাদাত ১৯৮১ সালে একটি ফৌজি প্যারেডে সালাম গ্রহণ করার সময় জনৈক আততায়ী কর্তৃক গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। হত্যাকারী ক্যাপ্টেন

খালেদ আহমাদ আল ইসলাম বুলীর সম্পর্ক ছিল একটি উগ্রপন্থী গ্রুপের সাথে। এই গ্রুপটি আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব জ্ঞান করত। ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী সালশান রুশদীকে হত্যা করা অবশ্য কর্তব্য বলে ফতোয়া দিলে কোন আরব রাষ্ট্রনায়ক তাকে সমর্থন দেননি। সালমান রুশদী লিখিত স্যাটানিক ভার্সেস-এর বিরুদ্ধে ঢাকা-ইসলামাবাদ করাচীতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। অথচ সেই তুলনায় রিয়াদ, দামেশক ও কায়রোর নামমাত্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। ঐ বইটির বিরুদ্ধে লন্ডনের মুসলমানদের পক্ষে থেকে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। কারণ হলো সেখানে অবস্থিত মুসলমানদের অধিকাংশের সম্পর্ক পাকিস্থান-হিন্দুস্থান ও উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের সাথে। মজার ব্যাপার হলো, মিসরের ধর্ম মন্ত্রাণালয়ে খোমেনীর দেয়া ফতোয়া অকার্যকর করার জন্য চেষ্টার ক্রটি করেনি, কিন্তু ধর্ম মন্ত্রাণলয়ের প্রচেষ্ঠা কোনক্রমেই ফলপ্রসু হয়নি। কারণ, ইরানি নেতা রুশদীর তওবা কবুল করতে রাজি হননি। অনেক আরব অধিবাসীর ধারণায় তাওবা করে যে ব্যক্তি ইসলামে ফিরে আসতে চায় তাকে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত হওয়া উচিৎ নয়; কিন্তু ইরান ও পাকিস্তানের জনগণ সালমান রুশদীকে কোন অবস্থাতেই মাফ করতে প্রস্তুত ছিল না।

মরীচিকার দশকে স্বাক্ষরিত ক্যাম্পডেভিড চুক্তি আরবদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এই চুক্তির কারণে আরববিশ্ব থেকে মিসরকে বের করে দেওয়া হয়। ফলে আরব বিশ্বে নেতৃত্বের সংকট দেখা দেয়। ইরাক তার জনসংখ্যা, সম্পদ আর সামরিক শক্তির সুবাদে তখন নেতৃত্বের শুন্যস্থান পূরণ করার সামর্থ্য রাখত। জনাব সাদাত ক্যম্পডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করে ইরাকের জন্য রাস্তা পরিস্কার করে দিয়েছিলেন। ইরানি বিপ্লব, ক্যাম্পডেভিড চুক্তি আর আরবদের আকাশ-কুসুম চিন্তা সত্তর-এর দশকের শেষ অবধি মুসলিমবিশ্বকে কিংবর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পৌঁছে দেয়। এসময় মুসলমানরা হাসতে ভুলে গিয়েছিল। দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য অন্তর্দাহ ছিল তাদের নিত্যদিনের সাথী। আরব রাষ্ট্রনায়করা একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করত না। কারো উপর কারো ভরসা ছিল না, রাবাত থেকে রিয়াদ পর্যন্ত সকল আরব রাষ্ট্র নায়কগণ ভয়ে ছিল ভীত। এক নৈরাশ্যের ছায়া যেন সকল আরব দেশকে ঘিরে রেখেছিল। এসব কিছুই ছিল একটি বড় বিস্ফোরণের পূর্বসংকেত। শেষ পর্যন্ত সেই বিস্ফোরণ ঘটে গেল, ইরাক ইরানের উপর হামলা করে বসল। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে আগামী আট বছরের জন্য সবকিছু তলিয়ে গেল।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ

ইরাক-ইরান যুদ্ধের ইতিহাস অত্যন্ত করুণ ও দীর্ঘ। পশ্চিম ইরানের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে পড়ে আছে ভস্মীভূত সাঁজেয়া গাড়ী, ট্যাংক, শস্যক্ষেত ও বিল্ডিংয়ের ধ্বংসাবশেষ। অসংখ্য বোমার টুকরো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যত্রতত্র। ধ্বংসের এই তান্ডব লীলায় ইরানি নওজোয়ানদের আত্মত্যাগ এবং শাহাদাতের প্রতি আগ্রহের এমন সব দৃষ্টান্ত কায়েম হয়েছে যা সত্যিই বিশ্বাস হবার নয়। ইরানিরা ইরাকি তোপের সামনে মানুষের প্রাচীর খাড়া করে দেয়। গোলার আঘাতে একটি প্রাচীর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় আর সাথে সাথে আরেকটি মানুষের প্রাচীর তার স্থান দখল করে নেয়। এ ধরনের যুদ্ধ যদি ইউরোপে অথবা আরব-ইসরায়েলের মাঝে সংঘটিত হতো তাহলে এই যুদ্ধ বন্ধ করতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ রাতদিন এক করে দিত; কিন্তু এখানে অবস্থাটি ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। দু'টি ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে। অতএব জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এ বিষয়ে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত না হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। ওদিকে পশ্চিমাদের মনোভাব ছিল, আমাদের দু'টি শত্রু পরস্পর লড়তে লড়তে শেষ হয়ে যাচ্ছে-ওদের যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে আমাদের এমন কি দায় ঠেকেছে? পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে ইরানের বৈরী মনোভাব বিপ্লবের পর কারো অজানা ছিল না। তেহরানে আমেরিকান কূটনীতিকদের আটকে রাখার ঘটনাও পশ্চিমারা সহজে ভোলেনি। ইরাকের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক মোটামুটি ভাল ছিল। কিন্তু তারপরও আমেরিকা ইরাককে একটি গন্ডীর মধ্যে রাখায় ছিল বিশ্বাসী। অপরদিকে ইরাকের প্রতিবেশী দেশ সৌদি আরব, কুয়েত, কাতারসহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্র প্রধানগণ ইরাকের সামরিক শক্তিকে একটি সীমার মধ্যে রাখতে ছিলেন আশাবাদী। এসব দেশ ইরাককে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য দিয়েছে; কিন্তু ইরাক-ইরান যুদ্ধ অবসানের লক্ষে তারা তেমন কোন কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়নি। আরব রাষ্ট্রনায়করা এবং আমেরিকা সবসময় ইরাককে দুর্বল দেখতে চেয়েছে, কিন্তু ইরাকের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাক এ কামনা কেউ করেনি। ফলে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হোক ইরাক-ইরান ছাড়া এ কামনা সবাই করেছে।

হেনরী কিসিঞ্জার বলেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এটা প্রথম যুদ্ধ যার পরিণামে উভয় দেশ পরাজিত হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা অসম্ভব মনে হয়; কিন্তু যুদ্ধের শেষ পরিণতির দিকে তাকালে দেখা যায় মি. কিসিঞ্জারের কথা ছিল বাস্তব সত্য। কারণ, যখনই একপক্ষকে বিজয়ী দেখা গেছে তখনই অন্যপক্ষের সাহায্যের জন্য

আমেরিকা বাহাদুর তার দ্বারে উপস্থিত হয়েছে। এর ফলে সে দেশ পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচতে সক্ষম হয়েছে। আবার অন্যপক্ষকে যখন একটু দুর্বল মনে হয়েছে তখন আমেরিকা মহারাজ তার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। আর সবিনয় নিবেদন জানিয়ে বলেছে হুজুর, অধম হাজির। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে অধমকে অবশ্যই স্মরণ করবেন, আশা করি নিরাশ হবেন না। আমেরিকার ধারণা ছিল ইরাক শক্তিশালী হলে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্য লোপ পাবে। ইরাক-ইরান যুদ্ধে আমেরিকা তার দু'মুখো নীতিকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেছে। ১৯৮০ সালে ইরানের বিজয়ের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে, তখন আমেরিকা ইরাককে সাহায্য দিতে এগিয়ে আসে; ১৯৮৫ ও ৮৬ সালে যখন ইরানের পরাজয়ের লক্ষণ দেখা দেয় তখন আমেরিকা বাহাদুর ইরানের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। এসময় যদিও ইরানের সাথে আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল; কিন্তু আমেরিকা বাহাদুর স্বার্থ উদ্ধারের জন্য পারে না এমন কাজ নেই। সুতরাং সিআইএ এবং ইসরায়েলের মাধ্যমে ইরানকে ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধের একটি কারণ ছিল ইরানের ইসলামি বিপ্লব। বিপ্লবের কারণে ইরান মার্কিন প্রভাবমুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটা ছিল আমেরিকার সবচে' বড় পরাজয়। ইরান আমেরিকান প্রভাব বলয় মুক্ত হবার ফলে সোভিয়েতদের কাছে তার গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া তেলসমৃদ্ধ দেশ হওয়ার কারণে পশ্চিমাদের চোখে ইরান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবের পর পশ্চিমারা শংকিত হয়ে পড়ে, যেকোন মুহূর্তে ইরান পারস্য উপসাগরের পথ তাদের জন্য অবরুদ্ধ করে দিতে পারে। আমেরিকার হাত থেকে ইরান সরে যাওয়ার ক্ষতি মেনে নেওয়ার পাত্র ছিল না-অতএব সে সুযোগের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে তাকে। মার্চ ১৯৭৯তে প্রেসিডেন্ট কার্টার এলেন মিসরে সরকারি সফরে। ইরানকে কীভাবে নিজেদের বলয়ে ফিরিয়ে আনা যায় এই চিন্তা-ভাবনায় কার্টারের অধিকাংশ সময় কাটে। পরিস্থিতি ছিল খুবই ঘোলাটে। সরকারি বাহিনী বিপ্লবের সামনে আত্মসমর্পণ করেছে। ইরানের উপর সরাসরি হামলার কোন অজুহাত সে খুঁজে পাচ্ছে না। ওদিকে তুর্কীরা ইরানের সাথে সংঘাতে জড়াতে চায় না। উপসাগরীয় দেশগুলির কেউ এই মুহূর্তে আমেরিকাকে সাহায্য করার মত পজিশনে নেই। বাকী রইল ইরাক। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে কতিপয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা ইরাককে মোটা অংকের অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করার ব্যাপারে বিভিন্ন উপায়ে প্রলোভন দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতিকে এমন ভয়ংকর আকারে নিয়ে

যাওয়া হয় যে, বারুদের স্তূপকে বিস্ফোরিত করার জন্য কেবল একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠির প্রয়োজন ছিল। ইরাক-ইরানের মাঝে শিয়া-সুন্নী বিরোধ ছাড়াও সীমান্ত নিয়ে গন্ডগোল বাঁধে। শাহের যুগে ১৯৭৫ সালে যদিও ইরান-ইরাক সীমান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করা হয়; কিন্তু ইরাকের ধারণায় এটা ছিল একতরফা ফয়সালা। দুর্বলের উপর সবলের চাপিয়ে দেওয়া সম্পত্তি।

১৯৭৫ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজাঝিরায় অনুষ্ঠিত ওপেক কনফারেন্স চালাকালে ইরাক-ইরান সীমান্ত বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ইরানের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান। চুক্তির অধীনে জলপ্রণালী শাতিল আরবকে দুইভাগে বিভক্ত করে উভয় দেশকে জাহাজ চলাচলের সুযোগ করে দেওয়া হয়। ইরাকের ধারণায় পুরো শাত্তিল আরব তার নিজস্ব সম্পত্তি। এখানে ইরানের কোন অধিকার নেই। অনেকটা ছাড় দিয়েই ইরানকে এখানে জাহাজ চলাচলের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ইরানের কাছে এছাড়া জাহাজ চলাচলের সুযোগ লাভের বিনমিয়ে শাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ইরাকে অবস্থিত কুর্দী বিদ্রোহীদের আগামীতে কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা হবে না। ইরানি মদদপৃষ্ট হয়ে ওরা এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, ইরাকের পক্ষে ওদের বিরুদ্ধে কোন সফল অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না।

ওদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছিল, তারা ইরাককে আর কোন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবে না। ফলে ১৯৭৫ সালে ইরাক ইরানের সাথে কোন বার্গেনিং পজিশনে ছিল না। এসময় ইরাকের অস্ত্রভান্ডার ছিল শুন্যের কোঠায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এসময় কুর্দী সমস্যাকে কেন্দ্র করে তার ক্রপের চাল চালার অশুভ পাঁয়তারায় মেতে ওঠে। মোটকথা, শাতিল আরবের উপর ইরানের কোন অধিকার ইরাক কখনও মেনে নেয়নি। ইসলামি বিপ্লবের পর ইরাক ইরানকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ পায়। ইসলামি বিপ্লব স্বয়ং ইরান-ইরাক সংঘর্ষের একটি কারণ। ইরাকি শিয়াদের জন্য ইরানের ইসলামি বিপ্লব থেকে প্রভাবিত হওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। এছাড়া ইরাকি শিয়াদের দাওয়াত নামক একটি সংগঠন ছিল। এই সংগঠনটি আরানের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেত। বিপ্লবের পর দাওয়াত কর্মীদের কর্মধারায় যথেষ্ট গতি সঞ্চার হয়। উক্ত দলটি ইসলামি বিপ্লবের প্রভাব ইরাকেও বিস্তৃত করতে প্রয়াস পায়। ওদিকে ইরানের ইসলামি হুকুমত আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে বড় শয়তান আর ইরাককে

ছোট শয়তান হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। তেহরান বেতার থেকে একটি বিশেষ আরবি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইরাকি জনগণকে সরকার বিরোধী বিপ্লবে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এসব ঘটনার পর উভয় গ্রুপ একে অপরের সীমান্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করে। অতঃপর উভয় দেশের সীমান্ত এলাকায় খন্ড যুদ্ধও শুরু হয়। এই খন্ড যুদ্ধই সর্বাত্মক যুদ্ধের পথ সুগম করে। দেখতে দেখতে ইরাক-ইরান মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

ইরাকের রাজধানী বাগদাদ, সীমান্ত এলাকা থেকে মাত্র ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অতর্কিত কোন হামলা তাকে বিপাকে ফেলতে পারে। হামলাকারী বাহিনী প্রথম হামলায় বাগদাদের আশপাশে পৌঁছে যেতে পারে। অপরদিকে তেহরান আর ইরাকি ফৌজের মাঝে দুরুত্ব ছয়শ' কিলোমিটার। এসব কারণে ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল আক্রমণাত্মক হামলার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ইরাকি বাহিনীর জন্য প্রথেমে হামলা করাটাই ছিল উত্তম ষ্ট্র্যাটেজী। সুতরাং ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ একশ' জঙ্গি জাহাজের সাহায্যে ইরাক প্রথমে ইরানের উপর হামলা করে বসে। অপরদিকে ইরাকের স্থল বাহিনী দু'টি সীমান্ত অতিক্রম করে ইরানের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। যুদ্ধ শুরুর পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ সবকিছুই ছিল ইরাকের অনুকূলে। ১৯৮১ সাল শুরু হবাব পর ইরান বিপুল শক্তির সাথে বীর বিক্রমে ইরাকি হামলার মুকাবেলা করতে থাকে। জনৈক ইরাকি জেনারেল আলাপচারিতার সময় প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে বলেন, স্যার! আমার মনে হয় আমরা উম্মাদ লোকদের সাথে যুদ্ধ করছি। ওরা (ইরানিরা) যখন আমাদের দিকে অগ্রসর হয় তখন মনে হয় খালি হাতেই ওরা আমাদের ট্যাংকের অগ্রযাত্রারোধ করে দেবে। মুহূর্তে আমাদের ট্যাংক ওদরকে নিষ্পেষিত করে ফেলে। তারপর দেখতে না দেখতে আবার ঐ পরিমাণ লোক আমাদের ট্যাংকের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

যুদ্ধ করতে করতে ইরাকের যখন নাভিশ্বাস অবস্থা। ওদের তখন প্রচুর অস্ত্রের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন ইরাকের মিসর একাই পুরো করতে পারত। মিসর ছাড়া অন্যকোন আরবদেশের এই সামর্থ্য ছিল না। ক্যাম্পডেভিড চুক্তির কারণে আরবরা এই সামর্থ্য হারায়। ক্যাম্পডেভিড চুক্তির কারণে আরবরা তাকে একঘরে করে রেখেছিল। তবে হ্যাঁ, ওমানের সাথে মিসরের তখনও সম্পর্ক বহাল ছিল। সুতরাং ওমানকে মাধ্যম করে মিসরের অস্ত্রতৈরীর কারখানাগুলো রাত দিন এক করে ইরাককে অস্ত্রের যোগান দিতে লাগল। 'ঝোপ বুঝে কোপ'

মিসরও এ নীতির অনুসরণ করল। গুদাম পচা অস্ত্র অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে মিসর যে অস্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে খরিদ করেছিল সেসব অস্ত্র অত্যান্ত চড়া মূল্যে ইরাককে সরবরাহ করল। ইরাক যদিও আমতা আমতা সুরে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে যে, মিসর অস্ত্রের চড়ামূল্য উসূল করছে তারপরও ইরাক কখনও অস্ত্র খরিদ করতে অসম্মতি জানায়নি। মাত্র এক বছরের মধ্যে পরিত্যক্ত সোভিয়েত অস্ত্র বিক্রি করে মিসর ইরাকের কাছ থেকে একশ' কোটি ডলার কামায়। এই অর্থ দিয়ে মিসর অত্যাধুনিক আমেরিকান অস্ত্র খরিদ করে। ইরাকিরা সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিল, ফলে এসব অস্ত্রচালনায় তাদের মোটেই বেগ পেতে হয়নি। পশ্চিমাদের অস্ত্রও তাদের প্রয়োজন ছিল, তবে গোলটা বাঁধিয়েছিল-ওরা পশ্চিমারা যে এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ এটা জাহির করার জন্য তারা ইরাক-ইরান উভয়কে অস্ত্রের সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়, তবে এটা স্বতন্ত্র ব্যাপার যে, পাশ্চাত্যের আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বিফল হয়। এই সুযোগে অনেক পশ্চিমা ও আরবদেশ যুদ্ধরত দুই দেশকে অস্ত্র সরবরাহ করে মোটা অংকের অর্থ উপার্জন করে।

১৯৮৪ সালে ইরান মৃত্যু ভয়াল ভাবমূর্তি নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। সে অধিকৃত অঞ্চল এক এক করে ইরাকের কাছ থেকে পুর্নদখল করতে থাকে। বসরার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত "ফা" নামক দ্বীপটির অস্তিত্ব যখন বিপন্ন তখন সৌদি আরব ও অন্যান্য আরব দেশগুলি ইরাককে মোটা অংকের সাহায্য দেওয়া শুরু করে। আসলে ইসলামি বিপ্লবের কারণে আরব রাষ্ট্রপাধানরা ছিল শংকিত। তাদের ভয় ছিল এই বিপ্লব তাদের অস্তিত্ব যেন বিপন্ন করে না তোলে। সমস্ত আরব পত্রপত্রিকাগুলি ইরাককে পূর্ব দ্বারের অতন্ত্র প্রহরী হিসাবে তুলে ধরে। এ সময় ইরাককে সব ধরনের সাহায্য দেওয়া হয়। এসব সাহায্য ইরাকের পজিশনকে মজবুত করে তোলে।

যুদ্ধের শেষ দিনগুলিতে ইরাকি ক্ষেপণাস্ত্র যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে ইরান বাধ্য হয়ে যুদ্ধবিরতি দেয়। শেষের দিকে যুদ্ধ ছিল ইরাকের পক্ষে, তারা কেবল বিগত দিনের পরাজয়েরই প্রতিশোধ মেনে নেইনি, বরং পেশাগত যোগ্যতার ব্যাপারে ইরাকি সৈন্যরা আমেরিকার বাহবা কুড়াতে পর্যন্ত সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৮ এপ্রিল থেকে আগষ্ট পর্যন্ত পাঁচটি বড় ধরনের লড়াই হয়। এই পাঁচটিতেই ইরানিদের পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে হয়। এই পাঁচটির মধ্যে প্রথম যুদ্ধটি হয় ১৭ ও ১৮ ই এপ্রিল। এই লড়াইয়ের ফলাফল হিসাবে ইরাকিরা তাদের

'ফা' নামের দ্বীপটি ইরানিদের কাছ থেকে পুনর্দখল করে নেয়। উল্লেখ্য, ১৯৮৬ তে পর পর দুই মাস লড়াইয়ের বিনিময়ে ইরান এই দ্বীপটি ইরাকের কাছ থেকে দখল করে নেয়। অথচ ইরাকি সেনাদের এই দ্বীপটি ইরানিদের কাছ থেকে ফেরত নিতে লাগে মাত্র দু'দিন। দ্বিতীয় লড়াইয়ের ফলাফল দাঁড়ায় এই যে, ইরাকিরা পুনরায় বসরা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালে তিন সপ্তাহ অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে ইরাকের কাছ থেকে এই অঞ্চল দখল করে নেয় ইরান। এই লড়াইয়ে ইরানের ৭০ হাজার মানুষ মারা যায়। ইরাকিরা এই অঞ্চল পুনর্দখল করতে সময় নেয় মাত্র ৭ ঘণ্টা। তৃতীয় লড়াইয়ে ইরাক ইরান থেকে তার ঐ অয়েল ফিল্ড ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় যা ইরানিরা ১৯৮৪ সালে ইরাকের কাছ থেকে জবরদখল করে নিয়েছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম লড়াইয়ে বাগদাদের অস্তিত্ব নিয়ে ইরাকিরা যে উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন যাপন করছিল কেবল যে তা তিরোহিত হয়েছিল তাই নয়, বরং ইরাকি সৈন্যরা ইরানের ৬০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছিল।

২০শে আগষ্ট ১৯৮৮ গতানুগতিক অস্ত্রে সংঘটিত বিংশ শতাব্দীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধটির অবসান ঘটে। এই যুদ্ধের পরিণতিতে চার লাখ ২০ হাজার মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। ২ লাখ ১০ হাজার মানুষ যুদ্ধবন্দীর বর্ণনাতীত কষ্টভোগ করে। আর ৩৯ হাজার ডলার সম্পদের অপচয় হয়। ইরাক-ইরান যুদ্ধ অবসানের পর সাদ্দাম হোসেন আঞ্চলিক লিডার হিসাবে প্রতিভাত হন তার ধারণায় তিনি এই বিজয়ের ফলে আরববিশ্বকে ইরানি শিয়া ইসলামি বিপ্লব ও ইরানি প্রভাব থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। আরবরা এখন স্বচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করতে পারবে। ইরানভীতি তখন তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলে ছিল।

ইরাকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইরাক-ইরান যুদ্ধ ও ১৯৯১ সালে সংঘটিত উপসাগরীয় যুদ্ধের নেপথ্যে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের ব্যক্তিচরিত্র বহুলাংশে দায়ী। সাদ্দামের সম্পর্ক এমন একটি সমাজের সাথে যেখানে জালেম ও স্বৈরাচার শাসককে পছন্দ করা হয়। অত্যাচার আর নির্যাতন ইরাকি সমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বহু বছর ধরে ইরাক সন্ত্রাসের প্রাণকেন্দ্ররূপে চিহ্নিত। ঐতিহাসিকভাবেও ইরাককে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মনে করা হয়। পূর্বে এটা ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। আশুরিয়া ও সেমিটিক জাতীয় বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য দজলা ও ফোরাতের পাদদেশেই গড়ে ওঠে। হামুরাবী ও বুখতেনাছাবর'র মত দ্বিগ!জয়ী শাসনকর্তাদের সম্পর্কও এ অঞ্চলের সাথে। বাবেল এবং নরয়নাওয়ার মত বিশাল সমৃদ্ধ শহর এই উপত্যকাতেই গড়ে উঠেছিল।

ইসলামের ইতিহাসেও ইরাকের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। আব্বাসীয়দের যুগে বাগদাদ কেবল ইসলামি সম্রাজ্যের রাজধানীই ছিল না; বরং বাগদাদ ছিল ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র। গ্রীক দর্শন শাস্ত্রের আরবি ট্রানস্লেশনের অধিকাংশ কাজ খলিফা মামুনের যুগে সম্পন্ন হয়। ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী এই দেশের উপর প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন সবসময় ছিল একটি দুরূহ ব্যাপার। নির্যাতনের বিষয়টি ইরাকি ইতিহাসে সর্বদা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। উমাইয়াদের যুগে ইরাক ছিল একটি গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল। ইয়াজিদ হাজ্জাজ ইবনে ইউছুফকে অত্র অঞ্চলের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠায়। হাজ্জাজ ক্ষমতা গ্রহণের পর কুফার সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে তার দরবারে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেয়। এরপর যা ঘটে তা অত্যান্ত ইন্টারেসটিং, ঐতিহাসিক ও উপদেশমূলক। হাজ্জাজ তার ভাষণ শুরু করার পূর্বে এক ঘণ্টা পর্যন্ত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। এ সময় সম্ভ্রান্ত কুফাবাসীরাও চুপচাপ বসে থাকে। তারপর সে যে ভাষণ দেয় তাকে আরবি সাহিত্যের ক্লাসিক হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। হাজ্জাজ তার ভাষণ শুরু করে এভাবে, হে ইরাকবাসী! হে রিয়াকার ও সাম্প্রদায়িক জনগণ! বর্তমান খলিফা তার তীরভান্ডারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্যকর তীর হিসাবে বেছে নিয়েছেন এই অধমকে। নির্বাচিত করার পর তিনি আমাকে তোমাদের উপর পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি তার কথাকে বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছেন। এই ঘটনার ১৪ বছর পর যখন সে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তার মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল হে

খোদা! আমাকে মাফ করে দাও। আমি আমার শাসন আমলে ১ লাখ কিংবা তার কিছু বেশী লোককে হত্যা করেছি।

হাজ্জাজের উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা ইরাকি সমাজের মন-মানসিকতার কিছুটা ধারণা নেওয়া সম্ভব। আসলে ইরাকের ইতিহাসে বারবার বড় ধরনের রক্তপাত একটি গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। অত্র অঞ্চলের জনৈক বিশেষজ্ঞ ও স্কলার জনাব গস্যাল সালামাহ-এর বক্তব্য অনুযায়ী , লেবাননের পার্বত্য অঞ্চল ও আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের মাঝে এক ধরনের ঘ্রাণ অনুভুত হয়। যদি আপনি মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে সহাজেই অনুধাবন করতে পারবেন-এই ঘ্রাণ অন্যকিছুর ঘ্রাণ নয়, এ হচ্ছে মৃত্যুর ঘ্রাণ।

ইতিহাস ঘাটলে বিংশ শতাব্দীতেও আমরা বারবার ইরাকে রক্তপাতের সন্ধান খুঁজে পাই। ১৯৩১,১৯৩৬,১৯৪৫,১৯৪৯ সালে আমরা ইরাকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, নির্যাতন, নিপীড়ন আর রক্তপাতের লোমহর্ষক দৃশ্য দেখতে পাই। এ সময় ইরাকি জনগণকে কেবল পাইকারী হারে হত্যাই করা হয়; না বরং মৃত মানুষের লাশ বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে জালিমদের অন্তর্দাহ নির্বাপণ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে কম্যুনিষ্ট পার্টির সাতজন নেতার লাশ কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে ঝুলতে থাকে। জেনারেল নূরী ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত পুরো ইরাকি রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সাতবার তিনি ইরাকের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ অলংকৃত করেন। ১৯৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় তিনিও রাজপরিবারের সাথে মৃত্যুর মুখে পতিত হন। মোটকথা রক্তপাতের ঘটনা দ্বারা ইরাকের ইতিহাস পরিপূর্ণ।

সাদ্দামের পরিচয়

২৮শে এপ্রিল ১৯৩৭। উত্তর ইরাকের কুর্দী অঞ্চলের নিকট "তাকরীত" নামক মহকুমা শহরে সাদ্দাম হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। তার দাবি, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর। তার শাজারায়ে নছব কুষ্ঠীনামা হযরত আলী (রাঃ) সাথে মিশেছে। তাকরীত ও তার আশপাশের লোকদেরকে সামরিক বাহিনীর জন্য উপযুক্ত মনে করা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাকরীত অধিবাসীদের ব্যাপারে এটাই ইরাকি জনগণের ধারণা। সাদ্দাম ছিলেন ব্যতিক্রম। সামরিক বাহিনীতে না গিয়ে তিনি তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কিত করলেন রাজীতির সাথে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি বাথ পার্টিতে যোগদান করেন। ৭ই অক্টোবর ১৯৫৯ সালে ইরাকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মি. কাসেমের উপর একটি আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়। হামলাকারী গ্রুপের সাথে সাদ্দাম হোসেনও শরিক ছিলেন। প্রেসিডেন্ট কাসেমের উপর হামলাকারীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল সাদ্দাম হোসেনের উপর। হামলার সময় জনৈক হামলাকরীর রাইফেল বন্ধ হয়ে গেলে সাদ্দাম হোসেন তার পরিবর্তে নিজেই গুলি ছোড়া শুরু করেন। কাসেম-রক্ষীরা পাল্টা গুলী ছুড়লে একটি গুলি এসে সাদ্দামের হাঁটুতে বিদ্ধ হয়। সাদ্দামের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। এ যাত্রা তিনি বেঁচে যান। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনি মিসর পালিয়ে যান। এসময় সাদ্দামা হোসেনের বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট কাসেমও সে যাত্রা বেঁচে যান। আততায়ীরা তার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারেনি।

এ ঘটানার পর সাদ্দাম কায়রোয় তার শিক্ষাজীবন নতুনভাবে শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাগদাদ ইউনিভার্সিটি থেকে আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট কাসেমকে হত্যা করা হয়। কর্নেল আব্দুস সালাম আরিফ ইরাকের নতুন প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ১৯৬৬ সালে একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম আরিফ মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই মেজর জেনারেল আব্দুর রহমান আরিফ ইরাকের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। ইত্যবসরে সাদ্দাম হোসেন বার্থপার্টিতে উত্তর উত্তর পজিশন মজবুত করতে সক্ষম হন। ১৯৬৮ সালে আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের পর মেজর জেনারেল আব্দুর রহমান আরিফকে হটিয়ে দেওয়া হয়। এসময় বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা ছিলেন সাদ্দাম হোসেন। এই অভ্যুত্থানের পর বার্থপার্টি ক্ষমতা লাভ করে। মেজর জেনারেল আহমাদ হাঝান আল বাকার এই অভ্যুত্থানের পর ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ও

প্রেসিডেন্টের পদটি দখল করে বসেন। তবে সর্বময় ক্ষমতা ছিল বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের হাতে। এই কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন প্রেসিডেন্ট আল বাকার। অতঃপর সাদ্দাম হোসেন ঐ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সময়ের সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট আল বাকারের ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য উভয়ই দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট রইলেন। অন্যদিকে অধিকাংশ প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল সাদ্দামের হাতে। ফলে, শুরু হলো সাদ্দাম ও আল বাকার সমর্থকদের মাঝে বৈরিতা। ১৯৭৯ সালে বিপ্লবের ১১ তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে একটি স্বাগত ভষণে প্রেসিডেন্ট আল বাকার প্রেসিপেন্টশীপ ও বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের সকল দায়-দায়িত্ব সাদ্দামকে অর্পণের ঘোষণা দেন। ১৬ই জুলাই ১৯৭৯ থেকে সাদ্দাম হলেন ইরাকের নতুন প্রেসিডেন্ট ও বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের নতুন চেয়ারম্যান। অপরদিকে কৃতজ্ঞতা বশতঃ আহমাদ হাসান আল বাকারকে সাদ্দামের পক্ষ থেকে জাতীয় পিতা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

এটা বড়ই মজার ব্যাপার যে, ইরাক ও সিরিয়ায় বাথপার্টি ক্ষমতাসীন কিন্তু এদের উভয়ের মাঝে কখনও সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিলনা। সিরীয় বাথপার্টির জনক মাশআল আফলাককে পার্টি থেকে এজন্য বহিস্কার করা হয় যে, তিনি বাথপার্টির ইরাকি শাখার সাথে নমনীয় মনোভাব পোষণ করতেন। সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতাসীন হবার পর ইরাকি বাথপার্টির কিছু কিছু সদস্যদের বহিস্কার করার পকিল্পনা হাতে নেয়া হয় যারা ছিল ইরাকি ও সিরীয় শাখার মাঝে বিরোধের আসল কারণ কিন্তু এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে ১৯৮০ সালে ইরাকে আরেকটি রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ২১ জন বার্থপার্টি সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ সময় সাদ্দামের ক্ষমতা এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এরপর সাদ্দাম হোসেন ইরানের দিকে দৃষ্টি দেন আর আগামী আট বছর তিনি ইরানের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তখন অন্যকোন দিকে তাকানোর আর তার কাছে সুযোগ রইল না। ফলে, ইরাকি ইতিহাসে আরও কিছু রক্তাক্ত ঘটনার মাত্রা যোগ হলো।

বই কেনার
সামর্থ্য
থাকলে
বইটি
কিনে পড়ুন

যুদ্ধোত্তর ইরাকি সমস্যা

ইরাক-ইরান যুদ্ধের পর সাদ্দাম হোসেন পড়লেন বিপাকে। ইরাক বৈদেশিক ঋর্ণের ভারে জর্জিত। যুদ্ধের কারণে তার অর্থনীতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ইরাকের ছিল প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অন্যান্য আরব দেশ বিশেষকরে কুয়েতের ব্যবহার ইরাকের সাথে মোটেই উৎসাহবাঞ্জক ছিল না। নির্ধারিত কোটা অপেক্ষা অধিক হারে তেল উত্তোলন ও বারবার কুয়েত কর্তৃক তেলের দাম কম করার ফলে ইরাকি অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। ইরাক-ইরান যুদ্ধ শেষ হবার পর এ ধরনের অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যার ফলে ইরাক কুয়েতের উপর হামলা করতে বাধ্য হয়। ইরাক-ইরান যুদ্ধকালীন সময় কুয়েত ছিল ইরানি হামলা অথবা শিয়া বিদ্রোহ থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত। তবে একথা ঠিক নয় যে, ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় কুয়েতের কোনই ক্ষতি হয়নি। যুদ্ধের ইরানি গোলার আঘাতে কুয়েতের আব্দুল্লাহ নামক সমুদ্র বন্দর সম্পুর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এছাড়া ১৩০ টি কুয়েতি অয়েল ট্যাংকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে কুয়েতও নিরাপত্তাহীনতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। কুয়েতি অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো তেল। যুদ্ধের কারণে আটবছর স্বাধীনভাবে তেল রপ্তানী করতে পারেনি। এ কারণে যুদ্ধ শেষ হবার পর কুয়েত বৃহৎ শক্তিগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। ১৯৮৬ সালে কুয়েত সর্বপ্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তবে এই যোগাযোগ ছিল অনেকটা লোক দেখানো গোছের। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া কী তা জানার জন্যই কেবল কুয়েতের এই যোগাযোগ স্থাপন। আসলে কুয়েত ছিল খুবই সতর্ক। বৃটিশদের ৬০ বছর নিয়ন্ত্রণাধীনকালীন সময় কুয়েত অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। অতএব এই মুহুর্তে কুয়েত তার নিরাপত্তার জন্য নিজের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়ার কল্পনাও করতে পারে না।

ওদিকে সোভিয়েতরা অবিশ্বাস্য রকমভাবে কুয়েতি আগ্রহের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেয়। তারা কুয়েতকে তেল ট্যাংকার ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে। অথচ অতীতে কুয়েত ছিল পশ্চিমা প্রভাব বলয় বেষ্টিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পর কুয়েত আমেরিকার কাছে তেল ট্যাংকার কামনা করে; কিন্তু আমেরিকার কাছ থেকে আশানুরুপ সাড়া পাওয়া যায়নি। ফলে, কুয়েত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করতে বাধ্য হয়। তারপর আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত, সোভিয়েত ট্যাংকারে নিরাপত্তাজনিত কারণে সোভিয়েত পতাকাই ব্যবহৃত

হবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে যখন এ সংবাদ জানানো হয় তখন তিনি কৌতুহলের সুরে জানতে চান এটা কি আসলেও বাস্তব না এপ্রিল ফুলের উপহাস? এ চুক্তি ছিল আমেরিকার জন্য অবিশ্বাস্য। বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উঠার পর আমেরিকা কুয়েতি অয়েল ট্যাংকারগুলোয় মার্কিন পতাকা ব্যবহারের অনুমতি দেয়। কুয়েত আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে এমন ভঙ্গিতে সাহায্য চেয়েছিল যার ফলে তার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি। এই সুবাদে পরাশক্তিদ্বয়ের উপসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনেরও কোন সম্ভবনা ছিল না। কুয়েতে পরাশক্তিদ্বয়ের সামরিক উপস্থিতিরও সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করতে পারে আমেরিকা-সোভিয়েত ইউনিয়নের এমন প্রত্যেকটি অনুরোধ শায়েখ জাবের প্রত্যাখ্যান করে দেন। কুয়েতের পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল এ চুক্তি কেবলমাত্র বানিজ্য চুক্তি। আমেরিকা যুদ্ধ জাহাজ যদি উপসাগরে প্রবেশ করে তাহলে এটাকে কুয়েতের বিরুদ্ধে আগ্রাসন মনে করা হবে। আর এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব হবে। আরবদের নিকট উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া আমেরিকা-কুয়েত তার সার্বভৌমত্বের জলাঞ্জলি না দিয়েই উদ্দেশ্য হাসিলে সফল হয়েছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা-কুয়েত সম্পর্কে নব দিগন্তের সুচনা হয়। কুয়েত আমেরিকাকে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ভাবতে থাকে। সুতরাং ইরাক কর্তৃক আক্রান্ত হলে কুয়েত সর্বপ্রথম আমেরিকাকে সাহায্যের জন্য স্মরণ করে।

এটা ছিল অর্থের বিনিময়ে নিরাপত্তা প্রদানের যুগ। আমেরিকা পয়সার বিনিময়ে তার যোগ্যতার উত্তম পরিচয় দিয়েছে। অনুমান করা হয় যে, কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার পর মিত্রজোটের জন্য ৩ হাজার ৫শ' থেকে ৪ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করা হয়েছে একমাত্র আমেরিকা যুদ্ধকালীন সময় ৬ হাজার ১শ' কোটি ডলার উসুল করে। ফলে, উপসাগরীয় যুদ্ধের পর হঠাৎ করে আমেরিকার অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তবে ইংল্যান্ড খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। সে লাভ করে মাত্র ৮শ' কোটি ডলার। এই অর্থ লাভের ফলে ১৯৯১ সালের প্রথম ছয়মাস সে ভালভাবেই তার ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের সময় আমেরিকা ১৭শ' কোটি ডলারের বিনিময়ে কুয়েত ও সৌদি আরবকে নিরাপত্তা খরিদ করতে বাধ্য করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে মিসরের ৭শ' কোটি ডলার ঋণ মাফ করে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধ অংশগ্রহণের জন্য সিরিয়াকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য মাল্যে ভুষিত করা হয়। ইরাকের বিরুদ্ধে হামলার সময় মিত্রশক্তিকে বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করতে

দেওয়ার কারণে তুরস্ক সাড়ে তিনশ' কোটি ডলারের অনুগ্রহ লাভ করে। ধারণা করা হয় এই যুদ্ধে তুরস্কের খরচ হয় মাত্র সত্তর কোটি ডলার।

এই যুদ্ধ ছির একটা ত্রিমুখী খেলা। কোন দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিলে অন্যদেশ অর্থের বিনিময়ে তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার অফার নিয়ে এগিয়ে আসে। আর তৃতীয় দেশ এই সুযোগ গ্রহণের চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। নিরাপত্তা আর নিরাপত্তাহীনতা উভয়ই সর্বদা পণ্যসামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে তবে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় যেমন নিলজ্জভাবে এই পণ্যের বেচাকেনা হয় ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। সার্বভৌমত্ব রক্ষার এই খেলাটি ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময়ও খেলা হয়। ইরাকের ধারণায় ইরাক-ইরান যুদ্ধের ব্যয়ভার সমস্ত আরব দেশের বহন করা উচিত। সেসময় ইরানি-বিপ্লব সকল আরবদেশের জন্য ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইরাক তখন তার নিরাপত্তা বিকিয়ে দেয়। খরিদ্দার ছিল সৌদি আরব ও কুয়েত। ইরাক ইরানি বিপ্লবের ভীতিকে খুব বাড়িয়ে প্রচার করে। এই ভীতি মারাত্মক আশংকাজনকভাবে প্রচার হওয়াটাই ছিল ইরাকি স্বার্থের অনুকূলে। ইরানি বিপ্লবকে ঠেকাতে আরব দেশগুলির কোষাগারের মুখ খুলে দেওয়া হয়। যুদ্ধের সময় সর্বমোট ইরাককে ৪ হাজার ২শ' কোটি ডলার সাহায্য দেওয়া হয়। এটা ছিল ইরাকের বাৎসরিক জাতীয় আয়ের সমান। এই অংকের মধ্যে ১হাজার ৫শ' কোটি ডলার কুয়েত একাই ইরাককে দেয়। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, ইরানি বিপ্লবের কারণে কুয়েত কতটা সন্ত্রস্ত ছিল। এ সময় কুয়েতের পত্র-পত্রিকায় সাদ্দাম হোসেনকে আরব জাতির হিরো ও রক্ষক হিসাবে পেশ করা হয়।।

আরব ঐক্যের মূলে ফাটল

ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় আরববিশ্বকে খুব ঐক্যবদ্ধ মনে হয়; কিন্তু যুদ্ধের পর আরব ঐক্যের মূলে ফাটল ধরে। তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরবরাষ্ট্রগুলির মতানৈক্য কোন নতুন ঘটনা নয়। তবে তাদের মতানৈক্য আশির দশকের শেষের দিকে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। ১৯৮০ সালে আরব অনৈক্যের ভিত্তি তখন স্থাপিত হয় যখন আরব শায়েখরা জি.সি.সি এর (উপসাগরীয় সহযোগীতা পরিষদ) বুনিয়াদ রাখে, তখনই এই অনৈক্যের সুত্রপাত হয়। ধনী আরব আমিরাত ও ওমানের সমন্বয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হয়। এই কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে ধনী ও গরীব দেশের মাঝে পার্থক্য পরিস্কার হয়ে ওঠে; কিন্তু ইরাক-ইরান যুদ্ধের কারণে আরবদের মত পার্থক্য অনেকটা ধামাচাপা পড়ে যায়। ওদিকে ইরানি বিপ্লব-জুজু ইরাককে সহযোগিতা পরিষদের একটি প্রাথমিক পর্যায়ের মিটিংয়ে সাদ্দাম হোসেন অংশগ্রহণ করেন; কিন্তু এরপর আর কোন মিটিংয়ে অংশগ্রহণের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ফলে ইরাকের বিরাগভাজন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। ধনী আরব দেশগুলির স্বার্থ রক্ষার খাতিরে আসলে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ গঠন করা হয়। জি.সি.সি এর পর এ.সি.সি অর্থাৎ আরব সহযোগিতা পরিষদ গঠন করা হয়। এই সহযোগিতা পরিষদ গঠনের কারণে আরব ঐক্য অধিক চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ১৯৮৯ সালে জর্ডানের বাদশা শাহ হুসাইন আরব সহযোগিতা পরিষদের আন্দোলন শরু করেন। তিনি ইরাক, মিশর ও জর্ডানের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক গ্রুপ গঠন করার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে পরামর্শ দেন। তার ধারণায় জর্ডানের সুশিক্ষিত লেবার ফোর্স, ইরাকের সামরিক শক্তি ও আর্থিক সচ্ছলতা, আর মিসরের জনশক্তি সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ব্লক গঠন করা সম্ভব। এই শক্তিশালী ব্লকের নিয়ন্ত্রণে থাকবে লোহিত সাগর, রোম সাগর ও শাতিল আরবের মত বন্দরসমূহ। শাহ হুসাইন ও সাদ্দাম হোসেন সম্মিলিতভাবে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারকের কাছে উপরোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন। আরব ব্লকে ফিরে আসার ব্যাপারে এটা ছিল মিসরের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ। মোটকথা উক্ত দেশত্রয় মিলে একটি নতুন আরব সহযোগিতা পরিষদ গঠনের ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হয়। তিনি সপ্তাহের ভিতর এর উদ্দেশ্যে সকল প্রয়োজনীয় কাজ সমাধান করে নেওয়া হয়। শেষ পর্যায়ে ইয়েমেনকেও এই পরষদে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। এভাবে আরববিশ্বে

একটি নতুন শক্তিশালী ব্লক গঠিত হয়। মজার ঘটনা হলো, আরব সহযোগিতা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত চারটি দেশের প্রত্যেকটির নিজস্ব স্বার্থ এই পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই পরিষদে অন্তর্ভুক্তের কারণও ছিল প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। যেমন ধরুন ইসরায়েল ও ধনী আরব দেশগুলির মাঝে জর্ডান অবস্থিত, দেশটি তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে ছিল আশংকাগ্রস্ত। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবে জর্ডান দুর্বল। শাহ হুসাইনের ধারণা ছিল এমন ধরনের একটি শক্তিশালী ব্লক গঠিত হলে তার সমস্যাগুলির একটা সুরাহা সম্ভব হবে। কারণ, ইরাক জর্ডানীদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে। সাদ্দাম হোসেনের নিকট আরব সহযোগিতা পরিষদ বিভিন্ন দিক দিয়ে ফলপ্রসু হতে পারে। যেমন, ইরান যুদ্ধবিদ্ধস্ত হওয়া সত্ত্বেও সবদিক থেকে সে ইরাকের তুলনায় ছিল অগ্রগামী। ইরান ইরাকের তুলনায় আয়তনে চারগুণ বড়। আর ইরাকের তুলনায় তার জনসখ্যা তিনগুণ বেশি। এছাড়া ইরাকের তুলনায় আটগুণ বেশি কাঁচামাল ইরানে উৎপন্ন হয়। অতএব সাদ্দামের ধারণায় আরব সহযোগিতা পরিষদের মাধ্যমে একিট শক্তিশালী ব্লক গঠিত হলে ইরান-ইরাকের মাঝে যে ব্যবধান তা কমিয়ে আনা সম্বব। এতদ্ব্যতীত এই ব্লককে প্রয়োজনে সিরিয়ার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা সম্ভব। এই ব্লকে অংশগ্রহণের সুবাদে ইরাক জর্ডানের মাধ্যমে লোহিত সাগর পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হবে। সাদ্দাম হোসেন ও শাহ হুসাইনের দৃঢবিশ্বাস ছিল মিসরের সমন্বয়ে তার এ অঞ্চলে এমন একটি শক্তিশালী ব্লক গঠনে সক্ষম হবে যা, আগামী দিনে আরববিশ্বের নেতৃত্ব দিবে। এমন একটা ব্লকের জন্ম মিসরের জন্যও ছিল কল্যাণজনক এবং এই সুবাদে তার দেশের বেকারত্ব দূর করার একটা উজ্জল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনে মিসরীয় জনশক্তি বিরাট অবদান রাখতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা ক্যাম্পডেভিড চুক্তির কারণে মিসরকে আরব দুনিয়া থেকে বের করে দেওয়া হয়। এমন একটা ব্লক গঠন হলে মিসর পুনুরায় আরব দুনিয়ায় ফিরে আসার সুযোগ পাবে।

আরব সহযোগিতা পরিষদ ও উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ উভয়ের মাঝে ছিল যথেষ্ট ত্রুটি বিচ্যুতি। আশির পুরো দশকে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের ভাব-লক্ষণ দেখে মনে হয়েছে, ধনী আরব দেশগুলির স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এই পরিষদ গঠন করা হয়েছে। আরো মজার ব্যাপার হলো এই পরিষদে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি ছিল পরস্পরের প্রতি সন্দিহান। ইরাকের সামরিক শক্তি আর ইরানের ইসলামি বিপ্লব-জুজু তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে শরিক দেশগুলি

অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে আরব সহযোগিতা পরিষদ গঠন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে চারটি দেশই ছিল বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। একে অপরকে সমস্যামুক্ত করার উদ্দেশ্যে আরব সহযোগিতা পরিষদ গঠন করা হয় এ ধারণা ছিল সম্পুর্ণ ভুল। কারণ, প্রত্যেকেই বিভিন্ন কারণে এই পরিষদে শামিল হয়। প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করা। আসলে এই পরিষদ ছিল ঐক্যের পরিবর্তে নিরাশার প্রতীক। ফলে অচিরেই তার দুর্বল দিকগুলো খুব সহজেই ধরা পড়তে শুরু করে। এই পরিষদ গঠনের মাত্র দু'বছরের মাথায় হোসনী মুবারক বলতে বাধ্য হন এটাকে আরব সহযোগিতা পরিষদ না বলে বরং ষড়যন্ত্র পরিষদ বলাটাই উত্তম হবে। মোটকথা আশির দশক শেষ হতে না হতে আরব বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আমীর-গরীব বা ধনী-দরিদ্র। এরা পৃথিবীর অপরাপর শক্তির মুকাবিলা তো দুরে থাক এক অপরকে মুখ দেখাবার উপযুক্তও রইল না।

ইরাকের বিরুদ্ধে মিত্রজোট কেন তেড়ে এসছিল?

কুয়েতের সার্বভৌমত্ব পূনঃপ্রতিষ্টার জন্য উপসাগরীয় যুদ্ধ মোটেই সংঘটিত হয়নি। আর ইরাকি আগ্রাসনের কারণেও ইরাককে শাস্তি দেওয়া হয়নি। আসলে তেল নামক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ২০শে জানুয়ারী ১৯৯০ আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মি. জর্জ বুশ গর্বের সাথে বলেছিলেন, বিংশ শতাব্দীও হবে আমাদের শতাব্দী। প্রেসিডেন্ট বুশের এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার জন্য যে সব এলিমেন্টের প্রয়োজন ছিল তা কীভাবে পূরণ হবে সে সম্পর্কে ঐ ভবিষ্যদ্বণীতে কিছুই বলা হয়নি; কিন্তু যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করা হয় তাহলে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর মমার্থ বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

যুক্তরাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীতে একটি পরাশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই সর্বপ্রথম বিপুল পরিমাণে কূপ খনন করে তেল উত্তোলনের কাজ শুরু করেছে। তারাই সর্বপ্রথম তেলের ব্যাপক ব্যবহার পরিচিত করিয়েছে। আমেরিকাই একমাত্র দেশ যার কাছে তেলের ষ্টক এত বেশি যে, যে কোন বড় যুদ্ধের সময় বিরামহীনভাবে নিয়মিত সে তেলের যোগান দিয়ে যেতে পারবে। সর্বপ্রথম তেলসমৃদ্ধ দেশ হিসাবে তেল মার্কেটের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আমেরিকা। দেশটি সর্বপ্রথম এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে যে, তেলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার উৎপাদিত পণ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সৌদি আরবের গুরুত্ব সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে তারা। ইংল্যান্ডের পর আরবদের তেলের উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। একবিংশ শতাব্দীতে যদি মি. বুশের ভবিষ্যদ্বণীকে সত্য প্রমাণ করতে হয় তাহলে আমেরিকাকে বিংশ শতাব্দীর অবস্থানে দৃঢ়ভাবে মজবুত থাকতে হবে। ভবিষ্যতে কী হবে সে সম্পর্কে আগাম কিছুই বলা যায় না। একবিংশ শতাব্দীতেও আমেরিকা পরাশক্তি থাকবে কিনা তাও বলা মুশকিল। তবে একটা ব্যাপার খুবই পরিস্কার তা হচ্ছে আগামী শতাব্দীতেও তেল নামক সম্পদটি তার আপন মর্যাদায় বলীয়ান থাকবে এ কথাটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়। অতএব তেল ও রাজনৈতিক শক্তির মাঝে আগামী আরও কয়েক দশক ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে একথা দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে বললে মনে হয় অতিরঞ্জিত কিছুই বলা হবে না।

শক্তির ভারসাম্যের ব্যাপারে তেল যে প্রধান ভুমিকা পালন করছে এ সত্য অস্বীকার করার জো নেই। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যবর্তী সময় প্রতি

ব্যারেল তেলের মূল্য হঠাৎ করে ২ ডলার থেকে ১১ ডলারে উপনীত হলে উন্নতবিশ্ব তেলের বিকল্প খুঁজে বের করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সাময়িকভাবে তেলের কিছু বিকল্প খুঁজে বের করা হলেও সেগুলো সব ছিল ব্যয়বহুল, নিরাপত্তাবিহীন ও অকার্যকর। এটমিক এনার্জির সাতে সব থেকে বড় সমস্যা হলো তেজস্ক্রীয়তা। তেজস্ক্রীয়তাজর্নিত কারণে পরিবেশ দূষণের আশংকা সর্বদাই লেগে রয়েছে। এছাড়া অধিকহারে পারমাণবিক প্লান্ট স্থাপনের ফলে জনগণের মাঝে বিরুপ প্রতিক্রিয়াটাও কম আশংকার কারণ নয়। ইতালির কাছে যদিও প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ারের মজুদ খুব কম, কিন্তু তারপরও গণবিক্ষোভের ফলে সে তার এটমিক রিএক্টর প্লান্ট বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তেলের বিকল্প খুঁজতে উন্নতবিশ্ব এটমিক এনার্জির সাথে সাথে আর কোন উপায় উপকরণকে এ উদ্দেশ্যে কাজে লাগান যায় কিনা সে ব্যাপারেও যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছে। একসময় সূর্যের তাপকে তেলের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সূর্যের তাপ তেলের বিকল্প হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। দেখা গেছে মারাত্মক তীব্র রোদ ছাড়া গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। আকাশ মেঘলা থাকলে কোন অবস্থাতেই গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। ক্যালিফোর্নিয়া ও স্কটল্যান্ডে প্রবলবায়ু থেকে এনার্জি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয় কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় খুব অল্প এনার্জি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। জোয়ার-ভাটা আর সামুদ্রিক স্রোত দ্বারা এনার্জি তৈরির চেষ্টা করা হয় কিন্তু এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মজার ব্যাপার হলো, এটমিক এনার্জি উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্বে ফ্রান্স এলকোহল দ্বারা গাড়ি চালানোর প্রচেষ্টা চালায় অধিকমাত্রায় এলকোহল প্রস্তুত করার জন্য সূর্যমুখী ও অন্যান্য বীজের পর্যাপ্ত পরিমাণ চাষের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা হয়। কিন্তু ফরাসীদের এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থতার গ্লানি মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়। কারণ, ফ্রান্সের অর্থনীতিতে কৃষি পণ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এলকোহল তৈরির জন্য বিস্তীর্ণ ভূমি প্রয়োজন। এছাড়া পেট্রোলের তুলনায় এলকোহল তৈরি করা অত্যান্ত ব্যয়বহুল ব্যপার। এসব কারণে অধিক মাত্রায় এলকোহল তৈরীর চিন্তা ভাবনাও বাদ দেওয়া হয়। পূর্বের ন্যায় কয়লার ব্যাপক প্রচলন ঘটানো যায় কিনা সে বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা করা হয়। কিন্তু সমস্যা হলো এই প্রক্রিয়ায় চিমনীর যুগকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে মুশকিল হলো আধুনিক শিল্প জগতে চিমনীর কোন অস্তিত্ব নেই। এছাড়া ব্যাপকহারে কয়লার ব্যবহার পরিবেশ দূষণ প্রকিয়াকে ত্বরানিত করবে। মোটকথা আশির দশকের শেষ নাগাদ গোটা বিশ্ব এই সত্যকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় যে, এ

পৃথিবীতে তেলের কোন বিকল্প নেই। অদূর ভবিষ্যতেও তেলের কোন বিকল্প খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

তেলের বিকল্প অনুসন্ধানে ব্যর্থতাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিদদের তেলের গুরুত্ব নতুনভাবে অনুধাবনে বাধ্য করে। যদিও অধিকহারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু অন্যসব বিকল্পের তুলনায় তেল আজও সস্তা। কিছু সংখ্যক পর্যবেক্ষকদের ধারণায় তেলের বিকল্প তৈরির চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে আরব তোষণনীতি এর একমাত্র বিকল্প হতে পারে। স্নায়ুযুদ্ধ যদি আরও দশ বছর পূর্বে শেষ হয়ে যেত তাহলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কগণ এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতেন। তারা ১৯৮৫-৮৬ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন উপসাগরীয় দেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বসে কিনা এই দুশ্চিন্তায় শংকিত ছিলেন। এ পর্যন্ত সোভিয়েত জুজুকে সামনে রেখেই তারা ষ্ট্রাটেজী বিন্যস্ত করেন।

স্নায়ু যুদ্ধের শেষের দিকেও উভয় পরাশক্তি পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকে। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি বৈঠক মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকাল ধরে উভয় শক্তির মাঝে যে ভুলবুঝাবুঝি সঞ্চারিত ছিল সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করাই ছিল এই বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য। উক্ত বৈঠকে আফগানিস্থানে সোভিয়েত আগ্রাসন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে "আনাতোলী ডোবরাঈনীন" বলেন কাবুলের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্তস্বরুপ তাড়িঘড়ি করে কাবুলে সোভিয়েত সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেবলমাত্র তিনজনে মিলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উল্লেখ্য মি. ডোবরাইনীন হলেন ক্রেমলীন সরকারের প্রধান এডভাইজার। যে তিনজনে মিলে আফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন তারা হলেন - তৎকালিন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ও কমিউনিষ্ট পাটির জেনারেল সেক্রেটারি লিওনিদ ব্রেজনেভ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল স্তোনোভ, প্রধানমন্ত্রী এলেক্সী কোসেগীন।

আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রাক্তন উপদেষ্টা মি. ব্রেজনস্কী মি. ডোবরাঈনীনের বক্তব্যে রাগান্বিত হয়ে বলেন, আমি কি করে মেনে নিতে পারি যে, কাবুলের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে বিরুপ প্রতিক্রিয়াস্বরুপ সোভিয়েত সেনা সেখানে পাঠানো হয়েছে? অথবা মাত্র তিনজনে মিলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমি একদিন রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম সকালবেলা ঘুম থেকে

উঠে শুনলাম সোভিয়েত সেনারা আন্তজার্তিক সীমান্ত অতিক্রম করে কাবুলের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রথমে ধারণা ছিল উপসাগরীয় তেলকে কুক্ষিগত করার এটা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহীত প্রথম পদক্ষেপ। তখন এ ছাড়া অন্য কোন কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। উপরে বর্নিত উভয় পরাশক্তির চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাদের চিন্তাধারায় কী বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সারা বিশ্বের মোট তেলের শতকরা ৬৩% ভাগ উত্তোলন হতো আমেরিকা থেকে। আমেরিকাকে তেল সরবরাহে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কারণ, জার্মান গানবোটগুলি ছিল তখন খুবই তৎপর। ফলে আমেরিকান তেলবাহী জাহাজগুলি নির্বিঘ্নে যতায়াত করতে পারত না। এ তিক্ত অভিজ্ঞতা আমেরিকার চিন্তাধারা বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। এরপর সে উপসাগর বা তার আশপাশের অঞ্চলে সংঘটিত যে কোন ঘটনাকে তেলের সাথে সম্পৃক্ত করতে থাকে। আমেরিকানা সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকে যে তেলের সাপ্লাই যেন কোনভাবে বন্ধ না হয়ে যায়। এ কারণে সমুদ্র পথে নিরাপদ যাত্রাও তেলের নির্বিঘ্ন সাপ্লাইকে আমেরিকার বৈদেশিক নীতিতে সর্বাধিক আগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তেলের ব্যাপারে আমেরিকা ছিল সম্পুর্ণ স্বনির্ভর। তার এ অবস্থা বেশিদিন টিকে থাকেনি। ১৯৮০-এর শেষ নাগাদ সে তার প্রয়োজনের অর্ধেক তেল বহির্বিশ্ব থেকে আমদানী করতে বাধ্য হয়। জাপানের অবস্থা আরও করুণ। দেশটি প্রয়োজনীয় তেলের ৬১% বাহির থেকে আমদানী করে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা ছিল ভিন্নতর। বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ সমুহের অন্তর্ভুক্ত। তবে সাইবেরিয়া অঞ্চলে তেলের অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তাদেরও ব্যর্থ হতে হয়। তৃতীয় বিশ্বের ভিতর চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রাজিল এই সকল দেশকে ঘুমন্ত নগরী বলা হতো। এরাও আস্তে আস্তে জাগতে শুরু করে। বর্তমান বিশ্বে তেলের শতকরা ৭৫% শিল্পোন্নত দেশগুলি ব্যবহার করে থাকে কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের শিল্পোন্নয়নের ফলে তেলের প্রয়েজন দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ৭০ এর দশকে যে হারে তেলভান্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে তা যদি বলবৎ থাকত তাহলে তেলের প্রয়োজন মিটানো খুব একটা মুশকিল ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আশির দশকে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে যায় যে, মাটির অভ্যান্তরে কালো সানার ভান্ডার এতা বিপুল পরিমাণে মজুদ নেই যে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট হতে পারে। বৃহৎ আকারের তেলভান্ডার অনেক

আগেই শেষ হয়ে গেছে নতুন যেসব তেলভান্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে এসব ভান্ডারে প্রয়োজনের তুলনায় তেলের পরিমাণ খুব কম। ১৯৮৫ সালে আমেরিকার এনার্জি বিভাগ তেলের চাহিদার ব্যাপারে একটি রিপোর্ট তৈরি করে। এই রিপোট অনুযায়ী প্রয়োজনের তুলনায় তেলের পরিমাণ কম হওয়ায় আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, ২০০০ হাজার সাল নাগাদ ব্যারেল প্রতি তেলের মূল্য দাঁড়াবে ৮০ ডলার। আর দু'হাজার দশ সাল পর্যন্ত এই মূল্য দাঁড়াবে ১১০ ডলার।

আশির দশকের শেষ দিকে সকল উন্নত পশ্চিমা দেশ এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয় যে, একবিংশ শতাব্দীতে তাদের সার্বিক সচ্ছলথা ও সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর নির্ভরশীল থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ভান্ডার প্রতিদিন হ্রাস পাচ্ছে অথচ আজও পর্যন্ত তেলের কোন বিকল্প উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ক্রমে উন্নত বিশ্বের পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করেছে। অতএব তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের তেল সংরক্ষণ অতীব প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মধ্যপ্রাচ্যের দুর্বল রাজনৈতিক অবকাঠামোর কারণে আরবরা পারস্পরিক দ্বন্দে লিপ্ত। তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ তেলভান্ডারের নিরাপত্তার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইরাকের কুয়েত দখলের বহুপূর্বে ১৯৭৪ সালে আমেরিকা এই বলে সবাইকে হুশিয়ার করে দিয়েছিল যে মধ্যপ্রাচ্য যদি কখনও হুমকির সম্মুখিন হয় তাহলে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। পশ্চিমারা খুব ভাল করেই জানত যে আজ হোক অথবা কাল একদিন না একদিন মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ অনিবার্য।

মানুষের জন্মগত স্বভাব হলো সে তার শত্রুর শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়। এর ভিতরই তার মর্যাদা নিহিত। জামাল নাসেরের জীবন থেকে যদি ইসরায়েল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তার শ্রম ও প্রচেষ্টাকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে তার জীবনের উল্লেখযোগ্য কোন মূল্যায়ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। হিটলার না থাকলে চার্চিল কখনও ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না। পশ্চিমারা ভিয়েতনামের হিরো হোচিমিন-এর নাম কখনও জানতে পারত কি যদি জন এফ, কোনেডী, জনসল ও নিক্সন তার বিরুদ্ধে নিপীড়নমুলক নীতি গ্রহণ না করতেন? আইসেন হাওয়ার থেকে শুরু করে আমেরিকার প্রতিটি প্রেসিডেন্ট তার সোভিয়েত প্রতিপক্ষের সাথে

তুলনামূলক বিচার অবশ্যই করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিটি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আন্তরিকভাবে কামনা করেছেন যে, তাকে পশ্চিমা জগতের রক্ষক হিসাবে স্মরণ রাখা হোক। এ কারণে প্রত্যেক সোভিয়েত ভীতিকে বাড়িয়ে-চাড়িয়ে প্রচার করেছেন তবে ১৯৮৫ সালের পর অবস্থা অন্যদিকে মোড় নেওয়া শুরু করে। স্নায়ুযুদ্ধ তখন শেষ হয় হয় ভাব। আমেরিকান মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে তখন কোন নতুন টার্গেট ছিল অবশ্যক। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন পর্দার অন্তরালে যাওয়া শুরু করেছে। জুন ১৯৮৯ পোল্যান্ডের প্রথম সাধারণ নির্বাচন কম্যুনিষ্ট পার্টির ভরাডুবি পুরো পূর্ব ইউরোপে যে একটা আমূল পরিবর্তন আসছে সেদিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। অক্টোবরে হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। অতঃপর পুর্ব জার্মানীর প্রেসিডেন্ট এরিক হোনেকার ক্ষমতা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তারপর তার পুরো মন্ত্রিপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এরপর বুলগেরিয়া ও চেকোস্লোভিয়াতেও এ ধরনের বিপ্লব পরিলক্ষিত হয়। ২৮শে নভেম্বর ১৯৮০ পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল উভর জর্মানীকে পুনরায় একত্রীকরণের একটি প্রস্তাব পেশ করেন। পশ্চিমাদের ধারনায় মি. কোহল আগাম পাঁচ বছর আগে প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন। অর্থাৎ তাদের ধারণায় তাঁর প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে হতে আগামী আরও পাঁচ বছর সময় লাগবে। এই মুহুর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনক্রমেই এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ কাল্পনাতীতভাবে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মি. গর্বাচেভ উক্ত প্রস্তাবকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তবে তিনি স্বীকৃতির আগে কিছু রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা দাবি করেন। ২ অক্টোবর ১৯৯০ উভয় জার্মানী আরব একীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় কেবল স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয় তাই নয়, বরং পশ্চিমারা কয়েক দশক ধরে যে রাশিয়ান শ্বেত ভাল্লুকের ভয়ে ছিল কম্পমান তা চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয়।

স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর আমেরিকার সকল প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। বৃহৎ সেনাবাহিনী আর বড়-সড় ধরনের প্রতিরক্ষা বাজেটের আর কোন যুক্তি রইল না। সামরিক শক্তি অর্জনের পর সুপার পাওয়ার আপন মর্যাদায় টিকে থাকা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব ছিল কি? আসলে কোন বড় শক্তির অস্তিত্বহীনতাই ছিল আমেরিকার সবচে' বড় সমস্যা। সোভিয়েত সুপার পাওয়ারের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হওয়ার পর আমেরিকার প্রয়োজন ছিল নতুন কোন দুশমনের। যার ধুয়ো তুলে সারাবিশ্বে সে আপন মর্যাদায় মহিমান্বিত হয়ে থাকবে চিরকাল।

আমেরিকা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে ইরাকে সাদ্দাম হোসেন ও ঠিক এমনিতর এক সমস্যার ভুগছিলেন। ইরানের পরাজয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইরাকের জন্য ছিল একটি বড় ধরনের বিজয়। ইরাক এখন নিজেকে আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার জ্ঞান করতে থাকে। তার আন্তরিক কামনা ছিল পার্শ্ববর্তী দেশগুলো তাকে আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করুক, তবে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় তার জন্য কোন কিছু করা সম্ভব ছিল না। এদিক থেকে ইরাক ছিল সৌভাগ্যবান যে, আমেরিকার মত দুশমনের অস্তিত্বহীনতা তাকে ভাবিয়ে তোলেনি। ইরাকের এ প্রয়োজন মিটাতে ইসরায়েল বাহাদুর বহাল তবিয়তে মওজুদ ছিল কিন্তু সমস্যা হলো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ইসরায়েল বাহাদুরকে কীভাবে রাজী করা যায়? বিগত কয়েক মাস ধরে ইরাক ফিলিস্তিনী ইনতিফাদাহ আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যাপক সমর্থন দিয়ে আসছিল। ইরাকের এই সমর্থন বড় ধরনের কোন আরব ইসরায়েল সংঘর্ষের সৃষ্টি করবে এমন কেন ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ইরাককে অন্যপথ অবলম্বন করতে হয়।

আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব মি. ডিকচেনী শান্তিপুর্ণ অবস্থান ও নিরাপত্তার স্বার্থে একটি বড় সামরিক বহিনী এবং বৃহৎ আকারের প্রতিরক্ষা বাজেট বলবৎ রাখার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রকে পরামর্শ দেন, কিন্তু নিজের বক্তব্য প্রমাণ করতে তখন তাকে যথেষ্ট হিমশিম খেতে হয়েছে। মোটকথা মি. ডিকচেনীর বক্তব্য ছিল কোন শহরের শান্তিপূণর্ বণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি শক্তিশালি ও সতর্ক পুলিশ বাহিনীর অতীব প্রয়োজন রয়েছে। কোন শহরের মেয়র পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব বিলোপের কল্পনাও করতে পারে না। বিশ্বে শান্তিপুর্ণ পরিবেশ টিকিয়ে রাখার জন্যও একটি শক্তিশালী আমেরিকান বাহিনীর প্রয়োজন। আসলে আমেরিকা নিজেকে সারা পৃথিবীর কর্তা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অতীত অনেক আঞ্চলিক সমস্যার ব্যাপারে আমেরিকার দাদাগিরি যথেষ্ট কাজে লেগেছে কিন্তু বর্তমান অবস্থা ছিল একটু অন্যরকম।

ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ এর শেষের দিকে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন আম্মানে আরব সহযোগিতা পরিষদের উদ্যোগে আরব রাষ্ট্র প্রধানদের এক সভায় ভাষণ দেন। সাদ্দাম হোসেনের এই ভাষণ দ্বারা তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, যারা আরব-ইসরায়েল সমস্যাটি কুটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পক্ষপাতী ছিলেন, তাদেরকে এই সত্য স্বীকার করে নিতে হয় যে, আরব জনগণ এখনও কুটনৈতিক আলোচনার পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের

পক্ষপাতী। সাদ্দাম তার ভাষণে ফিলিস্তিনী জনগণের করুণ অবস্থা আর ইসরায়েলি জুলুম-নির্যাতনের সচিত্র প্রতিবেদন তুলে ধরেন। পূর্ব-পশ্চিমের দেশগুলিতে নাটকীয় পরিবর্তনের সুবাদে তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পৃথিবীতে ভারসাম্যহীনতা প্রকট আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় আশংকা করা হচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমেরিকা একটি ঔদ্ধত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করবে। সাদ্দাম বলেন, আরবরা কখনও কল্পনাও করেনি যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এভাবে আমেরিকার সামনে নতিস্বীকার করবে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আগামীতে মধ্যপ্রাচ্যের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সে তার চেষ্টার ত্রুটি করবে না। সুতরাং এখন থেকে আরবদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়ার দরকার। সাদ্দাম হোসেন তার ভাষণে মিসর-আমেরিকা বন্ধুত্বপূণ সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, পৃথিবীতে একতরফা প্রেমের কোন যুক্তি নেই। আমাদের সামনে কেউ কেউ এসে এ দাবি করেন যে, সে আমেরিকার বন্ধু.. স্মরণ রাখবেন আমাদেরকে স্বনির্ভর হতে হবে। নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তা নাহলে অন্যদের মত আমাদেরও আমেরিকার সামনে স্যারেন্ডার হতে হবে। সাদ্দাম হোসেন তার ভাষণের শেষে বলেন- আমার বক্তব্যের কারণে মিসরের প্রেসিডেন্ট জনাব মুবারক লজ্জিত হয়েছেন জানি। হোসনী মুবারক সমীপে তিনি তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আমরা বর্তমানে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অবস্থান করছি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতি আমি আমার ভাষণে কঠোর ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি, আমরা জানি জর্ডানের টেলিভিশন প্রোগ্রাম অধিকৃত আরব এলাকায় দেখা হয়। অতএব আমি আমার ভাষণে আমার যেসব ভাইরা ফিলিস্তিন ইনতিফাদাহ আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তাদেরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছি।

আমেরিকা তার যে দুশমনের সন্ধান করে ফিরছিল সাদ্দামের আকৃতিতে সে তার সন্ধান খুঁজে পায়। সাদ্দামের ভাষণের পর হোসনী মুবারকের ভাষণ টেলিকাস্ট করা হয়। তিনি তার ভাষণে সাদ্দামের দেওয়া বক্তব্যের কারণে যে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা দূর করার চেষ্টা করেন। ইরাক-আমেরিকা সম্পর্ক পূর্বেই খুব একটা ভাল ছিল না। সাদ্দাম হোসেনের এই ভাষণের পর উভয়ের সম্পর্কে চরম অবনতি ঘটে।

ঘটনা প্রবাহ

১৯৮৯-এর শেষে ১৯৯০-এর শুরুতে আমেরিকা-ইরাক সম্পর্কে দারুণ অবনতি হয়। উভয়দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে অপবাদের বৃষ্টি বর্ষণ করে। বিভিন্ন এলিমেন্টের ভিত্তিতে সহজেই অনুমান করে নেওয়া সম্ভব হয় যে, আমেরিকা-ইরাকের অবনতিশীল সম্পর্ক এমন প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুবে, যেখান থেকে পিছনে ফেরার আর কোন উপায় থাকবে না অর্থাৎ সম্পর্ক স্বাভাবিক করণের সকল পথ বন্ধ হয়ে যাবে। উভয় দেশের মাঝে প্রথম শুরু হয় বাকযুদ্ধ। তারপর শুরু হয় আসল যুদ্ধের প্রস্তুতি।

সাদ্দাম হোসেনের ধারণায় ইসরায়েল, আমেরিকা ও ইংল্যান্ড মিলে ইরাকের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র তৈরি করেছে। দুই ভাগে বিভক্ত করে এই ষড়যন্ত্র কার্যকর করা হয়েছে। উক্ত ষড়যন্ত্রের একটি ভাগকে সম্পুর্ণ গোপন রাখা হয় আরেকটি ছিল সম্পুর্ণ প্রকাশ্য, খোলামেলা। সাদ্দামের ধারণায় প্রথম ধাপটির সূচনা হয় নব্বই দশকের মাঝামাঝি। এ সময় আমেরিকা-ইসরায়েল মিলে ইরানকে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করে।

তখন অনেকেই সাদ্দাম হোসেনকে বিভিন্ন উপায় সন্দিহান করে তোলে। জনৈক রাষ্ট্র প্রধান ১৯৮৬ সালে সাদ্দামকে অবহিত করেন যে, আমার দেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদুতের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারলাম, আমেরিকা, সৌদি আরব, কুয়েত এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এই যুদ্ধে (ইরাক-ইরান) ইরাককে নিরংকুশভাবে বিজয়ী হতে দেওয়া যাবে না। শুধু তাই নয় বরং যুদ্ধের পর ইরাককে বিভক্ত করে দেওয়া হবে। এই রাষ্ট্র প্রধানকে তার নাম জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তার নাম প্রকাশ করতে অসম্মতি জানান। তবে একটি সূত্রে প্রকাশ, এই রাষ্ট্রপ্রধান যখন সৌদি আরব পৌঁছে এবং শাহ ফাহাদকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করেন তখন শাহ এ বিষয় কিছুই জানেন না বলে জানান।

ষড়যন্ত্রের এই কাহিনী অর্ধেক সত্য ও অর্ধেক মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমেরিকা চেয়েছিল ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরাক যেন নিরংকুশ বিজয় লাভ না করে। তবে যুদ্ধের পর ইরাককে বিভক্ত করার কোন ষড়যন্ত্রের হদিস খুঁজে পওয়া যায়নি। যদি এ ধরনের কোন প্লান তৈরি করা হতো তাহলে ইরাক-কুয়েত সংকট নিস্পত্তির পর ইরাককে বিভক্ত করা খুবই সহজ ছিল কিন্তু এমনটি হয়নি।

১৯৯০-এর প্রথমার্ধে এমন কোন সপ্তাহ অতিবাহিত হয়নি যে সপ্তায় ওয়াশিংটন, তেলআবিব ও বাগদাদের পক্ষ থেকে এক অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেনি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৮৯-এর শেষের দিকেই অমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সহজেই ধরে নেওয়া হয়েছিল যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ১৯৯০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকার এসিসটেন্ট সেক্রেটারি অব ষ্টেট 'জনকেলী' বাগদাদে সাদ্দামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে অবহিত করেন যে, ষ্টেট ডিপাটমেন্টের মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টে ইরাকের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করা হবে। বিশেষকরে ১৯৮৮ সালে কুর্দী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সে যে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছে তাকেই প্রধান টার্গেট বানানো হবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভয়েস অব আমেরিকার সকাল সাড়ে ছ'টার আরবি আনুষ্ঠানে মানবাধিকার বিষয়ে ইরাককে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয়।

১৯মে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন উপসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপক আমেরিকান নৌ উপস্থিতির বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী ইসরায়েল ইরাক ও জর্ডানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলে যে, তারা উভয় মিলে বিমান বাহিনীর একটি সম্মিলিত স্কোয়াড্রন তৈরি করেছে। ইরাকি বাহিনী ইতিমধ্যেই জর্ডানে প্রবেশ করেছে আমরা ওদের এসব কার্যকলাপকে মোটেই সহ্য করব না।

২১শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকার ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট-এর পক্ষ থেকে মানবাধিকার সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। উক্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে ইরাক মারাত্মক বিরুপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী সাদ্দাম হোসেন আরব সহযোগিতা পরিষদের বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, আমেরিকা ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেন।

মার্চের শুরুতে আমেরিকা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সন্ধান পায় যে, জর্ডান সীমান্তে ছয়টি ফিগেড এস্কাড মিসাইল লাঞ্চার বসান হয়েছে। এখান থেকে খুব সহজেই ইসরায়েলের উপর এস্কাড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা সম্ভব।

৯ই মার্চ ইরাকি আদালত ইংল্যান্ডের অবজারভার পত্রিকার 'ফরজাদ বাজোফ'কে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়, ফরজাদ বাজোফকে ১৯৮৯ সালে গোয়েন্দাগিরি করার সময় ইরাকে গ্রেফতার করা হয়। ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে ইরাকের কাছে কয়েকবার বাজোফের প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া হয়। কিন্তু ইরাক প্রতিবার ইংল্যান্ডের প্রাণ ভিক্ষা আপীল প্রত্যাখ্যান করে। উল্লেখ্য ইংল্যান্ড এক ব্যাংক ডাকাতি কেসে ফরজাদবাজোফকে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এতদসত্ত্বেও ইংল্যান্ডের ধারণায় সে ছিল বেকসুর, তাকে বিনা কারণে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে, আরবদের জন্য এটা ছিল অবিশ্বাস্য যে, একজন দাগী অপরাধী কখনও সাংবাদিক হতে পারে না। ফরজাদ বাজোফ ছিল ইংল্যান্ডের অধিবাসী কিন্তু জন্মসূত্রে ছিল ইরানি। কয়েকবার সে ইরাকে প্রবেশ করেছে, তার কার্যকলাপ ছিল যথেষ্ট সন্দেহজনক।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ফরজাদ বাজোফের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ফলে অবজারভার পত্রিকা সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে রীতিমত বিষোদগার শুরু করে দেয়।

১৭ই মার্চ যেসকল উপসাগরীয় দেশ তেলের নির্ধারিত মূল্য ও পরিমাণের বিরুদ্ধাচারণ করেছে বলে সন্দেহ করা হয় তাদের বিরুদ্ধে সাদ্দাম হোসেন কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন।

২২শে মার্চ ডক্টর 'জিরাল্ডবিল' যিনি সুবৃহৎ ব্যাসের তোপ বানাতে ছিল পারদর্শী তাকে ব্রাসেলসে হত্য করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হাত ছিল সক্রিয়। ডক্টর জিরাল্ডবিল কৃত্রিম উপগ্রহকে রকেটের পরিবর্তে তোপের সাহায্যে মহাশূন্যে প্রেরণ করা যায় কিনা সে বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইরাকের জন্য একটি প্রোগ্রামকে সামনে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন, পশ্চিমাদের ধারণা সামরিক উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মি. জিরাল্ডবি ইরাকের জন্য কাজ করছিলেন।

২৮শে মার্চ বৃটিশ কর্মকর্তারা ইলেকট্রনিক খুচরা যন্ত্রাংশ ভর্তি একটি ইরাকি হাওয়াই জাহাজ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। এটি আমেরিকা ভায়া লন্ডন হয়ে বাগদাদ যাওয়ার কথা ছিল। বৃটিশ কর্মকর্তাদের বক্তব্য ছিল এগুলো এটম বোমের ট্রিইগার, কিন্তু বৃটেনের কর্মকর্তারা তাদের এই দাবি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন। অতঃপর সাদ্দাম হোসেন এ ধরনের কিছু যন্ত্রাংশ সঙ্গে নিয়ে ইরাকি টেলিভিশনে উপস্থিত হয়ে বলেন, এসব জিনিসের স্মাগলিংয়ের কোন

প্রয়োজন নেই। এসব যন্ত্রাংশ এটম বোমা তৈরিতে মোটেও ব্যবহার হয়না। এমন সময় ইরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামীর ইরাককে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, ইরাক যদি পরামাণবিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা করে তাহলে তার উপর আবার আক্রমণ করা হবে।

২৯শে মার্চ বৃটিশ প্রচার মাধ্যমগুলোতে ইরাকের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা চালানো হয়। ইত্যবসরে বৃটিশ সরকার তার দেশের একটি ফ্যাক্টরি থেকে কিছু টিউব নিজেদের আওতায় নিয়ে নেয়। এসব টিউব ইরাকের জন্য তৈরি করা হচ্ছিল বলে দাবি করা হয়। ইতালী এবং গ্রীসেও এসব টিউব প্রস্তুতে ব্যবহারযোগ্য কিছু মেশিনারি আটক করা হয়। লরীতে করে এসব টিউব ইরাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। বৃটিশ কর্মকর্তারা দাবি করেন যে, এসব টিউব ও অন্যান্য মেশিনারী ডক্টর জিরাল্ডবিলের ডিজাইন করা অস্বভাবিক ধরনের হ্যাভি তোপ প্রস্তুত করার জন্য ইরাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে ইরাকের বক্তব্য ছিল, এসব টিউব ও অন্যান্য মেশিনারি কেমিক্যাল পাইপলাইন প্রস্তুতের জন্য আমদানী করা হচ্ছিল। বৃটিশদের যুক্তি ছিল কোন গানকোয়ালিটি এখনও স্টীল অথবা অস্বভাবিক পাইপ লাইন দ্বারা প্রস্তুত করা হয় না। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর জাতিসংঘ পরিদর্শক দল ঐ সুপারগানটির পর্যবেক্ষণ করে, যার ব্যাপারে বলা হয়েছিল এর দ্বারা শত শত মাইল দূর পর্যন্ত গোলা নিক্ষেপ করা যায়। অধিকাংশ আরব বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কেবলমাত্র গোলা নিক্ষেপের জন্য এত বড় তোপ তৈরি করা ইরাকের প্রয়োজন ছিল না, যা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অপরদিকে সহজে ওটাকে বিমান আক্রমণ ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা সম্ভব। আসলে ইরাক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণের জন্য একটা সহজ ও সস্তা উপকরণ অবলম্বন করতে চেয়েছিল। তবে অনেকের বদ্ধমূল ধারণা যে, এই সুপারগানটি ছিল ইরাকের মহাশূন্য গবেষণা প্রোগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ।

২এপ্রিল ইরাক কর্তৃক ইসরায়েলি হুঁশিয়ারীর বিরুদ্ধে বিষোদগার ও পাল্টা জবাব প্রদানকে পশ্চিমারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হুমকি হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং এর ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বলা হয়, সাদ্দাম রাসয়নিক অস্ত্র দ্বারা অর্ধেক ইসরায়েল ধ্বংসের হুমকি দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো সাদ্দাম বলেছিলেন, ইরাকের উপর ইসরায়েল যদি কোন প্রকার হামলা চালায় তাহলে তাকে শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, ইসরায়েল আমাদের পারমাণবিক হামলার হুমকি দিচ্ছে, যদি সে এমন কিছু করে বসে তাহলে খোদার

কসম! আমরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আমাদের যা কিছু আছে সব কিছু ব্যবহার করব। ইসরায়েল যদি আমাদের উপর হামলার ধৃষ্টতা দেখায় তাহলে অর্ধেক ইসরায়েল ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। সাদ্দাম হোসেন তার ঐ ভাষণে আরও বলেন, আমাদের কাছে এটম বোম নেই। আমরা তার প্রয়োজনও অনুভব করি না। ভবিষ্যতেও পারমাণবিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজন নেই আমাদের। হোয়াইট হাউস সাদ্দামের ভাষণকে দুঃখজনক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন আখ্যায়িত করে।

৩ই এপ্রিল ইসরায়েল সামরিক উদ্দেশে তার কৃত্রিম উপগ্রহ 'উফক' মহাশূন্যে প্রেরণ করে। ৫ই এপ্রিল আমেরিকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বন্দর ইরাকের মুসেল শহরে সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বে সাদ্দাম হোসেন সৌদি বাদশাহ ফাহাদকে ভোরে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন, তিনি যেন তার কাছে এমন কাউকে পাঠান যিনি তার বক্তব্যকে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারের কাছে তুলে ধরতে পারেন। সাদ্দাম প্রিন্স বন্দরকে জানান যে, তিনি ইসরায়েলের উপর হামলার কোন ইচ্ছা রাখেন না। তবে তিনি পশ্চিমাদের কাছ থেকে আশ্বাস চান যে, ইসরায়েলও ইরাকের উপর হামলা করবে না। প্রিন্স বন্দর সাদ্দাম হোসেনের বক্তব্য প্রেসিডেন্ট বুশ ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারের কাছে তুলে ধরেন। তার উভয় সাদ্দামের বক্তব্যের কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিয়ে বরং গম্ভীরভাবমূর্তি ধারণ করেন। ওদিকে সাদ্দামের উক্ত বক্তব্য ইসরায়েলের কাছে হোসনী মুবারক পৌঁছে দেন বলেন, আপনাদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ বলতে পারেন, ইসরায়েলি হুমকির পাল্টা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনটাই বা কি ছিল? আমার ধারণায় এর প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, পশ্চিমাদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আরদের মানসিক নিরাপত্তা অবশ্যক।

সিনেটর ডোল সাদ্দামকে আশ্বস্ত করে বলেন, এসব অপপ্রচারের পিছনে আমেরিকার হাত সক্রিয় নয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৮১ সালে ইসরায়েল যখন ইরাকের পামাণবিক চুল্লীর উপর হামলা করেছিল তখন আমেরিকা তার বিরোধিতা করেছিল। সাদ্দাম এ বক্তব্যের উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, আমি জারি....। কিন্তু একথাও সত্য যে, আপনারা এ সম্পর্কে সব কিছুই অবগত ছিলেন। আপনাদের না জানিয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের দুঃসাহস অন্ততঃ ইসরায়েল রাখে না। ইরাকি নেতার কথা শুনে সিনেটর ডোল বলেন, আমি দুঃখিত। মিঃ প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস করুন! আমরা এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম বলেন, আমেরিকাকে না জানিয়ে ইসরায়েল যদি ইরাকের পারমাণবিক চুল্লীর উপর হামলা চালিয়ে থাকে তাহলে আপনারা নির্দোষ। বলতে হয়, ইসরায়েল চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে। আর যদি আপনাদেরকে জানিয়ে সে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এটা সুখবর নয়? তবে আপনাদের ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, পৃথিবীতে কোথায় কি হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনারা সব কিছুই খবর রাখেন অতএব সর্বাস্থায় এটা একটা দুঃসংবাদ।

ইসরায়েল প্রসঙ্গে সাদ্দাম বলেন, সে যদি আমাদের উপর পারমাণবিক হামলা চালায় তাহলে আমরা যদি এর উত্তর রাসয়নিক গ্যাস দ্বারা দেই তাহলে এটা কি ইনসাফ বহির্ভূত কাজ হবে? সাদ্দাম বলেন, আমি আমার সামরিক বাহিনীর কমান্ডারদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, ইসরায়েল যদি ইরাকের উপর পারমাণবিক হামলা চালায় তাহলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করতে তারা যেন মোটেই সংকোচবোধ না করেন। সাদ্দাম আরও বলেন, আমরা জেনেভা কনভেনশন সম্পর্কে জানি। রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার না করার ব্যাপারে আমরা জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছি, কিন্তু প্রশ্ন হলো রাসায়নিক অস্ত্র কি পারমাণবিক অস্ত্রের তুলনায় বেশী ভয়াবহ? সমালোচনা মুখর পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো আরবদের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে কেন নেমেছে? ওদের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রতিদিন আরবদেরকে অপমানিত করা হচ্ছে। ইহুদিলবী ও ইহুদিদের আপনাদের উপর কর্তৃত্ব গ্রহণের সুযোগ কেন দিলেন? আমরা অবশ্যই শান্তি চাই, কিন্তু অস্ত্র সমর্পণ করে নয়। আমরা কারো সামনে নতশির হতে পারি না। এমন একটা দেশ যে আট বছর পর্যন্ত তার মর্যাদা ও অঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করতে পারে আগামীতেও সে যুদ্ধের খাতিরে যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছে। সাদ্দাম হোসেন ইরাকের ক্ষেপণাস্ত্র প্রোগ্রাম সম্পর্কে কিছুই গোপন করেননি। এ ব্যাপারে আমেরিকার দু'মুখো নীতির সমালোচনা করে বলেন, ইসরায়েল বা ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র প্রোগ্রাম সম্পর্কে সে নিশ্চুপ কেন?

ইরাকি নেতা সফররত আমেরিকান সিনেটরদের জন্য একটি হেলিকপ্টারের অফার জানান এবং বলেন, আপনারা এই হেলিকপ্টারে করে ইরাকের যে স্থানে যেতে চান যেতে পারেন। আপনারা কুর্দী অঞ্চলে গিয়ে সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে আসুন সাদ্দাম তার দেশের কুর্দী জনগণকে হত্যা করছে কিনা। ইচ্ছা করলে আপনারা ইরাকি প্লান্টগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন। রার্ট ডোল সাদ্দামের এই

অফারকে মহানুভবতা বলে আখ্যায়িত করে বলেন এ বিষয় আমি আমার সফর সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরে আপনাকে জানাবো।

ভয়েস অব আমেরিকার আরবি অনুষ্ঠানে ইরাকের মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট সম্প্রচার করা হয়। ঐ রিপোর্টে ইরাকের ক্ষমতাসীন সরকারের কঠোর সমালোচনা করা হয়। প্রচারিত এ রিপোর্ট সম্পর্কে সাদ্দাম যখন সফররত সিনেটরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন তাঁকে জানান হয়, যারা এ রিপোর্ট প্রচার করেছ তাদেরকে চাকুরী হতে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। ইরাকে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদুত "এপ্রিলগ্লাসপী" বলে, সম্মানিত রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস করুন। এ ধরনের রিপোর্ট প্রচার আমাদের সরকারের নীতিবিরুদ্ধ। আপনাদের ব্যাপারে আমাদের সরকারিনীতি রুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। মার্কিন-রাষ্ট্রদূতের উপরোক্ত বক্তব্য ছিল অর্ধেক সত্য, অর্ধেক মিথ্যা।

আলাপচারিতার সময় মিঃ ডোল বলেন, একটি টিভি সংবাদে প্রকাশ যে, বাগদাদের দক্ষিণে একটি বিশেষ স্থানে ইরাক এমন ভয়াবহ রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করেছে যা শহরের পর শহর ধ্বংস করে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে। উত্তরে সাদ্দাম বলেন, আমরা এ ব্যাপারে কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছি মাত্র। তারপর সাদ্দাম হোসেন প্রশ্ন করে বসেন যে, এ ধরনের অস্ত্র যদি আমেরিকা তৈরি করে তাহলে? উত্তরে জনৈক সিনেটর বলেন, আমরাও কেবল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি। এখনও পর্যন্ত আমরাও কোন কিছু তৈরি করিনি। সাদ্দাম পুনরায় প্রশ্ন করেন, তাহলে ইরাকের জন্য পরক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে কোন বাধা আছে?

সিনেটর ডোল আলোচনার সময় সাদ্দাম হোসেনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে চান যে, ইরাক আগামীতে পারমাণবিক, রাসয়নিক ও আণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বন্ধ করে দেবে। উত্তরে ইরাকি পররাষ্ট্র মন্ত্রী তারেক আজিজ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, যদি এ কাজের জন্য ইসরায়েল সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে আমরাও প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি আছি।

লন্ডনের কর্মকর্তারা ইরাকের জন্য প্রেরিত যেসব যন্ত্রায়ংশ আটক করে তার উদৃতি দিয়ে ইরাকি নেতা বলেন, এটা ছিল একটা ষড়যন্ত্র মাত্র, যা করেছিল সিআইএ। যেসব যন্ত্রাংশ আটক করা হয় তা ইরাকের জন্য মোটেও পাঠানো হচ্ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ ও যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উক্ত ষড়যন্ত্রটি তৈরি করা হয়।

ইরাকি নেতার মাথায় তখন পশ্চিমা প্রচারমাধ্যম থেকে প্রচারিত এ ধরনের আরও কিছু অপপ্রচারের অকাট্য দলীল-প্রমাণ ছিল। পশ্চিমাদের দু'মুখো নীতির আরও কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত সাদ্দামের জানা ছিল, কিন্তু সেসব সম্পর্কে এ বৈঠকে তিনি কিছুই আলোচনা করেননি। ইরাকি নেতা খুব ভাল করে জানতেন আমেরিকা, ইংল্যান্ড ইসরায়েল তিনশক্তি মিলে ইরাকের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

আমেরিকান সিনেটরদের দলটি মধ্যপ্রাচ্যে থাকাকালীন সময় মার্কিন সিনেটে ইসরায়েলের পক্ষে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়। ঐ প্রস্তাবে স্বীকার করা হয়, জেরুজালেম ইসরায়েলের ঐতিহাসিক রাজধানী। এই প্রস্তাবে আরববিশ্ব ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আরবদের খুশী করার জন্য তখন রবার্ট উক্ত মার্কিন প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেন।

১৮ই এপ্রিল সাদ্দাম হোসেন আরব লেবার ইউনিয়নের মিটিংয়ে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, ইসরায়েল যদি ইরাকি প্লান্টগুলোর উপর হামলা চালায় তাহলে এটা হবে এমন এক যুদ্ধের সূচনা যা অধিকৃত আরব এলাকা পুনর্দখল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

২১শে এপ্রিল আমেরিকার আওয়াক্স বিমান ইরাকের আকাশসীমা লংঘন করে। ইরাক সরকার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানায়। উল্লেখ্য, এই প্রতিবাদের তিন সপ্তাহ পূর্বে আওয়াক্স বিমান ইরাকের আকাশসীমা লংঘন করেছিল। ইরাকের যদি সত্যিই প্রতিবাদ করার ইচ্ছা থাকত তাহলে এ ঘটনাটি যখন ঘটেছে তখনই এর প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, কিন্তু এতো দেরিতে প্রতিবাদ করার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ নিহিত ছিল। এই ঘটনার কয়েকদিন পর ইরাক ঘোষণা দেয় যে, সে তার ক্ষেপণাস্ত্র প্রোগ্রামের জন্য সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করছে। এ ঘোষণা প্রমাণ করে যে, ইরাক আমেরিকা-ইসরায়েলকে তার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিল। যাতে ভুল করেও তারা যেন ইরাকের উপর আক্রমণের চিন্তা না করে।

৩রা মে ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়, তাতে বলা হয় তেলের মূল্য পরিস্থিতি দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। কুয়েতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোটা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তেল উত্তোলন তেলের মূল্য কম রাখার একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, এ সময় থেকে কুয়েতও এই নাটকে অন্তর্ভুক্ত হয়।

আরব রাষ্ট্রপ্রধানগণ অনৈক্যের শিকার ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের মতে তেলের মূল্য ১৯৭২-এর তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনঃগঠনের জন্য তেলের ইনকাম ছাড়া কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। ইরাকি নেতা বারবার কুয়েতকে দোষারোপ করছিলেন যে, তেলের মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে সে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। নির্ধারিত কোটার তোয়াক্কা না করে অধিক পরিমাণে তেল উত্তোলন করে কুয়েত তেলের মূল্য বৃদ্ধি হতে দিচ্ছে না।

মে মাসের শেষের দিকে আরেকটি ঘটনা ঘটে যায়, যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট বিরোধ আরও চরম আকার ধারণ করে। ৩ শে মে ১৮ জন ফিলিস্তিনী গেরিলা সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ইসরায়েলের উপর ব্যর্থ হামলা করে বসে। ফিলিস্তিনী গেরিলারা ইসরায়েলিদের পাল্টা হামলায় শাহাদত বরণ করে। ফিলিস্তিনী লিবারেশন ফ্রন্টের নেতা এই হামলার দায় স্বীকার করেন। ইসরায়েল অভিযোগ করে যে, গেরিলাদের ছোট ছোট বোটগুলি যে জাহাজ থেকে নামান হয় সেটা ছিল লিবিয়ার মালিকানাধীন এবং লিবিয়া থেকেই সেটা এখানে আনা হয়। এ অভিযোগের পর লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী তড়িঘড়ি কায়রো পৌঁছে মিসরীয় নেতা হোসনী মুবারকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, আপনি এ প্রসঙ্গে ইসরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুয়াম্মার গাদ্দাফী বলেন, ফিলিস্তিন লিবারেশন ফ্রন্টের হেড অফিস লিবিয়ায় নয় বরং ইরাকের বাগদাদ শহরে। এ হামলার কারণে পিএলও আমেরিকার মাঝে আলাপ আলোচনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকার দাবি ছিল পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত এই ঘটনার নিন্দা করুক এবং লিবারেশন ফ্রন্টকে পিএলও জোট থেকে বহিস্কার করা হোক, কিন্তু ইয়াসির আরাফাত এতে সম্মত হননি। আমেরিকার সঙ্গে ফিলিস্তিনীদের আলাপ আলোচনা বন্ধ হওয়ার ফলে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি কারণ ফিলিস্তিনীদের ধারণায় এই আলোচনা দ্বারা সময় নষ্ট ছাড়া আর কোন উপকার হচ্ছে না। এটা সত্য যে, ১৯৯০-এর শুরুর মাসগুলিতে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি ভয়াল আকুতি ধারণ করে। তবে কেউ কখনও ধারণা করেনি ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটবে। সবার ধারণা ছিল উদ্ভূত পরিস্থিতি ইরাক-ইসরায়েল যুদ্ধের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করছে, কিন্তু বাস্তবে এমনটি হয়নি। ইরাক শেষ পর্যন্ত কুয়েতের উপর আক্রমণ করে বসে। প্রশ্ন দাঁড়ায়, শেষ পর্যন্ত ইরাক কুয়েতের উপর কেন হামলা করে বসল? আসল ব্যাপার হলো, সবাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিগত এক বছর ধরে উপেক্ষা করে

চলছিল। একবছর পূর্বে সৌদি বাদশাহ শাহ ফাহাদ যখন ইরাক সফর করেন তখন তার সাননে একটি নন বিলিগারেন্সী একর্ড (যুদ্ধ না করার চুক্তি)-এর একটি পান্ডুলিপি পেশ করা হয়। কোন পূর্ব আলোচনা ছাড়া এ ধরনের একটি পান্ডুলিপি দেখে শাহ ফাহাদ বিস্ময়ে হতবাক হন। শাহ ফাহাদের ধারণায় দু'টি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মাঝে এমন ধরনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তার সঙ্গে পূর্বে আলোচনা ছাড়া এমন একটি চুক্তিপত্র উপস্থাপন তিনি সুনজরে দেখেননি। হঠাৎ করে এ ধরনের একটি চুক্তিপত্র তার সামনে রাখার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ইরাকি নেতা বলেন, আমার মনে হয় এ ধরনের চুক্তির এটাই উত্তম সময়। কারণ, আমরা একটি সূত্রে জেনেছি, সৌদি আরব ইরাকের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ ধরনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে উক্ত ষড়ডন্ত্রের ব্যাপারে যারা রসাত্মক আলোচনায় লিপ্ত আশা করি চিরতরে তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। মোটকথা ইতস্ততঃ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত শাহ ফাহাদ সাদ্দামের অনুরোধে ঐ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরিত এ চুক্তিটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ কেউ এই চুক্তিকে আমল দেয়নি। ইরাকের আসল লক্ষ্যবস্তু কী? এ সম্পর্কে কারো কোন ধারণা ছিল না। প্রশ্ন দাঁড়ায় ইরাকি নেতার পক্ষ থেকে সৌদি আরবকে যুদ্ধ না করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য যেমন চাপ দেওয়া হয় তেমনটি কুয়েতকে করা হয়নি কেন?

কুয়েতের উপর আক্রমণের পূর্বে সাদ্দাম হোসেন সৌদি আরব সফর করেন। এই সফরে শাহ ফাহাদকে তিনি আবারও স্মরণ করিয়ে দিন যে, আমেরিকা তার দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শাহ ফাহাদ উত্তরে বলেন, তার ধারণা ভুল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমার মনে হয় না তিনি ইরাকের বিরুদ্ধে ষড়যন্তে লিপ্ত হতে পারেন। শাহ ফাহাদের ধারণায় কম্যুনিজিমের বিরুদ্ধে নিরংকুশ বিজয়ের পর আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের কোন ব্যাপারে নাক না গলিয়ে বরং সে চায় পূর্বে ইউরোপের পরিবর্তিত পরিস্থিতির দিকে গোটা পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকুক।

অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় কুয়েতের উপর হামলার জন্য ইরাক রাজনৈতিকভাবে পথ পরিস্কার করছিল। শুরুতে ইরাক কুয়েতের কাছ থেকে সহজ উপায় সুবিধা লাভ করতে চেয়েছিল। তারপরও প্রয়োজনে বল প্রয়োগের বিষয়টি সর্বধা সে স্মরণ রেখেছে। সৌদি আরবের সঙ্গে যুদ্ধ না করার চুক্তি স্বাক্ষরিত করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল সৌদি আরবকে আশ্বস্ত করা যে, আসল যুদ্ধ

ইরাক ও কুয়েতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে। এজন্য কুয়েতকে কখনও এ ধরনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়নি।

মে মাসের শেষ দিকে এবং জুনের শুরুতে কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাক প্রকাশ্য বিষোদগার শুরু করে, কিন্তু পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো তখন ইরাকের বিষোদগারকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক যখন চরম অবনতির শিকার এবং যুদ্ধ যখন অনেকটা অবশ্যম্ভবী তখনও পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলি ইরাকের কুয়েত বিরোধী বিবৃতির প্রতি কোনই আমল দেয়নি। আমেরিকা তখনও ইরাকের সঙ্গে সম্পর্ক স্বভাবিককরণের বিষয়টি দ্বিতয়ি পর্যায়ভুক্ত রেখেছে। যুদ্ধ শেষে ওয়াশিংটন পোষ্ট জানিয়েছে, অক্টোবর ১৯৮৯ সালে প্রেসিডেন্ট বুশ যখন মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে আমেরিকার নীতি নির্ধারণ করেন তখন থেকে নিয়ে ২রা আগষ্ট ১৯৯০ পর্যন্ত ইরাক যখন কুয়েতের উপর আক্রমণ চালায় এই দীর্ঘ সময়ে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকের বিষয়টি একবারও ভেবে দেখেনি। আমেরিকান ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট এর কর্মকর্তারা কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার পর খুবই হতভম্ব ছিলেন। তারা ভেবেই পাচ্ছিলেন না ইরাক ইসরায়েলকে ভুলে গিয়ে হঠাৎ করে কুয়েতের উপর কেন তেড়ে বসল? আসলে এ ধরনের কল্পনা অনেকটা বাতুলতার নামান্তর।

আগষ্ট ১৯৮৮ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ পর্যন্ত এই ১৮ মাস ধরে ইরাক যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে আসছিল তা হচ্ছে যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইরাকের অর্থনীতিকে কীভাবে পুনগর্ঠিত করা যায়। কে না জানে এটা কোন সহজ কাজ নয়। ইরাকের ঘাড়ে অনারব দেশগুলির ঋণের বোঝায় পরিমাণ ছিল তখন ৩৫শ' কোটি ডলার। ইরাকের জন্য ঋণের বোঝা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ছিল তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা কিন্তু দুটি আরবদেশ এপথে বাধার সৃষ্টি করে চলেছিল। তার একটি হলো কুয়েত অপরটি সংযুক্ত আরব আমিরাত। নির্ধারিত কোটা থেকে অধিক পরিমাণে তেল উত্তোলন করতে এ দুটি দেশ খুবই পারদশী ফলে, ইরাক কর্তৃক তেলের মূল্য বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। ফলে ইরাকি ভর্তুকীর পরিমাণ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মজার ব্যাপার হলো, তেলসমৃদ্ধ দেশগুলির সংগঠন ওপেকও এ সংকট নিরসনে দারুণ ব্যর্তাতার পরিচয় দেয়। নির্ধারিত কোটা থেকে অধিক পরিমাণে কেউ তেল উত্তোলন করছে কিনা এ বিষয় তদারকী করার দায়িত্ব ছিল ওপেকের উপর। তেলের ব্যাপারে কোটা নির্ধারিণ

করা যেমন ওপেকের দায়িত্ব তেমনি সেই কোটা কার্যকর করা হচ্ছে কিনা সে বিষয় দেখাশুনার দায়িত্ব তার। আসল কথা হলো প্রত্যেক দেশের রয়েছে নিজস্ব স্বার্থ, পলিসি ও প্রয়োজন।

প্রতিদিন কুয়েতের জন্য নির্ধারিত কোটা ছিল ১০ লাখ ৩৭ হাজার ব্যারেল, কিন্তু প্রতিদিন সে ১৭ লক্ষ ব্যারেল তেল উত্তোলন করতে থাকে। পরে কুয়েতের জন্য ওপেকের পক্ষ থেকে ১৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ব্যারেল নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, কিন্তু কুয়েত এতে সন্তুষ্ট ছিল না। কুয়েতের তেলমন্ত্রী পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা দেন যে, নির্ধারিত কোটা কুয়েতের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। অতএব কুয়েতকে প্রতিদিন সাড়ে ১৩ লক্ষ ব্যারেল তেল উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া হোক। কুয়েতের এই ব্যবহারে ইরাক মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। নভেম্বর ১৯৮৯ সালে তেলমন্ত্রীদের এক বৈঠকে ইরাক ওপেকের কাছে দাবী জানিয়ে বলে, নির্ধারিত কোটা কার্যকর করার ব্যাপারে কুয়েতকে কঠোর ভাষায় নির্দেশ জারী করা হোক। অপরদিকে অতিরিক্ত তেল উত্তোলনের ফলে ১৯৯০ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত তেলের মূল্য হ্রাস পেয়ে প্রতি ব্যারেলের মূল্য দাঁড়ায় মাত্র ১৮ ডলার। এসময় সাদ্দামা হোসেন সৌদি আরব ও কুয়েতের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে তেলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য চিঠি লেখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তার উদ্দেশ্য মোটেও সফল হতে পারেননি। কুয়েত ইচ্ছা করলে অবশ্যই ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু সে তা করেনি, বরং কুয়েতী তেলমন্ত্রী ইরাকের সমালোচনা করে বলেন, অনতিবিলম্বে তেলের কোটা সিষ্টেম খতম হওয়া প্রয়োজন। কুয়েতের এরূপ বক্তব্য ইরাকের জন্য ছিল অসহনীয়। সাদ্দাম হোসেন মনে করেন ইরানের ইসলামি বিপ্লব ঠেকিয়ে তিনি আরবদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন কুয়েতিদের এ ব্যবহার ছিল ঐ অনুগ্রহের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। ইরান-ইরাক যুদ্ধের শুরুতে কুয়েত যুদ্ধের মাসুলস্বরুপ ইরাককে পাঁচশ' কোটি ডলার আদায় করে। এই অংকের কিছু টাকা ঋণ আর কিছু টাকা সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়। ইরাকের দাবি ছিল পুরো টাকাটাই সাহায্য হিসাবে ধরা হোক। এই ঝগড়ার মীমাংসা আজও হয়নি। ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় আরব দেশগুলি ইরাককে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার কোটি ডলার সাহায্য অথবা ঋণ হিসাবে প্রদান করেছে।

কুয়েতের প্রতি ইরাকি বিযোদগারের আরেকটি কারণ হলো কুয়েত তার দু'টি দ্বীপ 'আরব' এবং 'বুবিয়ান' সামরিক উদ্দেশ্যে ইরাককে ব্যবহার করতে দেওয়ার

ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করে। কুয়েত যদি এই দু'টি দ্বীপ ইরাককে ব্যবহার করার অনুমতি দিত তাহলে ইরাক তার 'ফা' অঞ্চল অনেক পূর্বেই ইরানের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করতে পারত। কুয়েতের ধারণায় ইরাককে যদি ঐ দু'টি দ্বীপ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে যুদ্ধের লেলিহান শিখা কুয়েত পর্যন্ত ধেয়ে আসবে। অপরদিকে একবার যদি এ দ্বীপ দু'টি ইরাকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তাহলে তার কাছ থেকে দ্বীপ দু'টি পুনরায় ফেরত নেওয়া কুয়েতের জন্য মুশকিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

তেলের কোটা, মূল্যনির্ধারণ, ঋণের বোঝা, দ্বীপ সমস্যা ইত্যাদি ছিল যদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের মুল কারণ ছিল কুয়েতকে ইরাক সর্বদা নিজ ভূখণ্ডের অংশ মনে করেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কুয়েত যে ইরাকেরই অংশ এটা ইরাকের অনেক পুরাতন দাবি। ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই ইরাক কুয়েতকে নিজের অংশ বলে দাবি করে আসছে।

১৯৬১ সালে কুয়েত যখন বৃটেনের কাছ থেকে পূর্ণ স্বধীনতা লাভ করে তখন কুয়েতকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকার করে নিতে ইরাক অস্বকৃতি জানায়। শুধু তাই নয়, কুয়েতের উপর আক্রমণ চালানোর জন্যও সে পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু অন্যান্য আরব দেশগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রচষ্টার ফলে ইরাক তার উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। দুই বছর পর্যন্ত ইরাক কুয়েতকে জাতিসংঘের সদস্য হতে দেয়নি। পরে আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশের চাপের মুখে সে কুয়েতের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন চাপের মুখে ইরাক কুয়েতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেও উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণ কখনও সম্ভব হয়নি। বাদশাহ, রাষ্ট্রপতি ও শায়েখদের দ্বারা পরিচালিত এমন একটি সংগঠন কখনও এ ধরনের একটি সমস্যার সমাধান করতে পারে না। তবে হ্যাঁ এমন একটি সংগঠন পারস্পরিক তিক্ততাকে অবশ্যই আরও তিক্ততর করতে পারে। আরব রাষ্ট্রপ্রধানগণ তখন প্রত্যেকেই পরিস্থিতিকে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করছিলেন। আরব জনগণের সার্বিক কল্যাণের প্রতি কারো কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র লাভেদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। আরব ঐক্য ও আরব স্বার্থের প্রতি কারো কোন মাথা ব্যথা ছিল না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বহীনতা আরবদের জন্য ছিল একটি বড় সমস্যা। কোন নেতাই তখন

গোটা আরব জাতির নেতৃত্তদানের যোগ্যতা রাখতেন না। ক্যাম্পডেভিড চুক্তির কারণে মিসরকে আরববিশ্ব থেকে বহিস্কার করে দেওয়া হয়। যদিও তাকে পরে আরব ভূবনে ফিরিয়ে আনা হয়, কিন্তু এই মুহূর্তে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করা তার জন্য ছিল অসম্ভব। অন্যান্য আরব দেশগুলো নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ছিল ব্যাকুল। কোন বড় ধরনের ঐকমত প্রতিষ্ঠার জন্য আকর্ষণীয় মতবাদ ও জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন প্রয়োজন, কিন্তু আরববিশ্বে প্রগতিবাদ বিরোধী রাষ্ট্রনায়কগণের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা সেকেলে ও অগ্রণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করতে থাকেন। এসব রাষ্ট্রনায়কের উন্নয়নশীল চিন্তা-চেতনার প্রভাব-প্রতিপত্তি আরব ঐক্যের পথে ছিল আর একটি প্রধান অন্তরায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবলুপ্তির ফলে কেল্লাফতে করার জন্য আমেরিকার রাস্তা পরিস্কার হয়ে যায়। উত্তর আফ্রিকার মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রাক্তন প্রভাব পতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড তখন জোর প্রচেষ্টা চালায়।

পরিস্থিতিকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসার পিছনে আরব মিডিয়াও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আরব সংবাদমাধ্যমগুলো আরব জাতীয়তাবাদের প্রচারক হিসাবে কাজ করেছে। অতঃপর আরবদের স্বাতন্ত্রবোধ পরিস্কার হয়ে ওঠে। আশির দশকে প্রতিটি আরবদেশের সংবাদমাধ্যম নিজ নিজ চিন্তাধারা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় প্রচার করতে থাকে। এসময় পশ্চিমা প্রচারমাধ্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে থাকে। আরব শ্রোতারা নিজ নিজ সংবাদ মাধ্যমগুলির প্রতি ছিল বীতশ্রদ্ধা। তারা পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমা প্রচারমাধ্যম দৈনন্দিন আরবি অনুষ্ঠান প্রচারের সময় দাঁড়ায় তখন গড়ে ৪১২ ঘণ্টা।

আরবি শীর্ষ বৈঠক সর্বধা একটি বড় সমস্যা জর্জরিত। কিছু কিছু আরবদেশ এই বৈঠকে অনেক কিছু বলতে চায়। আর কোন কোন দেশ তেমন কিছুই বলতে চায় না। আরবশীর্ষ বৈঠক সর্বদা পরস্পরবিরোধী নীতি অবলম্বন করেই সামনে অগ্রসর হয়েছে। সৌদি আরব কখনও কোন দৃঢ়নীতি অবলম্বন করেনি। সে সব সময় হ্যাঁ বা না এর পরিবর্তে "ইনশাআল্লাহ" (যদি আল্লাহ চায়) অথবা "আচ্ছা দেখা যাবে", এ ধরনের দায়সারা গোছের নীতি অবলম্বন করে চলেছে। অপরদিকে মিসর, ইরাক ও সিরিয়া বীরত্বপূর্ণ ভাবমূর্তি গ্রহণের পক্ষপাতী, কিন্তু সমস্যা হলো, তারা কোন বাস্তব উদ্যোগ রাখে না। যদিও সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন মাত্র কয়েক বছর আগে। এরপরও যুদ্ধের কারণে তার আটটি বছর নষ্ট হয়েছে।

আট বছরের সামরিক অভিজ্ঞতার আলোকে সাদ্দাম নিজেকে আরব জাতির হিরো জ্ঞান করেন। তিনি নিজেকে আরব জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার মত একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি মনে করেন।

১৯৮৯ সালে মরক্কোর শহর কাসাবলাংকায় অনুষ্ঠিত আরব লীগের শীর্ষ বৈঠকটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ১০ বছর পর মিসর এই সর্বপ্রথম এ জাতীয় কোন বৈঠকে অংশগ্রহণ করল। সাদ্দাম হোসেনের কারণে মিসর কাসাবলাংখা শীর্ষ বৈঠকে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। এ শীর্ষ বৈঠকটি শুরু থেকেই ছিল বিরোধ ও উত্তেজনাপূর্ণ। শাহ হোসাইন নিজেই প্রত্যেকটি রাষ্ট্রপ্রধানকে স্বাগত জানাতে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকেন। এ কারণে প্রতিটি সেশনে অন্ততঃ দু'ঘণ্টা করে সময় নষ্ট হয়। পর্যবেক্ষকদের মতে গৃহীত এ প্রক্রিয়ায় আরব নেতারা আলাপ আলোচনার সময় হ্রাস করতে চেয়েছিলেন। এ থেকেই আরব নেতাদের পারস্পরিক মতানৈক্যে পরিস্কার হয়ে ওঠে।

আরব লীগের শীর্ষ বৈঠকে ইরাক-সিরিয়া মতানৈক্য চরম আকার ধারণ করে। ফলে, মারাত্মক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সাদ্দাম হোসেন ও হাফেজ আল আসাদ উভয় এক অপরের উপর মারাত্মক ধরনের অপবাদ দেওয়া শুরু করেন। ইরাক সেসময় লোবাননে সিরীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত খৃষ্টান জেনারেল মাইকেল 'আওন'কে সাহায্য করছিল। মাইকেল আওন তখন লেবাননে একটি মিলিশিয়া বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। শুরুতে পরোক্ষভাবে একে অপরকে অপবাদ দিতে থাকেন। তারপর শুরু হয় ডাইরেক্ট আক্রমণ। হাফেজ আল আসাদ সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে বলেন কুর্দী বিদ্রোহ দমন করতে তিনি রাসয়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। উত্তরে সাদ্দাম হোসেন পাল্টা অপবাদ দিয়ে বলেন, দামেস্কের উত্তরে অবস্থিত 'হুম' শহরে ২০ হাজর মুসলিম হত্যার নায়ক হলেন হাফেজ আল আসাদ। মোট কথা উভয় নেতা একে অপরের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। ফলে, উক্ত কনফারেন্সের পরিবেশ মারাত্মক তিক্ততার শিকার হয়। এক পর্যায়ে সাদ্দাম হোসেন রাগান্বিত অবস্থায় হল ছেড়ে চলে যান।

আরব রাষ্ট্রধানদের কাসাবলাংকা কনফারেন্স শুরু হওয়ার দুইদিন আগে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে চেষ্টা করেছিল যে সকল দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি সংকটে লিপ্ত এবং যে সকল দেশ ইসরায়েলকে সাহায্য করছে তাদের বিষয়টিও এজেন্ডায়

অন্তর্ভুক্ত করা হোক, কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তেল সমৃদ্ধ ধনী আরব দেশগুলি এই প্রস্তাবের কঠোর বিরোধিতা করে।

১৯৬৭ সালে খর্তুমে অনুষ্ঠিত আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ বৈঠকের পর আরব দেশগুলি দু'টি পৃথক ব্লকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ব্লকে আছে ঐ সকল দেশ যারা সরাসরি ইসরায়েলের সঙ্গে সংকটে জড়িত। আর দ্বিতীয় ব্লকে আছে ঐ সকল দেশ যারা ইসরায়েলকে মদদ যুগিয়ে চলেছে। শাহ হোসাইনের অভিপ্রায় ছিল জর্ডান, পিএলও, সিরিয়া ও মিশরের সাহায্যের ব্যাপারটি আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করা হোক, কিন্তু সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত ও অন্যান্য দেশ যারা ইসরায়েলকে সাহায্য করে চলেছে তারা কঠোরভাবে ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ফলে, শাহ হোসাইন অভিপ্রায় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। সুতরাং কাসাবলাংখা কনফারেন্সের সুবাদে ধনী ও গরীব আরব দেশগুলির মাঝে ব্যবধান এবং পারস্পরিক মতানৈক্য পৃথিবীর সামনে আরও পরিস্কার হয়ে ওঠে।

আরবদের পারস্পরিক মতানৈক্য সত্ত্বেও কাসাবলংখা কনফারেন্সের একটি প্রশংসিত দিক ছিল এই যে, দীর্ঘদিন পর আরববিশ্বে মিসর আবার ফিরে আসার সুযোগ পায়। ফলে, মিসর আরব দেশগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৮৯ সালে সর্বপ্রথম বাগদাদ আরব বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। ইতিপূর্বে ইরানের বিরুদ্ধে বিজয়ে আরব রাষ্ট্রনায়কগণ সাদ্দাম হোসেনকে অভিনন্দন জানাবার জন্য বাগদাদ যাত্রা অব্যহত রাখেন। তবে একটি দেশ এমন ছিল যে সাদ্দাম হোসেনকে তখনও পর্যন্ত অভিনন্দন জানায়নি। সে দেশটির নাম কুয়েত। শায়েখ জাবের বাগদাদ যাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তার বাগদাদ যাত্রার উদ্দেশ্য সাদ্দামকে অভিনন্দন জানানোর জন্য নয়, বরং সাদ্দাম কর্তৃক পুরস্কার লাভে ধন্য হওয়ার জন্যই তিনি বাগদাদ যেতে চেয়েছিলেন। কুয়েতের ধারণা ইরাক বিজয়ের পিছনে তার অবদান কোন অংশে কম নয়, ইরাক তার কাছে নৈতিক ও আর্থিকভাবে ঋণী।

ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় কুয়েত ইরাককে ১৪শ' কোটি ডলার দিয়ে সাহায্য করেছে। নিঃসন্দেহে এটা একটা বড় অংশ। মজার কথা হলো, কুয়েত সরকার এই অর্থকে সর্বদা ঋণ হিসাবে গণ্য করেছে আর ইরাক এটাকে সাহায্য হিসাবে ধরে নিয়েছে। কুয়েত ভাল করে জানত ইরাকের কাছ থেকে এই অর্থ আর কখনও ফেরত পাওয়া যাবে না। অগষ্ট ১৯৮৮ ইরান-ইরাক যুদ্ধ বন্ধের অব্যবহিত পর

ইরাকি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ একটি গোপন টেলিগ্রামের সন্ধান পায়। এ টেলিগ্রামটি কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তেহরানে অবস্থিত তার রাষ্ট্রদুতকে প্রেরণ করেন। ঐ টেলিগ্রামে কুয়েতি মন্ত্রী তার দেশের রাষ্ট্রদুতকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করেন, যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইরানের জন্য কুয়েত এই মুহুর্তে কী সাহায্য করতে পারে? উত্তরে ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেরোসিন তেল পাঠানোর অনুরোধ জানান। অনতিবিলম্বে কুয়েত ইরানের জন্য কেরোসিন তেল সাপ্লাই শুরু করে দেয়। স্মরণ রাখতে হবে, যুদ্ধের পর কুয়েত ইরাকের কাছে এ ধরনের কোন অনুরোধ জানায়নি। কারণ তাদের ধারণায় ইরাকের জন্য তারা আগেই অনেক কিছু করেছে।

১৯৮৮ সালের শেষে এবং ১৯৮৯ এর শুরুতে কুয়েত ইরাককে দেওয়া আর্থিক সাহায্য মওকুফ করার জন্য রাজি ছিল, কিন্তু শর্ত ছিল ইরাক কুয়েত সীমান্ত মেনে নেবে। অনেক কর্মকর্তা হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, এ বিষয়টি উত্থাপনের এটা উপযুক্ত সময় নয়, কিন্তু কুয়েত সরকার তাদের কথায় কান দেয়নি। ১৯৮৯ এর শুরুতে বাগদাদে নিযুক্ত কুয়েতি রাষ্ট্রদূত "ইব্রাহিক জাসীম আলবাহু" কে এ বিষয়ে ইরাক সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য নির্দেশ পাঠানো হয়।

ইসরায়েলের প্রতি বিষোদগার আর নেপথ্যে কুয়েতের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের প্রস্তুতি

অতীতে ইরাকই সব সময় সীমান্ত সমস্যা উত্থাপন করত, কিন্তু এবার এই প্রথম কুয়েত এ সমস্যাটি উত্থাপন করল। অনেক কুয়েতি কর্মকর্তার মতে এ সময় এ সমস্যাটি উত্থাপনের অর্থ ছিল নির্ধিষ্ট সময়ের পূর্বে কাউকে তার পারিতোষিকের বিল পাঠিয়ে দেওয়া। সে সময় কুয়েতের আমির শেখ জাবেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি যেন ইরাক সফর করেন। ইতিমধ্যে শাহ ফাহাদ, হোসনী মুবারক, কর্নেল কাযাফী (গাদ্দাফী), শাজলী বিন জাদীদ, কাতারের শেখ খলীফা, শায়েখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান এবং ইয়ামেনের প্রেসিডেন্ট ছালেহ ইরাক সফর করে ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরাকের বিজয়ে সাদ্দাম হোসেনকে অভিনন্দন জানান। কেবলমাত্র কুয়েতের আমীর সে সময় পর্যন্ত ইরাক সফর করেননি। কুয়েতের জন্য এটা মোটেও ঠিক হয়নি। কারণ, এ যুদ্ধে ইরানের বিজয়ের ফলে সে-ই সব থেকে বেশী হুমকির সম্মুখীন হতো। কুয়েতের পক্ষ থেকে ইরাককে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সীমান্ত নির্ধারণের যে অনুরোধ জানান হয় ইরাক সরকার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তা উপেক্ষা করে কুয়েতকে বলা হয় 'সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ইরাক খুশী অনুভব করবে। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় কুয়েত ইরাকের বেশকিছু অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। নিঃসন্দেহে বলা চলে কুয়েত ইরাকের দুর্বল জায়গায় আঘাত হেনেছিল। সুতরাং এ সময় উভয় দেশের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যায়ের সরকারি সফর সম্ভব ছিল না। ফলে কুয়েত সিদ্ধান্ত নেয়, প্রথমে যুবরাজ শাহজাদা শায়েখ সা'য়াদ আল-আব্দুল্লাহ আল আস-সাবাহকে বাগদাদে প্রেরণ করা হবে। যুরজ শায়েখ সায়াদ ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ চারদিনের এক সফরে বাগদাদ রওনা হন। এর আগে কুয়েতের পত্র পত্রিকায় ইরাক-কুয়েত সীমান্ত সমস্যাটি সমাধানের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অন্যদিকে ইরাকি পত্র-পত্রিকায় কুয়েতকে দোষারোপ করে বলা হয়, সুযোগ বুঝে সে অবৈধভাবে ইরাকি ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে। এসময় ইরাকের একটি যুদ্ধজাহাজ কুয়েতের সমুদ্রসীমা লংঘন করে। একটি ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধও হয়ে যায়। ইরাকি পত্র-পত্রিকায় সে সময় একটি প্রবন্ধে বলা হয়, ইরাক কুয়েতের কাছ থেকে কেবল বিতর্কিত দু'টি দ্বীপই ফেরত চায় না, বরং যুদ্ধের সময় কুয়েত ইরাকের যে সমস্ত অঞ্চলের

উপর অবৈধ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে সেগুলিও সে ফেরত চায়। পর্যবেক্ষকদের ধারণা সাদ্দামের নিজস্ব ভঙ্গিতে উক্ত প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল।

কুয়েতি যুবরাজ শাহাজাদা শায়েখ সায়াদ যখন ইরাক সফর করেন তখন পারস্পরিক স্বর্থসংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনার সময় তিনি যথেষ্ট টানাপড়েনের শিকার হন। ফলে, ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি তার সফর সংক্ষেপ করে দেশে প্রত্যাবর্তনের আগ্রহ ব্যক্ত করেন, কিন্তু ইরাকি মন্ত্রীরা তাকে ইরাকে অবস্থান করতে বাধ্য রাখেন। অতঃপর যুবরাজ সায়াদ ইরাকের ভাইস প্রেসিযেন্ট ও বার্থ পাটির ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সফরে যুবরাজ সায়াদ অনুমান করেনে সীমান্ত সংকট নিস্পত্তির ব্যাপারে ইরাকি নেতাদের আশ্বস্ত করা খুবই কঠিন কাজ। এই রুপ নিরাশ অবস্থায় হঠাৎ করে তার সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের সাক্ষাৎ করানো হয়। ইরাকি প্রেসিডেন্ট সীমান্ত সমস্যা নিয়ে তার দেশের পত্রপত্রিকায় যেসব লেখা ছাপানো হয়েছে তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমার ধারণায় কোন আড়ম্বর ছাড়াই সমস্যাটির সমাধান করে নেওয়া প্রয়োজন। এ সময় সাদ্দামের জনৈক সহকারী বলে ওঠেন, এ সমস্যার ব্যাপারে অপনারাই সর্বপ্রথম লেখালেখি শুরু করেছেন। আমরা কেবল আপনাদের উত্থাপতি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। সাদ্দাম হোসেন তখন তার অবসাদ ও ক্লান্তি প্রকাশ করে বলেন, এটা আমার জন্য একটা অতিরিক্ত বোঝাস্বরুপ। পরে তিনি যুবরাজকে সরাসরি লক্ষ করে বলেন, এ সমস্যাটি নিয়ে আপনারা পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক আজিজের সঙ্গে আলোচনা করুন। তিনি তারেক আজিজকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, এ বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হোক। তারেক আজিজ প্রস্তাব দেন যে, এই কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত থাকবেন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন, যুবরাজ সায়াদ ও উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ। তারেক আজিজের এ প্রস্তাবে সাদ্দাম হোসেন সম্মতি প্রকাশ করেননি। তিনি তারেক আজিজকে লক্ষ করে বলেন যে, আমি এ সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না। আলোচনার মাঝে এক পর্যায়ে সাদ্দাম বলেন, ইরাকের কাছে গভীর পানি না থাকার কারণে আমার নৌবাহিনী বেকার হয়ে পড়ে আছে। অথচ এ মুহুর্তে ইরাকি নৌবাহিনীকে উপসাগরীয় অঞ্চলে মোয়ায়েন করা খুবই প্রয়োজন ছিল। এটা কেবল ইরাকের একার স্বার্থে নয়, বরং সকল আরব দেশের স্বার্থে এটা প্রয়োজন। শায়েখ সায়েদ বলেন, সীমান্ত সমস্যা সমাধান করে নেওয়া হলে কুয়েত ইরাককে যে কোন ধরনের সুবিধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। অতঃপন সাদ্দাম হোসেন এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

সীমান্ত সমস্যা নিস্পত্তির জন্য গঠিত কমিটির প্রধান দুই চরিত্র ছিলেন ইরাকের উপপ্রধান মন্ত্রী সা'য়দুন হাম্মাদী আর কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শায়েখ সাবাহ। উভয় দেশের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত নির্ধারণ ও কুয়েতের দেওয়া ইরাকি ঋণের ব্যাপারেও প্রাসঙ্গিক আলোচনা উত্থাপন করা হয়, উত্তরে সা'য়দুন হাম্মাদী বলেন, এসব ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়নি, অতএব এই অর্থের প্রয়োজন নেই। ইরাক এই অর্থের ব্যবস্থা কীভাবে করবে সে ব্যাপারে সে চিন্তিত।

জানুয়ারী ১৯৯০ ইরাক কুয়েতকে অনুরোধ জানায়, জরুরি ভিত্তিতে ইরাককে যেন এক হাজার কোটি ডলার সাহায্য দেওয়া হয়। আর ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় ইরাককে দেওয়া ১৪শ' কোটি ডলার মওকুফ করে দেওয়া হয়। কুয়েত এ অনুরোধের তেমন কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বরং পঞ্চাশ কোটি ডলার প্রদানের প্রস্তাব দেয়। এ সময় অতীত ঋণের ব্যাপারে সে টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। ফেব্রুয়ারী মাসে সা'য়দুন হাম্মাদীকে শায়েখ সাবাহ একটি পত্র লেখেন। ঐ পত্রে বলা হয় ১৯৬৩ সালে উভয় দেশ এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছেছিল যে, ১৯৩১ সালে তদানীন্তন ইরাকি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কুয়েতী গভর্নরের কাছে পাঠানো প্রাথমিক নকশা অনুযায়ী ইরাক কুয়েতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেবে। ঐ সময় কুয়েতি গভর্নর ইরাকি প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দেন। উল্লেখ্য, সে সময় ইরাক এবং কুয়েতের উপর বৃটিশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৃটেনের ইঙ্গিতেই উভয় দেশ এ ধরনের একটি সমাধানে উপনীত হতে পেরেছিল। মরুভূমি অঞ্চলে সীমান্ত নির্ধারণ করা খুব কঠিন কাজ, তাই শায়েখ সাবাহ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সীমান্ত বিষয় অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক এবং উভয় দেশের সীমান্ত নির্ধারণের বিষয়টি তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক।

ইরাকি উপপ্রধানমন্ত্রী সা'য়দুন হাম্মাদী কুয়েতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শায়েখ সাবাহের পত্রের উত্তর দেন অনেকটা এভাবে, আমি অত্যান্ত মনোযোগ সহকারে আপনার পত্র পাঠ করেছি, আমার ধারণায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালভাবে অবগত আছেন যে, টেকনিশিয়ান বা অভিজ্ঞব্যক্তিরা কখনও সীমান্ত নির্ধারণ করে না। এটা তাদের কাজ নয়। সীমান্ত সমস্যা সব সময় একটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে বিবেচিত। আপনি আপনার পত্রে ১৯৩১ সালের চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, অথচ বর্তমানে তার কোন বাস্তব ও আইনগত অস্তিত্বই নেই, এ চ্যাপ্টারত অনেক আগেই ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে।

সয়দুন হাম্মাদী তার পত্রে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেন, ইরানি আগ্রাসনের পথরোধ করে ইরাকিরা আরব বিশ্বের উপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছে। এই যুদ্ধে ইরাকিদের অনেক খেসারত দিতে হয়েছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ কুয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী শায়েখ সাবাহ আরেক দফা ইরাক সফর করেন। এই সফরের সময় তিনি ইরাকি কর্মকর্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সৌদি আরবের সঙ্গে তার যুদ্ধ না করার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু কুয়েতকে এ ধরনের কোন প্রস্তাব দেওয়া হয়নি কেন? উত্তরে ইরাকি কর্মকর্তারা নিশ্চুপ থাকেন, তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না।

মে ১৯৯০ সা'য়দুন হাম্মাদী কুয়েত সফরে যান এবং ইরাককে জরুরি ভিত্তিতে এক হাজার কোটি ডলার প্রদানের অনুরোধ জানান। এ সময় ইরাক প্রস্তাবিত সুপাগান তৈরি ও পামাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমারা তখন ইরাকি অভিপ্রায়ের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে। এ সময় সাদ্দাম হোসেনের বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, ইরাকের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কুয়েতও কোন না কোন অংশে শরিক হয়ে কাজ করছে। কুয়েতি কুটনীতিক শায়েখ সা'য়দ এর নেতৃত্বে একটি ডিলিগেশন আমেরিকায় এফ-১৮ জঙ্গী বিমান ক্রয়ের ব্যাপারে আলাপ আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়। আমেরিকান কংগ্রেস কমিটির জনৈক সদস্য কুয়েতি ডেলিগেশনের নিকট জানতে চান, এই জঙ্গী বিমান কি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে?

উত্তরে একজন কুয়েতি ডেলিগেট বলেন, না! এ বিমান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না, বরং প্রতিবেশী দেশ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই আমাদের এ বিমান প্রয়োজন। সাদ্দাম হোসেন এই ডেলিগেটের কথাটি সব সময় স্মরণে রেখেছেন। এই গেলিগেটটি আরও বলেন, আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য আমরা এ বিমান ক্রয় করতে চাই না। ইরাকের ধারণা প্রতিবেশী দেশ হিসাবে কুয়েতিরা ইন-ডাইরেক্টভাবে ইরাককেই বুঝাতে চেয়েছে।

পাবলিক সেন্টিমেন্ট স্বপক্ষে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি কনফারেন্সের ব্যবস্থা করেন। ইরাক কুয়েতের সঙ্গে কোন বিরোধপূর্ণ আলোচনায় না গিয়ে ইসরায়েল ও পশ্চিমাজগৎ তার বিরুদ্ধে যে বিষোদগার করে চলেছে সে ব্যাপারে এই কনফারেন্সে আলোচনা করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। এ কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয় ছিল “আরব জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির

সম্মুখীন ও তার প্রতিকার", কিন্তু আরব রাষ্ট্রপ্রধান কোন একপক্ষ অবলম্বনেরও পক্ষপাতী ছিলেন না। অনেকের ধারণায় বারবার এ ধরনের বৈঠক আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ বৈঠকের গুরুত্ব খর্ব করবে। পিএলও নেতা জনাব ইয়াসির আরাফাত সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি সাদ্দামের ডাকে সাড়া দেন। ইয়াসির আরাফাতের বক্তব্য ছিল ইরাক ও কুয়েত স্নায়ুযুদ্ধের সম্মুখীন-অতএব পুরো আরব বিশ্বকে বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আগেই ধারণা করা হয়েছিল সিরিয়া ইরাকের ডাকে ইতিবাচক সাড়া দেবে না, হাফেজ আল আসাদ পরিস্কার জানিয়ে দেন তিনি এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করবেন না, সৌদি আরব ও মিসরের ধারণা ছিল এই শীর্ষ বৈঠকে কোন সমস্যা সমাধান তো হবেই না বরং পূর্বের সমস্যাগুলো আরও জটিল হয়ে পড়বে। উভয় দেশ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছে যে সাদ্দাম হোসেনকে কনফারেন্স মুলতবি করার জন্য অনুরোধ জানান হোক। সৌদি যুবরাজ শাহজাদা আব্দুল আজিজ এ উদ্দেশ্যে মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর যখন দামেস্কে পৌঁছেন তখন শাহ ফাহাদের পক্ষ থেকে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন সাদ্দামের আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দেন। শাহ ফাহাদ হঠাৎ করে তার মত কেন পরিবর্তন করলেন সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা খুব কঠিন। তবে কিছুসংখ্যক আরব কুটনীতিকের ধারণায় সাদ্দাম হোসেনের একটি টেলিফোন পেয়ে শাহ ফাহাদ হঠাৎ করে তার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। মোটকথা ১১ই মে পর্যন্ত ২১টি আরব দেশের মধ্যে ১৮টি দেশ সাদ্দাম হোসেনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আরব শীর্ষ বৈঠকে অংশগ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করে।

এই কনফারেন্সের জন্য চার দফাবিশিষ্ট একটি এজেন্ডা তৈরি করা হয়।

১. ইরাক, ইসরায়েল, আমেরিকার কর্তৃক যে হুমকির সম্মুখীন সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা।
২. আরবদের আধুনিক প্রযুক্তি অর্জনের পথে পশ্চিমাদের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা।
৩. আরববিশ্বের সার্বিক উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ব্যাপারে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা। উল্লেখ্য, একবার আরববিশ্বের সার্বিক উন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ব্যাপারে একটি ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ওই ঐকমত্যকে বাস্তবে রুপ দেওয়া সম্ভব হয়নি।
৪. উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা।

শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে মে মাসের দুই তারিখে আরব মন্ত্রীদের এক বৈঠকে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহজাদা সৌদ আল ফয়সাল এজেন্ডার প্রথম দফার উপর আপত্তি তুলে বলেন, কোন দেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সে সময় পর্যন্ত সঠিক হবে না যতক্ষণ তার বিরুদ্ধে কোন অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া যায়। মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীও সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতকে সমর্থন করেন। এসময় স্বাগতিক দেশের প্রতিনিধি তারেক আজিজ উঠে দাঁড়ান। উল্লেখ্য, তারেক আজিজই উক্ত বৈঠকের সভাপতিত্ব করছিলেন, তিনি সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদিবাদ ও তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেন। আট বছর ধরে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে ইরাকের কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে ব্যাপারেও আলোচনা করেন এবং অভিযোগের সুরে বলেন, এ সময় আরব দেশগুলি ইরাককে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য করেনি। তখন তারেক আজিজকে খুবই রাগান্বিত মনে হয়। তার বাচনভঙ্গি দেখে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন।

মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ইসমাত আবদুল মুফিদ বলেন আমি মিঃ তারেক আজিজের মুখে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি শুনে অবাক না হয়ে পারিনি। কারণ এটা তো অতীতের পরিভাষা। আমরা এখানে আরব জাতীয়তাবাদের দীক্ষা নেওয়ার জন্য আসিনি। যদি কেউ ইরান-ইরাক যুদ্ধে তাদের ত্যাগের কথা আলোচনা করতে চায় তাহলে আমি আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে মিসরের ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আর যদি আপনি একথা বলেন যে, ইরাকের দুঃসময়ে তাকে কেউ সাহায্য করেছিল তাহলে আমি বলতে বাধ্য হবো আপনাদের একথা ঠিক নয়। উক্ত বৈঠকে তারেক আজিজ ও অন্যান্য আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ভাষণে আরেকবার পৃথিবীর সামনে আরবদের পারস্পরিক বিরোধ দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে ওঠে।

আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ বৈঠক মে মাসের ২৮ তারিখ থেকে শুরু হয়ে ৩০ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ শীর্ষ বৈঠকটি এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হয় সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ছিল খুবই ঘোলাটে। প্রথমতঃ এ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কোন লক্ষণই তখন দৃষ্টিগোচর হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এ সময় জেরুসালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে আমেরিকান কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। ইহুদিবাদকে বর্ণবৈষম্যবাদ আখ্যা দিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যে প্রস্তাব পাশ করে আমেরিকা তাকে রহিত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। তৃতীয়তঃ তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আগত ইহুদিদের অধিকৃত আরব এলাকায় পুনর্বাসনের কাজ শুরু করা হয়। চতুর্থতঃ ফিলিস্তিনীদের

ইনতিফাদাহ আন্দোলনকে দমন করা জন্য ইসরায়েল যে নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নেয় সে কারণে শত শত ফিলিস্তিনী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এসব কারণে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। জানুয়ারী ১৯৯০ থেকে মে ১৯৯০ পর্যন্ত এই পাঁচ মাসে রেডক্রস, এমনেস্টি ইন্টরন্যাশনাল ও আরবদের মানবাধিকার সংস্থাগুলি ১৪টি রিপোর্ট প্রকাশ করে। রেডক্রসের রিপোর্টে বলা হয় ইনতিফাদাহ আন্দোলনের সময় ৩৬২ জন শিশু মৃত্যুবরণ করেছে। আরব শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের তিনদিন পূর্বে এ বিষয়টি নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা করা হয় এবং এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের জন্য জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয়, কিন্তু ইসরায়েল ঘোষণা দেয় যে, সে এমন কোন প্রতিনিধি দলকে অধিকৃত আরব এলাকা পরিদর্শনের অনুমতি দেবে না। ফলে নিরাপত্তা পরিষদ তার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

শীর্ষ বৈঠকের দ্বিতীয় দিন ফিলিস্তিন লিবারেশন ফ্রন্টের ১৬ জন গেরিলা একটি ইসরায়েলি সামুদ্রিক বন্দরে হামলা চালায়। এই হামলার সময় ১২ জন গেরিলা মারা যায়। এমতাবস্থায় আরব শীর্ষ বৈঠকে যদি ইসরায়েল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দেওয়া হয় তাহলে তা নিঃন্দেহে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু সাদ্দাম হোসেন অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে যান। তিনি পরিস্কার ভাষায় ইরাকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন ইরাককে অর্থনৈতিক, সমরিক ও কৌশলগত দিক থেকে পঙ্গু করার নীল নকশা তৈরি করা হচ্ছে। তিনি তার ভাষণে আরব শায়েখদের প্রতি প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দিয়ে বলেন যারা আত্মবিস্মৃত তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আরব নিরাপত্তাতে ছোট ছোট প্রজাতন্তের স্বার্থে বিকিয়ে দেওয়া যায় না। সাদ্দাম বলেন আমেরিকা সকলের দুশমন, আমরা সবাই একটি আগ্নেগিরির উপর বসে আছি। যারা মনে করেন বিস্ফোরণকালে কোনরকম পক্ষপাতমুলক আচরণ করবে তারা ভুলে ডুবে আছেন। সাদ্দামের এ ধরনের বক্তব্য আমেরিকার ক্ষিপ্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারপর সাদ্দাম যখন বললেন কুয়েত ও আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত তখন আমেরিকার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, সাদ্দামের লক্ষ্যবস্তু কোন আরব দেশ, ইসরায়েল নয়।

এই কনফারেন্সে পিএলও ইন্তিফাদাহ আন্দোলনের জন্য আরও ১৫শ' কোটি ডলার সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু উত্তরে দাতা দেশগুলির প্রতিনিধিরা কোন টু শব্দ না করে চুপচাপ বসে থাকেন। এ সময় সাদ্দাম হোসেন বলেন আমিও

কুয়েতের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম কিন্তু কোন সাড়া পাইনি। তিনি বলেন, ইরাক ধৈর্য ধরতে পারে, কিন্তু অধিকৃত এলাকায় যারা আন্দোলন করছে তাদেরকে ধৈর্য ধরতে বলা যায় না। জর্ডানের হুসাইন আরবদেশগুলির জন্য সম্মিলিত সাহায্যের ব্যাপারে তার মতামত পুনর্ব্যক্ত করেন, কিন্তু ১৯৮৯ তে অনুষ্ঠিত কাসাবলাংকা সম্মেলনের ন্যায় এবারও শাহ হুসাইনকে নিরাশ হতে হলো। ধনী দেশগুলি যেমন দীর্ঘমেয়াদী ও সম্মিলিত ঋণদানের পক্ষে ছিল না তেমনি ঋণগ্রহীতা দেশগুলিও কোন একটি ইস্যুতে একমত ছিলনা। উদাহরণস্বরূপ মিসর পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দিচ্ছিল আর সিরিয়াও ছিল তার পক্ষে। ফলে জর্ডানও পিএলও'র মতামত হালে পানি পায়নি।

সম্মেলন শেষে শাহ ফাহাদ ও সাদ্দাম হোসেন একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হন। সাদ্দামকে লক্ষ করে শাহ ফাহাদ বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি আপনি সম্মেলন কক্ষে খুবই অগ্নিশর্মা ছিলেন উত্তরে সাদ্দাম বলেন, ইয়াসির আরাফাত আমাকে ফিলিস্তিনীদের করুণ অবস্থার কথা জানিয়েছেন, কিন্তু অর্থের পাহাড় গড়ে তোলা এই আরবরা তাদের সাহায্য করার জন্য মোটেও প্রস্তুত নয়। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সাদ্দাম আরও বলেন কুয়েত নির্ধারিত কোটা থেকে বেশি তেল উত্তোলন করছে। তাছাড়া কুয়েতের সঙ্গে রয়েছে আমাদের দীর্ঘদিনের সীমান্ত সমস্যা। সাদ্দাম হোসেন কুয়েতি পর্যটকদের অশোভন আচরণের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, কুয়েতি পর্যটকরা ইরাকি নারীদের বেশ্যা মনে করে। তিনি আরও বলেন, আমার রাগের তখন সীমা থাকেনি যখন আমি জানতে পারলাম জনৈক কুয়েতি ধনকুব এক পার্টিতে একজন ইরাকি নারীকে খরিদ করার চেষ্টা করে। জনৈক কুয়েতি কুটনীতিক এ মন্তব্যও করেছেন যে, মাত্র দশ দিনারের বিনিময়ে যেকোন কুয়েতি যেকোন সম্ভ্রান্ত ইরাকি কুমারীকে লাভ করতে পারে। সাদ্দাম হোসেন কুয়েত কর্তৃক তেলের নির্ধারিত কোটা লংঘনের কারণে যারপরনাই অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন এই প্রক্রিয়া আমাদেরকে শেষ করার একটা ষড়যন্ত্র সাদ্দাম হোসেন নতুন করে আবারও কুয়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, কুয়েত আমেরিকার সঙ্গে যোগসাজশ করে ইরাকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ইরাকি নেতা প্রস্তাব দিয়ে বলেন ইরাক, কুয়েত ও সৌদি আরব তিন দেশের সমন্বয়ে আরেকটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হোক। এই সম্মেলনে শাহ ফাহাদ বিচারক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। শাহ ফাহাদ ইরাকের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বলেন অতিসত্বর এ ব্যাপারে একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

আরব নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন শেষে একটি যুক্ত ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। ঐ ইশতেহারে অত্র অঞ্চলে সকল গোলোযোগ ও অশান্তির মূল হোতা আমেরিকাকে সাবস্ত করা হয়। সম্মেলন শেষে সাদ্দাম হোসেন এবং কুয়েতি আমির যখন বাগদাদ এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন তখন শায়েখ জাবেরের চেহারায় দুশ্চিন্তার রেখাগুলি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কুয়েতি নেতা বলেন আগ্রহ থাকলে প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান সম্ভব। সাদ্দাম তখন এক হাজার কোটি ডলার সাহায্যের আবেদনটি নতুন করে তাঁকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আমরা যখনই সাহায্য প্রার্থনা করি আপনারা তখনই পুরান ঋণের আলোচনা টেনে আনেন। শায়েখ জাবের ইরাকি নেতাদের স্মরণ করিয়ে দেন। কুয়েত ইরাকের কাছে কখনও তার দেওয়া ঋণের অর্থ ফেরত চায়নি। পুরাতন ঋণের আলোচনা পর্যন্ত সে ক্ষান্ত থাকে। সাদ্দাম তখন শায়েখ জাবেরের কাছে জানতে চান কুয়েত এ ঋণ মওকুফ কেন করে না? উত্তরে শায়েখ জাবের বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে কেউ কোন দিন আপনাদের কাছে ঋণের অর্থ ফেরত চেয়েছে? শুনুন আমি বলি, আমরা লিখিতভাবে এই ঋণ মওকুফ করি না। আসল কারণ হলো কুয়েত যদি ইরাকের ঋণ মওকুফ করার ঘোষণা দেয় তাহলে আই,এম এফ এর রেকর্ড ইরাকি ঋণেল পরিমাণ হ্রাস পাবে। ফলে, অন্যান্য দেশ আপনাদের উপর তাদের বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারে। সুতরাং ইরাকের স্বার্থ রেকর্ড পত্রে ইরাকের ঋণ বাকি রাখাটাই উত্তম হবে বলে আমরা মনে করি, কিন্তু সাদ্দাম হোসেন শায়েখ জাবেরের এই যুক্তি মানতে রাজি ছিলেন না।

মার্চ ১৯৯০ তে ওপেকের বৈঠকে তেলের উত্তোলন হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে যদিও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু বাস্তবে এটাকে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। জুলাই ১৯৯০ তে জেদ্দায় ওপেকের মন্ত্রী পর্যায়ে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তেলের মূল্য প্রতি ব্যারেল ১৮ ডলারই রাখা হবে। কুয়েত তেল উত্তোলন হ্রাস করে কিন্তু ওপেকভ্ক্তু দেশগুলির সম্মিলিত উত্তোলন তেলের পরিমাণে তেমন কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়নি। অপরদিকে তেলের মূল্য কম হয়ে ১৪ ডলার এ দাঁড়ায়।

ইরাকি অর্থনীতির আগের থেকেই পঙ্গুদশা। তারপর তেলের মূল্যহ্রাসের ফলে তার অর্থনীতি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ইরাক চেয়েছিল প্রতি ব্যারেল তেলের মূল্য ২৫ ডলার নির্ধারণ করা হোক। ইরাকের উপপ্রধানমন্ত্রী সায়দুন

হাম্মাদী সৌদি আরব, কুয়েত আমিরাত ও কাতারকে এ উদ্দেশ্যে পয়মাগও পাঠিয়েছিলেন। ঐ পয়গামে কুয়েত ও আরব আমিরাতকে ইরাকি অর্থনীতির পঙ্গুদশার জন্য দায়ি সাব্যস্ত করা হয় এবং বলা হয়, এ অবস্থার জন্য দায়ী দেশসমূহকে ইরাক কখনও ক্ষমা করতে পারে না।

জুলাই ১৯৯০ এর মাঝামাঝি ইরাক এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয় যে, উদ্ধৃত পরিস্থিতির কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। আশার একটা ক্ষীণ প্রদ্বীপ তখনও অবশ্য টিমটিম করে জ্বলছিল। তা হলো সাদ্দাম হোসেনের বিশ্বাস ছিল শাহ ফাহাদ বাগদাদ কনফারেন্সের পর যে খুদে শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি অবশ্যই পালন করবেন কিন্তু সাদ্দামের এ আশা তখন নিরাশায় পরিণত হয় যখন সৌদি তেলমন্ত্রী ইরাক, কুয়েত, আরব আমিরাত ও কাতারের মন্ত্রীদের উক্ত শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ইরাকিদের ধারণায় এ ধরনের শীর্ষ সম্মেলন হতে শাহ ফাহাদ প্রতিশ্রুত শীর্ষ সম্মেলনের বিপরীত উক্ত সম্মেলনের জন্য ১১ জুলাই তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু ৯ই জুলাই ইরাকি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কাতার ও সৌদি বাদশাহ ফাহাদের মাঝে কথিত একটি টেলিফোন ট্যাপ করে। ইরাকের দাবি অনুযায়ী উক্ত টেলিফোনিক আলাপের সময় শাহ ফাহাদ কাতারের নেতাকে বলেন, মন্ত্রী পর্যায়ের এই বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য সাদ্দাম হোসেনকে বাগে আনা, টেপকৃত এই কথোপকথনের কিছু অংশ ইরাকিরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে প্রকাশ করে দেয়। ইরাকি দাবি অনুযায়ী কাতার ও সৌদি নেতার মাঝে যে কথাবার্তা হয় তা অনেকটা এরকম-

আমি জানিনা সাদ্দামের উদ্দেশ্য কী? সে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায়, অথচ জানে না ইসরায়েলের কাছে ২০০ এটমবোম আছে। আমার মনে হয়, সে নাছেরের পরিণতির কথা ভুলে গেছে। পাশ্চাত্যের স্বার্থে আঘাত হানার কারণে নাছেরের পরিণাম ফল কী হয়েছিল তার সেকথা স্মরণ নেই। আমার মনে হয় আমেরিকার বিরুদ্ধাচরণ বাদ দিয়ে মস্কোর করুণ পরিণতি থেকে সাদ্দামের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন কয়েক দশক ধরে আমেরিকার বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল, এখন তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে চলেছে। আল্লাহর কসম সাদ্দাম নিজেকে এবং আমাদের সবাইকে মারাত্মক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

সৌদি আরব স্বীকার করে, শাহ ফাহাদ কাতারের শায়েখের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছিলেন। তবে সৌদি সরকার জানায় ইরাক শাহ ফাহাদের বক্তব্য বিকৃত করে নিজেদের মর্জিমত প্রচার করছে।

২৬শে জুলাই ওপেকের আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রতিব্যারেল তেলের মূল্য ২১ ডলার নির্ধারণ করা হয়। এ মূল্য অনেক আগেই নির্ধারণ করা উচিত ছিল। এই মুতুর্তে তেলের এ নির্ধারিত মূল্য ছিল নিরর্থক। পরিস্থিতি এতোদুর গড়িয়ে দিয়েছে যে, তেলের নির্ধারিত এ মূল্য যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত করতে ছিল অক্ষম।

ইরাক-কুয়েত নাটকের সব থেকে ইন্টারেষ্টিং দিক ছিল এই যে, আগামীতে কী হতে যাচ্ছে তা সবার জানা ছিল তারপরও মনে হয়েছে সব কিছু যেন হঠাৎ করেই ঘটে গেল। পশ্চিমা ও আরব নেতাদের ধারণা ছিল ইরাক প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। কয়েকদিন একটু হম্বিতম্বি করে চুপ হয়ে যাবে। অথচ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ইরাকি বাহিনীর সকল কার্যকলাপের বিস্তারিত রিপোর্ট আমেরিকার কাছে পৌঁছুচ্ছিল। এরপরও ভিত্তিহীন ও অমূলক ধারণার আশ্রয় নেওয়ার পিছনে কোন যুক্তি ছিল বলে আমরা মনে করি না। বাগদাদ ও কুয়েতে আমেরিকান দূতাবাস ছাড়াও কুয়েতে আমেরিকান সিআইএ একটি ইউনিট রীতিমত সার্বক্ষণিক কাজে লিপ্ত ছিল। এই ইউনিটের দায়িত্ব ছিল কুয়েতের আমির শায়েখ জাবেরকে রক্ষা করা।

ইরাকি আগ্রাসনের পর কুয়েতের সরকারি নথিপত্রে একটি রিপোর্টের সন্দান পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্ট থেকে সর্বপ্রথম এই গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যে, কুয়েতে সিআইএ'র একটি ইউনিট সার্বক্ষণিক নিয়োজিত ছিল। এই রিপোর্টকে "টপসিক্রেট" নাম দেওয়া হয়। এই রিপোর্টটি নভেম্বরের শেষে অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে কুয়েতি রাজপরিবারের জনৈক সদস্য ব্রিগেডিয়ার সায়াদ আহমদ আল ফাহাদ আসসাবাহ লিপিবদ্ধ করেন। এতে কুয়েতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শায়েখ সালেমকে সরাসরি সম্ভাষণ জানান হয়। এ রিপোর্টে ব্রিগেডিয়ার সায়াদ আহমাদ ও স্পর্শকাতর হাম্মাদী অঞ্চলের সিকিউরিটি ডাইরেক্টর কর্নেল ইসহাক আবদুল হাদী শাদ্দাদ একটি গোপন মিশনে আমেরিকায় গিয়ে কীসব দায়িত্ব পালন করবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ছিল। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়, আমরা সিআইএ'র হেডকোয়ার্টার পদির্শন করেছি। আমেরিকার ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা আমাদের

সফর গোপন রেখেছি। ফলে উপসাগরীয় সহযোগীতা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত আরব দেশ বিশেষতঃ ইরাক ও ইরান এই সফর সম্পর্কে কিছুই টের পাবে না। ১২ থেকে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত আমরা এ সফর সম্পন্ন করি।

১৪ই নভেম্বর ১৯৮৯ সিআইএ'র ডাইরেক্টর জেনারেল জর্জ উইলিয়ামের সঙ্গে সাক্ষাতে যেসব বিষয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেসব বিষয় সম্পর্কে আমি আপনাকে অবিহিত করতে চাই। যেসব বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলি নিম্নরুপ-

১. একটি আমেরিকান বিশেষজ্ঞ দল কুয়েতের আমির ও যুবরাজের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত কুয়েতি গ্রুপটির প্রশিক্ষণ দিবে। ঐ রিপোটে বলা হয়, ১৯৮৫ সালে যখন শায়েখ জাবেরের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয় তখন যে আমেরিকান গ্রুপটি কুয়েতের আমিরের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে আমরা আশ্বস্ত নই।

২. আমরা আমেরিকার সঙ্গে এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছি যে, উভয় দেশের সংবাদ ও ডেলিগেশন বিনিময় হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া ইরান ও ইরাকের সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংবাদাদির আদান-প্রদান প্রয়োজন। জানা যায়, কুয়েতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে কম্পিউটারসহ সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতার ব্যাপারে কুয়েত ও আমেররিকার মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া উগ্রপন্থী শিয়াদের ব্যাপারে সংবাদপত্রের আদান-প্রদানে একমত হওয়ার পর আসল বিষয় সম্পর্কে বলা হয় :-

৩. আমরা আমেরিকানদের সঙ্গে একমত যে, বিধ্বস্ত ইরাকি অর্থনীতি থেকে আমাদের সুযোগ লাভ করা উচিত। এই প্রক্রিয়ায় তাকে সীমান্ত নির্ধারণের ব্যাপারে বাধ্য করা সম্ভব । সিআইএ আমাদের জানিয়েছে, আমাদের উদ্দেশ্যে কীভাবে সফল হতে পার, কীভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত প্রশস্ত হতে পারে। এসব ব্যাপারে তাদের মতামত হলো, উভয় দেশের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃতীত হওয়া উচিৎ। সিআইএ'র ধারণা, কুয়েত-ইরান সম্পর্কের বিষয়টি পুনর্বিবেচনাধীন হওয়া প্রয়োজন। সিরিয়ার সঙ্গে কুয়েতের দ্বিতীয়বার ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। ইরানের সঙ্গে বৈরী মনোভাব পরিত্যাগ করা উচিত। ইরানের

> উপর যদি চাপ প্রয়োগ করতেই হয় তাহলে এমনভাবে তা করা উচিত যাতে ইরান বিষয়টি অনুধাবন করতে না পারে।

উক্ত রিপোর্টে মাদকদ্রব্যের চোরাচালান রোধে বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়। এ ব্যাপারেও সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত রিপোর্টের শেষে বলা হয়, আমি নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। আল্লাহ আপনার প্রতি সহায় হোন। এই গোপন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় আমেরিকা গোপনে ইরানকে কেন ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছিল, তেলের মূল্য কম রাখার কুয়েতি পদক্ষেপ, মানবাধিকার সংক্রান্ত রিপোর্টে ইরাককে সমালোচনার টার্গেটে কেন পরিণত করা হয় এসব বিষয় বুঝতে ইরাকের আর বাকি রইল না। ইরাকিদের মতে আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবরোধের জন্য বাহানা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পরে ইরাক যে সন্দেহ পোষণ করছিল এই রিপোর্টটি তার সন্দেহকে সত্য প্রমাণিত করে। ইরাকের আরও ধারণা ছিল আমেরিকানদের সঙ্গে কুয়েতিরাও রীতিমত সহযোগী হয়ে কাজ করছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কুয়েত দখলের পর এই চিঠিটি ইরাকিদের হস্তগত হয়, কিন্তু কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকি আগ্রাসনের কয়েকমাস পূর্বে এপ্রিল অথবা মে ১৯৯০ ইরাকের একটি আরব বন্ধুরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক সাদ্দাম হোসেনকে জানান, পশ্চিমা দেশগুলির একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অত্র অঞ্চলের জন্য ইরাককে একটি বিপজ্জনক দেশ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখন থেকে সেভাবেই তার সঙ্গে আচরণ করা হবে। উক্ত সুত্রে আরও খবর পাওয়া যায় যে, সাদ্দাম হোসনকে কীভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় সে ব্যাপারে আমেরিকা সুযোগের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। বিভিন্ন সুত্রে প্রকাশ, সাদ্দাম হোসেনকে জানান হয় যে, ইরান-ইরাক যুদ্ধের পর শাহ ফাহাদ বলেছেন, ইরাকিরা যদি ভদ্রোচিত আচরণ করে তাহলে তো কোন কথা নেই। আর যদি তারা বিজয়ীসুলভ আচরণ করে এবং আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয় তাহলে খোদার কসম তাকে এর পরিণাম ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

এসব সত্ত্বেও ইরাক কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে অবশ্য কিছু সময় নিয়েছিল। বাগদাদ সম্মেলনের ফলে ইরাকি সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব হয়নি। জুলাই ১৯৯০ এর শুরুতে ইরাকি বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের পর পর কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐসব বৈঠকে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা

হয়। অবশেষে ৮ই জুলাই ১৯৯০ তে একটি স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিপূর্বে যেসব বৈঠক হয় সেসব বৈঠক শেষে যে সরকারি বিবৃতি প্রদান করা হয় তাতে কেবল বৈঠক অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু ৮ই জুলাইয়ের পর যে বিবৃতি দেওয়া হয় তাতে বলা হয়, ইরাকে গণতন্ত্রকে কীভাবে সুসংহত করা যায় এবং এ ব্যাপারে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণীয় সে বিষয় পরস্পর মতবিনিময় করা হয়। ইরাক প্রদত্ত এই বিবৃতিকে কেউ বিশ্বাস করেনি। কিছুসংখ্যক আরব পর্যবেক্ষকদের ধারণা ছিল, এই বিবৃতির আড়ালে ইরাক অবশ্যই কিছু গোপন করছে।

ইরাকিরা অনুভব করছিল যত কালবিলম্ব হবে তত দুশমনের লৌহ বেষ্টনী তার চতুর্পাশে আরও মজবুত হয়ে উঠবে। ইরাকের এ ধারণা অমূলক ছিল না।

৯ জুলাই ১৯৯০ ইরানি প্রেসিডেন্ট রাফসানজানীর একটি বিশেষ পয়গাম নিয়ে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবার বেলায়েতী কুয়েত সফর করেন। এর পরপরই ইরানের সঙ্গেকুয়েতের কূটনৈতিক সম্পর্ক কায়েম হয়। ইরান তার ঝানু কুটনীতিবিদ হুসাইন সিদ্দিকীকে কুয়েতের রাষ্ট্রদূত করে পাঠায়। উপসাগরীয় পরিস্থিতি তখন ছিল খুব ভয়াবহ। উভয়পক্ষ পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে; কিন্তু তখনও পর্যন্ত সব কিছুই গোপনে গোপনে হচ্ছিল। ১৭ জুলাইকে বাথপার্টির ইরাকে ক্ষমতা গ্রহণের বার্ষিকী হিসাবে উদযাপন করা হয়। এদিন সাদ্দাম হোসেন কোন প্রকার প্রলেপ না রেখে স্বকীয় ভাবমূর্তি নিয়ে বিশ্বের দরবারে আবির্ভূত হন। একটি জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন, কোন কোন আরব দেশ নির্ধারিত কোটা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তেল উত্তোলন যদি বন্ধ না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হবে। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ সাক্ষী! আমরা সবাইকে আগেই সতর্ক করেছি।

ইরাকি নেতার এ বক্তব্যের বিশ্লেষণে ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকা মন্তব্য করে, "কোন কোন আরব দেশ বলতে পরিষ্কারভাবে কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।"

ইরাকি নেতা তার ভাষণে আবার অভিযোগ করে বলেন, কিছুসংখ্যক আরব দেশ ও আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইরাকের পিঠে যারা খঞ্জরের আঘাত হানতে চায় তাদের জন্য ইরাকি নেতা দুঃখ প্রকাশ করেন। সাদ্দাম যদিও তার ভাষণে কোন আরব দেশের নাম উল্লেখ করেননি; কিন্তু আগামী দিন তিউনিসে আরব দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকে ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তারেক আজিজ আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেলের হাতে একটি খোলা চিঠি প্রদান করেন, ঐ চিঠিতে সরাসরি কুয়েতকে দোষারোপ করে বলা হয়, কুয়েত ইরাকি অয়েলফিল্ড থেকে তেল চুরি করছে। চিঠির সারাংশ ছিল মোটামুটি এই যে, কুয়েতি পদক্ষেপ ইরাকের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের শামিল। আরব পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা ইরাকি চিঠির ব্যাপারে কোন স্পষ্ট রায়দানে বিরত থাকেন। তারা নিজ নিজ সরকারকে উক্ত চিঠির ব্যাপারে অবহিত না করে কোন মন্তব্য করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তারেক আজিজ খুবই অসন্তুষ্ট হন। যদিও ইরাকি খোলা চিঠির ব্যাপারে আরব পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক পর্যায়ের। আগামী ২৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরব দুনিয়া একটি বিব্রতকর অবস্থায় নিপতিত হয়। পরদিন শাহ ফাহাদ ইরাকি নেতার সঙ্গে ফোনে আলাপ করে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। উক্ত বিবৃতিতে শাহ ফাহাদ বলেন, ইরাকি নেতা আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, সকল বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে। শাহ ফাহাদ সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সালকে কালবিলম্ব না করে বাগদাদের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। অপরদিকে কুয়েতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে মিসর প্রেরণ করা হয়। তারপর আরব রাষ্ট্রপ্রধানরা পরস্পর শলাপরামর্শে লিপ্ত হন।

মিসরীয় পত্রপত্রিকায় তারেক আজিজের কিছু কিছু বক্তব্যকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয়। ঐ সকল পত্রপত্রিকার মতে তারেক আজিজ তাঁর বক্তব্যে মিসরকে অপমান করেছেন। আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতিক্রিয়া দেখে সাদ্দাম যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে, হিতে বিপরীত না হয়ে যায়! পরিস্থিতি ভিন্নদিকে মোড় না নেয়! কয়েক দিন পর তিনি হোসনী মুবারককে ফোন করে বলেন, আমি তারেক আজিজকে বলেছি সে যেন মিসর গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা পেশ করে। আপনি যদি মনে করে থাকেন, তারেক তার বক্তব্যে মিসরকে অপমান করেছে, তাহলে আমি আপনাকে অধিকার দিলাম আপনি ইচ্ছা করলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাকে জেলে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

আগামী দিন তারেক আজিজ মিসরীয় শহর ইস্কান্দারিয়া পৌঁছে যান। এসময় তার সঙ্গে একটি ব্যাগে কয়েদির পোশাক ছিল। তারেক আজিজ হোসনী মুবারককে বলেন, আপনার দৃষ্টিতে আমি দোষী সাব্যস্ত হলে আমি জেলে যেতে প্রস্তুত। ইত্যবসরে জর্ডানের শাহ হুসাইনও ইস্কান্দারিয়া পৌঁছে যান। তিন নেতা মিলে ইরাক ও কুয়েতের মধ্যেএকটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ব্যাপারে পারস্পরিক মতবিনিময় করেন।

অবশেষে কুয়েতের উপর আক্রমণ

ইতোমধ্যে কুয়েত সরকার ইরাকি বাহিনীর অগ্রযাত্রার সংবাদ পায়। বাগদাদে নিযুক্ত কুয়েতি রাষ্ট্রদূত প্রতিমুহূর্তের সংবাদ কুয়েত পৌঁছাতে থাকেন। এ সময় বাগদাদে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত মিঃ হিরতাক এমিমিউস ইরাকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ্জাত ইব্রাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। সুইডিশ রাষ্ট্রদূতকে ইজ্জত ইব্রাহিম বলেন, ইরাক নীরবে তার ধ্বংস কখনও মেনে নিতে পারে না। এজন্য যদি আমাদেরকে ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষের আত্মাহুতি দিতে হয় তার জন্যও আমরা প্রস্তুত। অবশিষ্ট ১০ লাখ অধিবাসীর জন্য এবং ইরাকের মর্যাদার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগই আমরা গ্রহণ করব।

মার্কিন পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্ট ২০ জুলাই একটি সংবাদ প্রকাশ করে। উক্ত সংবাদে বলা হয় ভিনদেশী জনৈক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা বাগদাদ থেকে কুয়েত অভিমুখী ছয় লাইনবিশিষ্ট সুপার হাইওয়েতে দুই হাজার ফৌজি ট্রাক দক্ষিণ দিকে যেতে দেখেছে। এসব ট্রাক ফৌজি জওয়ান ও অস্ত্রশস্ত্রে ছিল সুসজ্জিত। কুয়েত তার সেনাবাহিনীকে ২০শে জুলাই নির্দেশ দিয়েছিল যুদ্ধের জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকতে; কিন্তু তারপরও তার বিশ্বাস ছিল না ইরাক তার উপর হামলা করে বসবে। কুয়েতের তখনও ধারণা ছিল ইরাক তার চিরাচরিত স্বভাব অনুসারে এবারও কিছুদিন খুব গরম গরম ভাব দেখিয়ে পরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এছাড়া কুয়েতের স্মরণ ছিল ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় আমেরিকা নিঃশর্তভাবে তার পাশে ছিল। এ কারণে ইরাক তার উপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে।

২১শে জুলাই সাদ্দাম হোসেন সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সালকে আশ্বস্ত করেন যে, ইরাকি ফৌজের আনাগোনাকে যেন সন্দেহের চোখে দেখা হয়। এর উদ্দেশ্য কোন দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন মোটেই নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সৌদ আল ফয়সাল প্রফুল্ল মনে ইরাক ত্যাগ করেন। সাদ্দাম হোসেনকে শাহ ফাহাদ ও হোসনী মুবারক ইরাক-কুয়েতের সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে উচ্চপর্যায়ের যে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি তা নির্দ্বিধায় মেনে নেন। পারস্পরিক শলাপরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কুয়েতি যুবরাজ শায়েখ সায়াদ ও ইরাকি ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ্জাত ইব্রাহিম আগস্ট মাসের প্রথম তারিখে জেদ্দায় উভয় দেশের সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করবেন। সৌদি

পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সাদ্দাম বলেন, দক্ষিণাঞ্চলে ইরাকি ফৌজের আনাগোনাকে যেন ভিন্ন দৃষ্টিতে না দেখা হয়।

'ফা' অঞ্চলে ইরাকি সেনাদের ঘাঁটি মজবুত করার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ আট বছর ধরে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে এবং ইবানি সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ায় উক্ত অঞ্চলে এখনও বেশ উত্তেজনা বিদ্যমান; কিন্তু শাহজাদা সৌদ আল ফয়সাল বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারেন, দক্ষিণাঞ্চলে ইরাকি ফৌজের আনাগোনার যে কারণ দর্শানো হয়েছে তা আদৌ ঠিক নয়, শাহ ফাহাদ বিষয়টি হোসনী মুবারককে অবহিত করেন। জনাব হোসনী মুবারক বিষয়টি অবহিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন। এই মুহূর্তে তাঁর করণীয় সম্পর্কে তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না; কিন্তু এ অবস্থায় আর কত সময় থাকা যায়? তিনি রিসিভার উঠিয়ে ফোন করলেন সাদ্দাম হোসেন ও শাহ হুসাইনের কাছে। তারপর তিনি ভাবলেন এই মুহূর্তে তাঁর বাগদাদ যাওয়া উচিত, হতে পারে তিনি এর কোন রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতে পারেন। তিনি তাঁর অভিপ্রায়ের ব্যাপারে শাহ ফাহাদকে অবহিত করলেন। শাহ ফাহাদ তার প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

বাগদাদ পৌঁছে হোসনী মুবারক সাদ্দামের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হলেন। এ বৈঠকে কারো কোন সহযোগী উপস্থিত ছিল না। সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে আলাপচারিতায় হোসনী মুবারক বুঝলেন তার কোন অশুভ অভিপ্রায় নেই। সাদ্দাম যা কিছু করেছেন তা কেবল কুয়েতকে ভয় দেখাবার জন্যই করছেন। সাদ্দামের বক্তব্য ছিল প্রস্তাবিত জেদ্দা বৈঠকের পূর্বে শক্তি প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। এ বৈঠকের ফলে যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় তাহলে আর কোন সমস্যাই বাকি থাকবে না; কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে ইরাক তার স্বার্থ রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর। এ আলাপ আলোচনার পর হোসনী মুবারক নিশ্চিন্তে মিসর প্রত্যাবর্তন করেন। ভাবতে লাগলেন ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে সাদ্দামের ধারণায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন, প্রস্তাবিত জেদ্দা বৈঠকে যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে ইরাকের জন্য শক্তি প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। যেহেতু উভয় নেতার বৈঠকের সময় অন্য আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না তাই নিশ্চিত করে বলা মুশকিল যে, আসল ভুল বোঝাবুঝির সূত্র কোথায়? মিসরীয় রাষ্ট্রপতি জনাব হোসনী মুবারক অতঃপর কুয়েত ও সৌদি আরব গমন করেন এবং রাষ্ট্রনায়কদের অভয়বাণী শুনিয়ে বলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, শক্তি প্রয়োগের কোনই সম্ভাবনা নেই।

তিনি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জবুশ ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারকেও ঠিক একই সংবাদ জানান। ইরাকের ইদানিককালের আচরণ কৌশলগত মৌনযুদ্ধ ছাড়া কিছুই নয়। অনেক আরব পর্যবেক্ষকের মতে ইরাক ভয় দেখিয়ে কুয়েতের কাছ থেকে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিল; কিন্তু মোবারক সাহেব সবাইকে তা জানিয়ে সাদ্দামের আশায় পানি ঢেলে দেন। যুদ্ধের পর সাদ্দামও এ ধরনের বিবৃতি প্রদান করেন, "ধরে নিন আমি হোসনি মোবারককে বলেছিলাম কুয়েতকে আমি ভয় দেখিয়ে আমার উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি একথা কুয়েতিদের অবহিত করতে গেলেন?" পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে, সাদ্দাম তার বন্ধুদেরও ধোঁকা দিয়েছেন এবং তাদের সাথে প্রতারণা করেছেন। অথচ বাস্তবতা হলো এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল যে, সাদ্দাম হোসনী মুবারককে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন নাকি হোসনি মোবরাক নিজেই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিলেন! একথা আজও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

প্রস্তাবিত জেদ্দা বৈঠকের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত আরবদেশগুলো কুয়েতের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, কুয়েত যেন যথাসম্ভব ইরাককে সুবিধাদি প্রদানে সম্মত হয়। তেলের কোটার ব্যাপারে সৌদি আরবও ইরাকের পক্ষ নেয়। কুয়েত ও আরব-আমিরাতের বিরুদ্ধে সৌদিরও অভিযোগ ছিল যে তারা নির্ধারিত তেলের কোটা মেনে চলছে না। কুয়েতকে প্রস্তাব দেয়া হয়, দেশটি যেন 'আরবা' এবং 'বুবিয়ান' নামক দু'টি দ্বীপ দীর্ঘ সময়ের জন্য ইরাককে লীজ দেয়। ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলাকানীন কুয়েত কর্তৃক ইরাকের 'রমলা ওয়েল ফিল্ড' দখল করাকে অনেক আরব দেশ সুনজরে দেখেনি। শাহ হুসাইনের মতে অবস্থা ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে মোড় নিচ্ছে। কালক্ষেপন না করে তিনি কুয়েত রওয়ানা হন এবং শায়খ জাবেরকে শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ভাবতে বলেন। উল্লেখিত দ্বীপ দু'টি দীর্ঘদিনের জন্য ইরাককে লীজ দেওয়ার ব্যাপারে সৌদি মিসরিয়কে প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করেন। উত্তরে শায়েখ জাবের বলেন, এই সম্পদ কুয়েতের, ইরাকের হাতে হস্তান্তর করার অধিকার আমার নেই। কুয়েতের এক সেন্টিমিটার জমিও আমি অন্য দেশের হাতে তুলে দিতে পারব না। শাহ হুসেইন বলেন, আমি কুয়েতি সংবিধান সম্পর্কে অবহিত। আমি জানতে চাই কুয়েতের কোন অঞ্চল বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে পবিত্র? অথচ ২৫ বছর ধরে পবিত্র এই ভূমি ইসরায়েলের দখলে।

জুলাই ১৯৯০ এর শেষ দিনগুলোতে আরবদের ধারণা ছিল সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধান অবশ্যই খুঁজে বের করা সম্ভব হবে কিন্তু তা আদৌ হয়ে ওঠেনি এটা লজ্জাজনক বিষয়। কুয়েতিরা সামান্যতম সুবিধাও ইরাককে দিতে প্রস্তুত ছিল না। শাহ ফাহাদের একটি চিঠি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কুয়েত দখলের পর ইরাকিরা সরকারি ভবন থেকে এই চিঠি উদ্ধার করেছিল। শাহ ফাহাদ লেখেন, ১ আগস্টের প্রস্তাবিত জেদ্দা বৈঠক যেন শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তিতে আগ্রহী আচরণের আশ্রয় নেয়া হয়। শায়খ জাবের এই চিঠির ওপর একটি নোট লিখতে যুবরাজ সায়াদকে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যুবরাজ আমাদের কুয়েতি বৈঠকে দেশটির প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কুয়েতি নেতা শাহ ফাহাদের চিঠির ওপর যে নোট লেখেন 'আমরা আমাদের পূর্ব স্তিান্ত মোতাবেক এ বৈঠকে অংশগ্রহণ করব।" তুমি ইরাক ও সৌদিদের পক্ষ থেকে আরব ভাতৃত্ব ও ঐক্যের ব্যাপারে যে কথাই শোন না কেন তাতে কান দেবে না। আমাদের প্রত্যেকের সামনে রয়েছে পারস্পারিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়। সৌদিরা চায়, আমরা যেন দুর্বল হয়ে পড়ি, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে স্বার্থ হাসিল করতে পারে। ইরাকিরা আমাদের অর্থ ও সম্পদের মাধ্যমে যুদ্ধোত্তর ক্ষতিপূরণের আশা করছে। যা বলেছি এর অন্যথা যেন না হয়। মিসর, লন্ডন এবং ওয়াশিংটনের বন্ধুদের পরামর্শও এটিই। নিজেদের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবে। আমরা ওদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। বিজয় আমাদেরই! ইতি জাবের!

অপরদিকে ইরাকি রাষ্ট্রপতি ইজ্জাত ইবরাহিমকে একইভাবে কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলেন, কুয়েতি যুবরাজ যদি সীমান্ত নির্ধারণ সমস্যা নিষ্পত্তির ব্যাপারে সহযোগিতার হাত প্রশস্ত না করে তাহলে তাকে জানিয়ে দিবেন যে, ইরাকের কাছে কুয়েতের ঐ সময়ের ছবি আছে যখন কুয়েত ছিল দুর্গ প্রাচীরের পিছনে ছোট্ট একটি শহর। ইরাক ইচ্ছা করলে তখন ঐ প্রাচীরকেই কুয়েতের শেষ সীমান্ত হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারত। ঐ প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজও যথাস্থানে বিদ্যমান।

আমেরিকাসহ আরব দেশগুলি ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের কয়েকমাস পূর্ব পর্যন্ত কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে তাদের কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল। কুয়েতের ধারণা ছিল, ইরাক তাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় যুদ্ধের আশংকা বিপদসীমার কাছাকাছি পৌছে যায়। শাহ ফাহাদ ও শাহ হুসাইন নিশ্চিন্ত ছিলেন, ইরাক তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল সমস্যা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে

সমাধান করতে ব্রতী হবে। হোসনী মুবারকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সাদ্দাম হোসেন যা কিছু করছে, তা কেবল কুয়েতকে ভয় দেখাবার জন্যই করছে। আর সাদ্দাম মনে করছিলেন কুয়েতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমেরিকার জন্য এতটা সহজ নয় যতটা কুয়েতিরা মনে করে। ওদিকে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টও কল্পনা করেনি ইরাক কুয়েতকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলবে। তাদের ধারণা ছিল ইরাক হয়ত ছোটখাটো কোন হামলা করে বসবে। অথবা বেশির বেশি আরবা এবং বুবিয়ান দ্বীপ দু'টি দখল করে বসতে পারে বলে তাদের একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। হতে পারে ইরাকেরও সে ধরনের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার মত পাল্টে যায়।

কুয়েতের উপর আক্রমণের আটদিন পূর্বে বাগদাদে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত এরিলগ্লাসপী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতও কোন ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি; বরং উভয়ের এই মুলাকাত পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্র আরও ত্বরান্বিত করে এরিলগ্লাসপী সাদ্দামের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে মারাত্মক ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তার এই ব্যর্থতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে দুটি প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমটি হলো গ্লাসপী যেদিন ইরাকি নেতার সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন সেদিনই ইরাকের বসরা শহরে নিযুক্ত কুয়েতি সামরিক এটাচী তার সরকারকে জানান, আগস্টের দ্বিতীয় তারিখে ইরাক কুয়েতের উপর আক্রমণ চালাতে পারে। তিনি বলেন ইরাকের রিপাবলিকান গার্ডে আমাদের গোয়েন্দারা আমাকে এ সংবাদ প্রদান করেছে, এরিলগ্লাসপী যদি তার সরকারকে এ বিষয় অবহিত করতেন তাহলে অবশ্যই আমেরিকা কুয়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করত। ফলে, কুয়েত সরকারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত; কিন্তু যেহেতু সামরিক এটাচী ছাড়া অন্য কেউ কুয়েতকে এ সংবাদ দেয়নি তাই কুয়েত সরকারও এ সংবাদটির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি। অপরদিকে কুয়েত সরকার তখন জেদ্দা বৈঠকে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। সঠিক সংবাদ না পাওয়ার কারণে কুয়েত সরকার ভ্রান্ত। স্ট্রাটেজির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, কুয়েতি যুবরাজ শায়েখ সায়াদকে নির্দেশ দেয়া হয় জেদ্দা বৈঠকে সে যেন গড়িমসির আশ্রয় নিয়ে বিষয়টি আগামী বৈঠক পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

মোটকথা পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে হয়ে যায় যে, সব কিছু দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি সরকার নির্ভুল পলিসি গ্রহণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১ আগষ্ট কুয়েতি যুবরাজ সায়াদ ও ইরাকি ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ্জাত

ইব্রাহীম উভয় দেশের বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলি সমাধানের লক্ষ্যে জেদ্দায় একত্রিত হন। এই দুই নেতার আলাপ-আলোচনার সময় কোন সৌদি নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

ইরাকি ও কুয়েতি নেতাদের সাক্ষাৎ এবং বৈঠকের ব্যাপারে শাহ ফাহাদ বলেন, আমরা এক সাথেই নৈশভোজে শরিক হই; কিন্তু আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করিনি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার পর কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো? আমার ধারণায় পারস্পরিক আলোচনা তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত; কিন্তু তারপরও আমি সাধারণভাবে তাঁদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানতে চাইলে উত্তরে তাঁদের মুখ থেকে মুচকি হাসি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। প্রতিউত্তরে আমি তাদেরকে বলি আপনাদের প্রফুল্ল দেখে আমি নিজেই খুব খুশী অনুভব করছি। রাতের ডিনার শেষে কুয়েতও ইরাকি নেতার দ্বিতীয় দফা বৈঠকে মিলিত হওয়ার কথা। এ বৈঠকটি মাত্র এক ঘণ্টা সময় স্থায়ী হয়। তারপর হঠাৎ করে ইজ্জাত ইব্রাহীম শাহ ফাহাদকে ফোন করে জানান আমাদের পারস্পরিক আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা উভয় এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, আমাদের আগামী আলোচনা বাগদাদে অনুষ্ঠিত হবে। ইজ্জাত ইব্রাহিমের কথায় শাহ ফাহাদ মোটেই আশ্চর্য হননি। কারণ, ইরাকের শুরু থেকেই আবদার ছিল ইরাক-কুয়েত আলোচনাটি বাগদাদে অনুষ্ঠিত হোক।

ইরাকিদের এ আবদারের সঙ্গে শাহ ফাহাদ কখনো একমত হননি। শাহ ফাহাদের যুক্তি ছিল, কুয়েতি যুবরাজ যদি আলোচনার উদ্দেশ্যে বাগদাদ গমন করেন তাহলে সবাই মনে করবে তিনি সারেন্ডার হওয়ার জন্য ইরাক যাচ্ছেন। ইরাকিরা শাহ ফাহাদের এ যুক্তি মেনে নেয়। মোটকথা জেদ্দা বৈঠকের ফলশ্রুতিতে শাহ ফাহাদ নিশ্চিত ছিলেন যে, আগামী বৈঠক বাগদাদে হলে অসুবিধার কোন কারণ নেই। জেদ্দা বৈঠক শেষে ইজ্জাত ইব্রাহিম স্থানীয় সময় রাত ১১ টায় বাগদাদের উদ্দেশ্যে জেদ্দা ত্যাগ করেন। এর পরপরই কুয়েতি যুবরাজও স্বদেশের উদ্দেশ্যে জেদ্দা ত্যাগ করেন। প্রশ্ন দাঁড়ায় উভয় নেতার আলাপ-আলোচনায় কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়? এ প্রশ্নের আজ পর্যন্ত কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সৌদিরা বলেন, এ ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না আর ইরাকিদের বক্তব্য হলো, কুয়েতিরা এই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করতে রাজি নয়। তবে তারা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আগামী বৈঠকে এ বিষয় চিন্তা-ভাবনা করা হবে; কিন্তু ইরাকের ধৈর্যের মাত্রা তখন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এভাবে বছরের পর বছর কোন

সমস্যাকে জিইয়ে রাখা সম্ভব নয়। এক হাজার কোটি ডলার ঋণের ইরাকি আবেদনের প্রতিও কুয়েতি যুবরাজ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সীমান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারেও কুয়েতি যুবরাজ তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। অপরদিকে কুয়েত জানিয়েছে কোন গঠনমূলক আলোচনার জন্য ইরাকি নেতা ইজ্জাত ইব্রাহিম মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। আলোচনার টেবিলে বারবার তিনি তাঁর সরকারের পুরাতন কথাগুলি আওড়াচ্ছিলেন।

ইরাকি ও কুয়েতি নেতার জেদ্দা আলোচনার সাকুল্যে সময়ছিল মাত্র আড়াই ঘণ্টা। দুপুরে দেড় ঘণ্টা আর ১ ঘণ্টা নৈশভোজের পর। তবে এ অবস্থা কুয়েতের জন্য মোটেই শিরপীড়ার কারণ ছিল না, কারণ কুয়েতও চাচ্ছিল পারস্পরিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য আগামীতে আর একটি বৈঠকের ব্যাপারে ইরাকিরা সম্মতি প্রকাশ করুক। জেদ্দা বৈঠক শেষে যুবরাজ সায়াদকে খুবই আস্থাশীল মনে হচ্ছিল। তিনি ইজ্জাত ইব্রাহিমকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আমাদেরকে ভয় দেখানোর প্রবণতা পরিত্যাগ করুন। আপনাদের জানা উচিত কুয়েতের বন্ধুরা খুবই শক্তিশালী।

উল্লেখ্য, ইজ্জাত ইব্রাহিম যখন জেদ্দা থেকে বাগদাদের উদ্দেশে রওনা হন তার আগেই ইরাকি বাহিনী কুয়েতের উপর আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব চুকিয়ে ফেলে। যুবরাজ সায়াদ যদি ইরাককে কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধাদানে সম্মত হতেন তাহলে হয়ত তাৎক্ষণিকভাবে হামলা মুলতবী করে দেয়া সম্ভব হতো। শুরুতে ইরাকের ইচ্ছা ছিল না পুরো কুয়েত দখল করা। তার ইচ্ছা ছিল আরবা, বুবিয়ান দ্বীপ ও কুয়েতের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়া ও কুয়েতি অয়েল ফিল্ডগুলো দখল করা; কিন্তু মাত্র দু'দিন পূর্বে ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের এক বৈঠকে সাদ্দাম হোসেন তার মতামত ব্যক্ত করে বলেন, অপারেশন যদি সংক্ষিপ্ত রাখা হয় তাহলে কুয়েতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সাবাহ পরিবারই অধিষ্ঠিত থাকবে। এমতাবস্থায় আমেরিকা কুয়েতকে ইরাকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করবে। অতএব পুরো কুয়েত দখল করাটাই অধিক সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয় যে আক্রমণ এত দ্রুত হতে হবে যে, কুয়েত যেন আমেরিকার কাছে কোন প্রকার সাহায্য চাওয়ার সুযোগ না পায়। ইরাকের ধারণা ছিল সে যদি একবার কুয়েত দখল করে বসে তাহলে অন্যান্য আরবদেশ আমেরিকার কাছে কোন সাহায্য চাইবে না। কারণ, তারা যদি

আমেরিকার কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকাকে ঘাটি তৈরির সুযোগ দেওয়ার অপবাদ দেওয়া হবে।

কুয়েতের উপর আক্রমণের পূর্বে ইরাকের সেনা প্রস্তুতিকে মার্কিনীরা খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে মনিটর করছিল। তবে তারা এই প্রস্তুতিকে কোন বাস্তব আশংকার কারণ মনে করেনি। স্টেট ডিপার্টমেন্টেরও ধারণা ছিল ইরাক নিছক কুয়েতকে ভয় দেখাবার জন্যই এসব করছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমেরিকানদের কাছে যেসব তথ্য পৌঁছাচ্ছিল তার আলোকেও ইরাকি বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত মনে করার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। ৩০ জুলাই পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান থাকে। তারপর ১ আগষ্ট থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে শতশত ইরাকি ট্যাংক কুয়েত সীমান্তে মোতায়েন দেখা যায়। এসব ট্যাংকের পারস্পরিক মধ্যবর্তী দূরত্ব ছিল মাত্র ৩০ থেকে ৭৫ মিটার। এসব ট্যাংক ছিল তোপ দ্বারা সুসজ্জিত। এমন বাস্তবতা সত্ত্বেও মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডিকচ্যানী এসব আয়োজনকে নিছক প্রতারণা মনে করেন। তবে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর ধারণা ছিল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভুল। তাদের মতে আজ রাত অথবা আগামীকাল রাতে ইরাক কুয়েতের উপর আক্রমণ করে বসবে। সিআইএ-এর যে ইউনিটটি সাবাহ পরিবারের হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তারা সার্বক্ষণিকভাবে কুয়েতের স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল।

১৯৮৪ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধের আশঙ্কা করা হচ্ছিল ইরাকের বসরা শহর ইরানের দখলে চলে যাবে সেই সঙ্গে ইরান কুয়েতও দখল করে বসবে। এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে সাবাহ পরিবার অবশ্যই বিপাকে পড়ত। এ ধরনের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে কুয়েত ও মার্কিন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ মিলে সাবাহ পরিবারকে হঠাৎ করে অন্যদেশে স্থানান্তরিত করার একটি প্রোগ্রাম হাতে নেয়।

১৯৯০ সালে আমেরিকান সিআইএ-এর প্রধান কুয়েতি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ক্ষমতাসীন রাজপরিবারের হেফাজত প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পায়। ফলে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি গ্রুপ তৈরী করা হয়। তাদের দায়িত্ব ছিল ১৯৮৪ সালের প্লানকে নতুনভাবে সংশোধন করা। উক্ত গ্রুপটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ১লা আগষ্ট ১৯৯০ আরও দুইজন মার্কিন কর্মকর্তা কুছে এসে উপস্থিত হয়। ঐদিন সকালে গ্রুপটির পক্ষ থেকে কুয়েতি স্বররাষ্ট্রমন্ত্রী শায়েখ সালেম আস সাবাহ-এর কাছে একটি

গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম পৌঁছান হয়। তাতে বলা হয় "অকারণে আমরা আপনাকে ডিসটার্ব করতে চাই না। আমাদের মনে হয় প্রস্তাবিত প্লানকে বাস্তবে রূপদান করার এখনই সময়।" এ পয়গামটি হস্তগত হওয়ার পর তড়িঘড়ি করে রাজপরিবারের কে কোথায় আছে তাদের একটা লিস্ট তৈরী করে ফেলা হয়। স্মরণ রাখতে হবে এদিনটি ছিল বুধবার। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রাজপরিবার তখন উইকএন্ড-এর প্রস্তুতিতে ছিল ব্যস্ত।। ঐ বিশেষ গ্রুপটি দ্বিপ্রহরে কুয়েতি প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে পরামর্শ দেয় যে, শায়েখ জাবেরকে এই মুহূর্তে সৌদি সীমান্তের নিকট দক্ষিণ কুয়েতের কোন রেস্ট হাউসে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাজপরিবারের যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে তাদের প্রত্যেককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা যেন দুই ঘণ্টার মধ্যে কুয়েত শহর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। মধ্যরাতে সংবাদ দেয়া হয় কুয়োত নেতার জন্য আর কুয়েতে থাকা ঠিক হবে না। তিনি যেন ফুয়েত সীমান্ত পার হয়ে সৌদি আরবের খাফজী শহরে আশ্রয় নেন। উল্লেখ্য, এ সময় শায়েখ জাবের কুয়েতের বার' নামক বিনোদন এলাকায় অবস্থান করছিলেন। সৌদি সীমান্ত থেকে খাফজী শহর ২০ মাইল অভ্যন্তরে । এমতাবস্থায় রাজপরিবার খুব সাধারণভাবে কুয়েত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এ সময় তাদের সফরে মোটর শোভাযাত্রা অথবা চোখ ধাঁধান আলোর ঝলকানী মোটেও পরিলক্ষিত হয়নি। যুবরাজ শায়েখ সায়াদ অর্ধেক রাতের পর জেদ্দা থেকে কুয়েত পৌঁছে ছিলেন। এয়ারপোর্টে তাকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সেখান থেকে তাকে জানান হয় যে, ইরাকি সেনারা কুয়েতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়, তিনি যেন এই মুহূর্তে কুয়েত ত্যাগ করেন। কারণ, ততক্ষণে কুয়েতের আকাশ ইরাকি হেলিকপ্টারে ছেয়ে গেছে।

যুবরাজ সায়াদ মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলেন, কুয়েতের যে নাজুক সময়ের জন্য শক্তিশালী বন্ধুদের প্রয়োজন ছিল সে সময় এসে পড়েছে। রাষ্ট্রদূত প্রশ্ন করেন, সামরিক সাহায্যের জন্য এটাকে কি সরকারি আবেদন হিসাবে ধরে নেওয়া যায়? উত্তরে শায়েখ সায়াদ বলেন, জি হ্যা! এটাকে আপনি সরকারি আবেদন ধরে নিতে পারেন। কুয়েতি যুবরাজ যখন দক্ষিণ সীমান্তের দিকে রওনা হয়ে চলেছিলেন তখন তার হঠাৎ করে মনে পড়ে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে সরকারি সত্যায়ন প্রয়োজন, তাই তিনি কালবিলম্ব না করে শায়েখ জাবেরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। শায়েখ জাবের ততক্ষণে সৌদি আরবের

খাফজী শহর পৌছে গেছেন। তারপর যুবরাজ সায়াদ মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ফোন করে বলেন, কুয়েতের আমির শায়েখ জাবের ও কুয়েত সরকারের পক্ষ থেকে আমি সরকারিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন করছি সে যেন কুয়েতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। আপনাদের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে।

আমরা আমেরিকার বন্ধুত্ব আর প্রেসিডেন্ট বুশের ওয়াদার উপরও পুরাপুরি আস্থাশীল।

রাজপরিবারের ২৫ জন বিশিষ্ট সদস্য স্ত্রী-পুত্রসহ নিরাপদে দেশত্যাগ করতে সমর্থ হন। কেবলমাত্র একজন সদস্য ইরাকি আগ্রাসনের সময় নিহত হলেন। কুয়েত অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট শায়েখ ফাহাদ আল আহমাদ আস্ সাবাহ- হামলার পূর্বে তার সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কারণ, তিনি তখন কুয়েত শহরে ছিলেন না। গভীর রাতে তিনি যখন তাঁর প্রাসাদে ফিরে আসেন তখন তার প্রাসাদটি ইরাকি ফৌজের নিয়ন্ত্রণে দেখতে পেয়ে পকেট থেকে রিভলবার বের করে আত্মহত্যা করেন।

সূর্যোদয়ের পূর্বে ইরাক কুয়েত দখল করে বসে। তবে কুয়েতের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে ইরাক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

কিছু সংখ্যক ইরাকি প্লানারের অভিমত ছিল কুয়েতের উপর আক্রমণের পূর্বে গেরিলা যুদ্ধের সাহায্যে রাজপরিবারকে হত্যা করা উচিত ফলে, কুয়েতিরা আমেরিকার কাছে সাহায্য চাওয়ার সুযোগ পাবেন; কিন্তু আগ্রাসনের পর ইরাক সাবাহ পরিবারকে আমেরিকার কাছে সাহায্য প্রার্থনা থেকে বিরত রাখতে যেহেতু সমর্থ হয়নি তাই কুয়েত দখল করার পর কুয়েতকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এমনটিও কি সম্ভব?

টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ কখনও শাহ ফাহাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে সক্ষম হয়নি; কিন্তু আগষ্টের ২ তারিখ ভোর পাঁচটা বরাবর টেলিফোন বেজেই চলেছে, অবশেষে শাহ ফাহাদকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হলো। কি? ইরাক কুয়েত দখল করে বসেছে? না, হতেই পারে না অসম্ভব! এটা কখনই হতে পারে না। শাহ ফাহাদ বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না ইরাক কুয়েত দখল করে বসতে পারে। এই মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি ইরাকি ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ্জাত ইব্রাহিমকে বিদায় জানিয়ে এলেন। তৎক্ষণাৎ শাহ ফাহাদ তার এক সহযোগীকে কুয়েতে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। তাঁর কাছ থেকেই এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া সম্ভব।

সৌদি রাষ্ট্রদূতের কাছে জানতে চাওয়া হলো। ইরাকের উদ্দেশ্য কী? দু'টি দ্বীপ দখল করা? না অন্য কিছু? এ প্রশ্নের তিনি কোন সঠিক উত্তর দিতে পারলেন না। কারণ, তিনিও তখন পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু জানতেন না। তবে তিনি জানতেন কেবল দু'টি দ্বীপ দখল করাই ইরাকের অভিপ্রায় নয়, তারা এর চেয়েও বেশি কিছু আশা করে। পরে শাহ ফাহাদ কোন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এ ঘটনা আমার পুরো অস্তিত্বকে প্রকম্পিত করে ছেড়েছে। আমি কখনও কল্পনা করিনি এমন ঘটনাও ঘটা সম্ভব। তারপর শাহ ফাহাদ তার সহযোগীকে সাদ্দামের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। এসময় শাহ এতই বিচলতি ছিলেন যে, তার অপারেটর ফোন চালু করার পূর্বে তিনি রিসিভার উঠিয়ে নেন। অপরদিকে লাইনে ছিল সাদ্দামের জনৈক সহকারী। সে শাহ ফাহাদকে লাইনে পেয়ে যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হলো। সাদ্দামের সহযোগী জানান তিনি বর্তমানে এখানে উপস্থিত নেই। তবে তিনি সাদ্দাম যখনই আসবেন তখনই তার সঙ্গে শাহের কথা বলার ব্যবস্থা করে দেবেন। শাহ ফাহাদের মত শাহ হোসাইনও নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলেন। শাহ ফাহাদের ফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে তিনি জেগে উঠলেন। ফাহাদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি কিছু শুনেছ? শাহ হোসাইন জিজ্ঞাসা করলেন কোন ব্যাপারে? কেন ইরাকের কুয়েত আক্রমণের ব্যাপারে? কই না আমি কিছুই শুনিনি। ইরাক যে কুয়েতের উপর আক্রমণ করে বসেছে সে সংবাদ কি তুমি পাওনি? হোসাইন শোন! আমি ব্রাদার সাদ্দামের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ হয়ত সফল হতে পার। দু'আ করো এ আক্রমণ যেন ইরাকের সীমিত স্বার্থ উদ্ধারের আক্রমণ হয়।

আর আমরা যে এর কোন একটা সুরাহা করতে পারি। উত্তরে শাহ হোসাইন বলেন, আমি কিছু সময়পর আপনাকে ফোন করবো। এরপর তিনি বাগদাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। হঠাৎ করে আবার শাহ হোসাইনের ফোন বেজে উঠল। শাহ ফাহাদ বললেন হোসাইন শোন! আমি সংবাদ পেয়েছি ইরাকি সেনারা পুরো কুয়েত দখল করে ফেলেছে। শায়েখ জাবেরের শাহিমহল এখন ইরাকি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। এই আলাপ আলোচনার পরপরই শাহ হোসাইন বাগদাদে তারেক আজিজের সাথে।

যোগাযোগ স্থাপনে কামিয়াব হন। এসময় তারেক আজিজ ছিলেন সাদ্দামের রাজকীয়প্রাসাদে। তাঁকে কুয়েত হামলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি দায়সারা গোছের হু, হাঁ, মূলক উত্তর দিয়ে ফোন রেখে দিলেন। সময়ের হিসাবে মিসর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তুলনায় এক ঘণ্টা পিছনে। অর্থাৎ মিসরে তখন রাত চারটা। কুয়েতে নিযুক্ত মিসরীয় রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারকের ইনফরমেশন সেক্রেটারিয়েটের প্রধান ডক্টর মুস্তফা আল ফাইকীকে জানান, ইরাক বাহিনী কুয়েতের রমলা অয়েলফিল্ড দখল করে কুয়েত সিটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখনও পর্যন্ত বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি যে, ইরাকি বাহিনীর আসল লক্ষ্যবস্তু কী? তাই ডক্টর মুস্তফা প্রেসিডেন্ট মুবারককে এ সংবাদটি অবহিত করতে একটু দেরি করছিলেন।

আধাঘণ্টা পর জনাব মুবারকের ফোন ক্রিং ক্রিং করে আবার বেজে উঠল। এবার ফোন করলেন কায়রোয় নিযুক্ত কুয়েতি রাষ্ট্রদূত জনাব আব্দুর রাজ্জাক আল কিনদারী। বিনয়ের সুরে তিনি বললেন, প্লীজ! প্রেসিডেন্ট মুবারককে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিন। মুবারক ফোন রিসিভ করলেন। জনাব কিনদারী বললেন, ইরাকি বাহিনী কুয়েত সিটিতে প্রবেশ করেছে। জনাব মুবারকের জন্য এটা ছিল অবিশ্বাস্য খবর। কিংবকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি অনেক কষ্টে ভাব বিহ্বলতা কাটিয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন কী বলতে চাও তুমি? কুয়েত সীমান্তে যুদ্ধ চলছে? না স্যার! সীমান্ত নয় ইরাকি সেনারা কুয়েতের আমির শায়েখ জাবের, যুবরাজ শায়েখ সায়াদের প্রাসাদসহ পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দখল করে ফেলেছে। কিনদারী আরও জানান, বাগদাদে নিযুক্ত কুয়েতি রাষ্ট্রদূত ইব্রাহিম আল বাহুকে তাঁর দেহরক্ষীদের পক্ষ থেকে এ সংবাদ জানান হয়েছে যে, ইরাকি বাহিনী দূতাবাস ভবনটি ঘিরে ফেলেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ জারি করেন, দূতাবাস ভবনের সকল রেকর্ড যেন এই মুহূর্তে জ্বালিয়ে ফেলা হয়। তারপর তিনি প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে লাগলেন। দেখা যাক কী হয়! কিছুটা বেলা হলে

ইরাকি কর্মকর্তারা এসে দূতাবাসের সমস্ত গাড়ী সঙ্গে করে নিয়ে গেল। রাষ্ট্রদূত ভাবলেন, দূতাবাস ভবনের সব গাড়ী মনে হয় দখল করে নেওয়া হলো; কিন্তু না! অবিশ্বাস্য হলেও সত্য পরের দিন সকালে গাড়ীগুলো সব আবার ফেরত দিয়ে দেওয়া হলো। তবে একটু পরিবর্তনের সাথে। তা হচ্ছে, আগে ওসব গাড়ীতে কুয়েতী নম্বর প্লেট লাগান ছিল আর এখন সেখানে শোভা পাচ্ছে ইরাকি নম্বর প্লেট। এভাবে ইরাকিরা হয়ত তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ রাখতে চেয়েছিলেন যে, কুয়েত ইরাকের ১৯তম প্রদেশ।

আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সময়ে ৯ ঘণ্টার ব্যবধান। তাই আমেরিকানদের আর কষ্ট করে ঘুম থেকে জাগতে হয়নি। তারা আগের থেকে জেগেই ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিঃ ডিকচেনী রাত ন'টায় সংবাদ পেলেন। ইরাকি বাহিনী কুয়েতের উপর আক্রমণ করে বসেছে। কালবিলম্ব না করে তিনি এ সংবাদ প্রেসিডেন্ট বুশকে জানালেন। আড়াইঘণ্টা পর হোয়াইট হাউস থেকে একটি বিবৃতি প্রদান করা হলো। উক্ত বিবৃতিতে এ ঘটনার নিন্দা করে বলা হয়, ইরাকি বাহিনী যেন অনতিবিলম্বে কুয়েত ছেড়ে তাদের পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায়। তারপর যুক্তরাষ্ট্রে ইরাক ও কুয়েতের সকল সম্পদ আটক করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কুয়েতের উপর ইরাকি আগ্রাসনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল আশাই পূর্ণ হয়। ইরাককে একবার উচিত শিক্ষা দিতে পারলে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সাপ্লাই নিয়ে পশ্চিমাদের যে শিরপীড়া রয়েছে তা দীর্ঘ দিনের জন্য তিরোহিত হয়। অপরদিকে ইসরায়েলও দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়। উদ্দেশ্য হাসিলের পথে মার্কিনীদের নতুন বন্ধু রাশিয়াও যথেষ্ট সহযোগির ভূমিকা পালন করতে পারে। ইরাকি হামলার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে প্রেসিডেন্ট বুশ ও প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মার্কিন সাহায্য ব্যতীত রাশিয়ান অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা যাচাই করার প্রয়োজন ছিল যে, আমেরিকার স্বার্থ রক্ষায় রাশিয়া কতটা সেক্রিফাইস করতে প্রস্তুত।

২রা আগষ্ট ১৯৯০ সকাল ৮টার সময় সাদ্দাম হোসেন দূরালাপনির সাহায্যে শাহ ফাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বললেন, আমি আমার একজন বিশেষ দূতকে আপনার কাছে পাঠিয়েছি, সে-ই আপনাকে বর্তমান পরিস্থিতির। বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিবে। এই বিশেষ দূতটি ছিলেন ইরাকের উপ-প্রধানমন্ত্রী। জেদ্দা এয়ারপোর্টে পৌছানোর সঙ্গেসঙ্গে তাঁকে শাহ ফাহাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। শাহ ফাহাদের প্রশ্নে ইরাকি দূত বলেন, কোন বিশেষ

ঘটনা ঘটেনি। কুয়েত ছিল ইরাকের অংশ। সে তার অংশ ফেরত পেয়ে গেছে। একথা শুনে শাহ ফাহাদ তেলে বেগুনে জ্বলে ঠেন।

তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, এটা এ ধরনের ফালতু কথাবার্তার জায়গা নয়। বিষয়টি যদি এতই সহজ হয়ে থাকে তাহলে গতকাল ও তার আগে আমরা কি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম? সৌদি নেতা পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দেন ইরাক নিজেও আক্রমণের পূর্বে কুয়েতি নেতাদের একটি মর্যাদাশীল দেশের প্রতিনিধিদের মর্যাদা প্রদান করে।

ইরাকি দূতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর সৌদি নেতার বুঝতে বাকি রইল না আসল গোলটা বেঁধেছে কোথায়; কিন্তু তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন। মধ্যপ্রাচ্যের সময় অনুযায়ী আনুমানিক বেলা ১১ টায় আমেরিকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বন্দর শাহ ফাহাদকে ফোন করে জানতে চাইলেন বর্তমান অবস্থায় আমার করণীয় কী? উত্তরে সৌদি নেতা তাঁকে জানালেন অন্যান্য আরব নেতাদের বিবৃতি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। শাহ ফাহাদের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রিন্স বন্দর বলেন, পশ্চিমারা আমাদের সঙ্গে আছে, কোন অবস্থাতেই তারা পিছে হটবে না। প্রিন্স বন্দর জানতে চান এমন কোন ম্যাসেজ আছে কি, যা তিনি মার্কিন বন্ধুদেরকে অবহিত করতে পারেন? উত্তরে শাহ ফাহাদ বলেন, আরবলীগ। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের ফলাফলের অপেক্ষা করুন। উল্লেখ্য, ইরাকি হামলার পর কায়রোয় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন আহ্বান করা হয়।

ইরাকি আগ্রাসনের কারণে শায়েখ জাবের মারাত্মক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। কুয়েত ত্যাগের পর কিছু সময় সৌদি আরবের খাফজী শহরে অবস্থানের পর তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে শাহ ফাহাদের সঙ্গে ফোনে আলাপের সময় তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ইরাকি আক্রমণকে কাফেরদের আক্রমণ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। বারবার তিনি সৌদি নেতার কাছে একটি দাবিই করছিলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই ইরাকিদের কুয়েত থেকে বের করে দেয়া হোক। তার ধারণায় সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও যদি ইরাকিরা কুয়েতে অবস্থান করতে থাকে তাহলে তাদের কখনও সেখান থেকে বের করা সম্ভভ হবে না। সৌদি নেতা তাকে বিভিন্নভাবে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। শাহ ফাহাদ সৌদি যুবরাজ শায়েখ আব্দুল্লাহকে নির্দেশ দিয়ে বলেন অনতিবিলম্বে একটি প্লেন পাঠিয়ে শায়েখ জাবের ও তাঁর পরিবারবর্গকে তায়েফে আনার ব্যবস্থা করা হোক।

প্রিন্স বন্দর আবারও শাহ ফাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমেরিকান কর্মকর্তাদের সঙ্গেতার যে কথাবার্তা হয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত করলেন। আমেরিকানরা প্রিন্সকে ইরাকের একটি আর্মাড ইউনিটকে নিউট্রাল জোনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে সামরিক সাহায্যের ব্যাপারে কুয়েতের আপিলের কথাও উল্লেখ করেন। প্রিন্সের খেয়াল ছিল সৌদি আরব যদি এ ধরনের কোন আবেদন করতে চায় তাহলে তার জন্য এটাই উত্তম সময়। প্রিন্স শাহকে আরও জানান, যদিও মার্কিনীরা ইরাকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে সৌদি ভূমি ব্যবহার করার জন্য তার কাছে সামরিক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় রীতিমত কোন দরখাস্ত দেয়নি; কিন্তু তারপরও আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ জানতে চেয়েছে এ ব্যাপারে সৌদি আরব তাদেরকে কতটুকু সগযোগিতা করতে আগ্রহী? উল্লেখ্য, এই পরিষদেরই দায়িত্ব ছিল ইরাকের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যায় সে ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বুশকে একটি বিস্তারিত খসড়াপ্রদান করা। শাহ ফাহাদ তাৎক্ষণিকভাবে প্রিন্সের প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। তিনি তখনও অপেক্ষা কর আর দেখতে থাক- এই নীতির উপর ছিলেন অবিচল।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সাল সেদিন আবার শাহ ফাহাদকে ফোন করে জানতে চাইলেন আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে সৌদি আরব কী মূলনীতি গ্রহণ করবে? উত্তরে শাহ বলেন, আমাদের সকল ভাইদের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, পরিস্থিতি খুবই ঘোলাটে এবং জাহান্নামের দরজা খোলার সময় উপস্থিত। শাহ তাঁকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন মিসর ও আরব বাদশাহদের সঙ্গে রীতিমত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। সৌদ আল ফয়সাল বলেন, পরিস্থিতি খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, অতএব আমাদেরও খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উত্তরে শাহ বলেন, রাস্তা কাঁটায় পরিপূর্ণ তাই আমাদেরকে খুব হিসাব করে পা ফেলতে হবে, তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই। কুয়েতের উপর ইরাকি আগ্রাসনের কারণে আরব দুনিয়ায় যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল। ফলে, আরব দুনিয়ার প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও সরকার দারুণভাবে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সৌদি ইন্টেলিজেন্সের ডাইরেক্টর শাহজাদা তুর্কীবিন ফয়সাল আমেরিকায় সৌদি রাষ্ট্রদূত ও তার ব্রাদার ইন-ল, প্রিন্স বন্দরের কাছে মার্কিনীদের প্রতিক্রিয়া জানতে চান। প্রিন্স তাকে ঐ উত্তরই দেন যা তিনি শাহ ফাহাদকে দিয়েছিলেন। প্রিন্সের ধারণা ইরাকি আগ্রাসন কেবলমাত্র কুয়েত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং তা আরও সম্প্রসারিত হবে। তিনি বলেন, ইরাক নাস্তা হিসাবে কুয়েত দখল করেছে সে অপরাহ্ন ভোজনের জন্য আরও কোন দেশ দখল করে বসবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

তুর্কীবিন ফয়সাল একথা মানতে প্রস্তুতই ছিলেন না যে, ইরানের সঙ্গে লিয়াজোঁ কায়েম না করে ইরাক এত বড় একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কারণ, লিয়াজোঁ ছাড়া এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ইরান সুযোগের সদ্বব্যবহার করতে পারে। তার ধারণায় ইরান-ইরাকের মধ্যে আগেই সমঝোতা হয়ে গেছে যে, লুটপাটের সম্পদে তারা উভয়ই হবে সমান অংশীদার। এমতাবস্থায় ইরান বাহরাইনের উপরও হামলা করে বসতে পারে।

২রা অক্টোবর সারাটা সকাল শাহ ফাহাদের ভাইদের সঙ্গে ফোন করতে করতে কেটে গেল। শাহ তাঁর ভাইদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে চাচ্ছিলেন ইরাকের পক্ষ থেকে সৌদি আরবের উপর হামলার কোন সম্ভাবনা নেই? এমনটি অসম্ভবও ছিল না। শাহ ভাল করে জানতেন সৌদি আরবের একার পক্ষে তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর পক্ষে বাইরের সাহায্য প্রার্থনাও অতটা সহজ ছিল না। অনেকের ধারণা ছিল সৌদি আরব যদি আমেরিকার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাহলে একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, সৌদি আরব তার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমেরিকার উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়তঃ কোন খৃষ্টান দেশের কাছে সাহায্য চাওয়ার কারণে শাহ ফাহাদের খাদেমুল হারামাইন আহ্ শরীফাইন উপাধিটি দারুণভাবে কলংকিত হতে বাধ্য। বিধর্মীদের সৌদি আরব আগমনে পবিত্র স্থান সমূহের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে মনে করে জনগণ সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে। দীর্ঘ দুইঘণ্টা আলাপ আলোচনার পর সৌদি রাজপরিবার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই মুহূর্তে কারো সাহায্য গ্রহণ করা ঠিক হবে না; বরং আরবলীগ ও ইসলামি কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করাটাই হবে অধিক সঙ্গত। একদিকে শাহ ফাহাদও সৌদি রাজপরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত, অপরদিকে শাহ ফাহাদের ছোট ভাই, ছেলে, ভাগিনা, ভাতিজা ও অন্যান্য যুবকরা শলাপরামর্শে লিপ্ত। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে যুবকদের এই দলটির অধিকাংশের রায় ছিল দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে কালবিলম্ব না করে এই মুহূর্তে আমেরিকার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা অবশ্য পালনীয়কর্তব্য।

কুয়েত থেকে সৈনা অপসারণে সাদ্দামের সম্মতি

মুহাম্মাদ বিন ফাহাদসহ শাহ ফাহাদের ছেলেরা তার কাছে গিয়ে নিজেদের অভিমতের কথা ব্যক্ত করল, তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ ছিল, আমাদের এই অপেক্ষায় থাকা ঠিক হবে না যে, আমেরিকা যখন আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে বলুন আমরা আপনাদের জন্য কী করতে পারি? কারণ, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের নিরাপত্তা সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। তারা আরও বলল দেরি না করে এই মুহূর্তে ইরাকের যে তেলের পাইপ লাইন সৌদি আরবের উপর দিয়ে চলে গেছে তা বন্ধ করে দেয়া হোক। শাহ তখনও দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন, তিনি তাদেরকে কোন চুড়ান্ত জবাব দিতে পারলেন না। অপরদিকে আমেরিকাও সেই মুহূর্তে কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত অবস্থায় ছিল না। তবে সাদ্দাম হোসেন প্রেসিডেন্ট বুশকে বিশ্বের কাছে তার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার একটা সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট বুশও হয়ত মনে মনে এ সুযোগটি খুঁজছিলেন।

ইরাকি আক্রমণের কারণে মিসরের পজিশন অনেকটা সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছিল। মিসর যেহেতু আরব সহযোগিতা পরিষদের একজন মেম্বর, অতএব তার প্রতি স্বভাবতই সন্দেহ জাগে যে ইরাকি আক্রমণের ব্যাপারে আগথেকেই হয়ত সব কিছু জানত তারা। প্রেসিডেন্ট মুবারক যখন বুরগুল আরব রেস্টহাউসে নিজের আসনে এসে বসলেন। তখন তাকে একটি নাতিদীর্ঘ রিপোর্ট দেয়া হলো। ঐ রিপোর্টে বর্তমান পরিস্থিতির চুলচেরা বিচার করা হয়েছে। ঐ রিপোর্টটি তাঁর আমলারা তাঁকে তৈরি করে দিয়েছিল। ঐ রিপোর্টে বলা হয়-

> "আরব সহযোগিতা পরিষদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইরাকের আবেগ জড়িত কর্মতৎপরতার পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজের লক্ষ্যবস্তুকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা। মিসরকে নিরপেক্ষ রেখে সিরিয়াকে একঘরে বানিয়ে কুয়েত দখল ছিল ইরাকি লক্ষ্যবস্তুর অন্যতম অংশ।"

ইরাকি হামলার কারণে মিসরের স্বার্থ ও নীতি দুটিই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ হামলা ছিল বৃহত্তর আরব সহযোগিতা ও মিসরীয় নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ মুহূর্তে মিসরকে ইরাক অথবা অন্যান্য আরব দেশগুলোর পক্ষাবলম্বন করতে হবে। মিসর এতো নির্বোধ নয় যে, অন্যান্য আরব দেশকে বাদ দিয়ে সে ইরাকের

পক্ষালম্বন করবে। ইরাকের পরিবর্তে অন্যান্য আরব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্কই মিসরীয় স্বার্থের অনুকূলে। একথা মিসর খুব ভাল করেই জানত। ইরাকি হামলা কেবল আরব সহযোগিতা পরিষদের জন্য অকাল মৃত্যুই ডেকে আনেনি বরং বিদেশী হামলার পথও সুগম করে দিয়েছে। ইরাকি হামলার কারণে এ ধারণাও বদ্ধমূল হয়েছে যে, ইরাকিরা মিরসকে ভালমতই বোকা বানিয়েছে।

ঐ রিপোর্টে হোসনী মুবারককে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় সংকটময় মুহূর্তে ইরাক মিসরের সঙ্গে পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাবে, যাতেকরে তার আমেরিকা ও তেলআবিবের সঙ্গে ইন্ডাইরেক্ট যোগাযোগ বহাল থাকে। রিপোর্টে আরও বলা হয় কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীর নিঃশর্ত অপসারণের ব্যাপারে মিসরের উচিত ইরাকের উপর বরাবর চাপ প্রয়োগ করে যাওয়া। এই সংকট আরও যেন বিস্তৃত না হয় সে ব্যাপারে সরকারকে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১। ইরাকি আক্রমণের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করে একটি বিবৃতি প্রদান করতে হবে।

২। ইরাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে।

৩। আরব দেশসমূহের সহযোগিতায় ইরাকের উপর চাপ প্রয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে। উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হয় সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে আমেরিকার ইন্টারফেয়ার করার বিষয়টি ক্রমান্বয়ে এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কেউ যেন ব্যাপারটি বুঝতে না পারে। আর এ ব্যাপারে তেমন কোন ঢাকঢোল পিটানোরও প্রয়োজন নেই। অপরদিকে ইরাকিদের হাতে ক্রীড়নক সাজারও কোন দরকার নেই। এছাড়া এই মুহূর্তে ইসরায়েলের কাছে একটি পয়গাম পাঠান উচিত যে, তারা যেন এ বিষয় নাক গলানোর চেষ্টা না করে। উক্ত রিপোর্টের শেষে বলা হয় লিবিয়া যেন ইরাকের পক্ষাবলম্বন না করে এ ব্যাপারে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মিসরের নীলনদের তীরে হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। উক্ত বৈঠকের বিশেষ দিক ছিল, অংশগ্রহণরত সকল আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ছিলেন অস্পষ্ট দিকদর্শনের শিকার। এখানে উল্লেখ্য, ইরাকি হামলার পর আর পত্রপত্রিকায় এ ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়নি। এমনকি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরব বিশ্বের কোন সম্মিলিত

অভিমতও সামনে আসেনি। সিরিয়ার বক্তব্য ছিল, কালবিলম্ব না করে ইরাকের বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন করে বিবৃতি দেয়া হোক। পিএলওর মত ছিল নিন্দাজ্ঞাপনমূলক বিবৃতি না দিয়ে আমাদের উচিত সমঝোতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা। জর্ডানের শাহ হোসাইন ছিলেন এ বক্তব্যের পক্ষে। সাদ্দামের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সুবাদে ধারণা করা হচ্ছিল শাহ, হোসাইন ইরাক ও কুয়েতের মাঝে সমঝোতামূলক উদ্যোগ গ্রহণে কৃতকার্য হবেন। উক্ত বৈঠকে ইরাকের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন মিসরে নিযুক্ত ইরাকি রাষ্ট্রদূত ও ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি "নাবীল নজম আত তাক্রীতী" তিনি। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সকলের উপর জোর দিয়ে বলেন, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ইরাকের একটি উচ্চ পর্যায়ের ডেলিগেশন ডক্টর সা'দুন হাম্মাদীর নেতৃত্বে এখানে এসে পৌঁছুবে এবং ইরাকি ভূমিকার ব্যাখ্যা দেবে। তারা এখানে এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত যেন যৌথ ইশতিহার জারি না করা হয়। ইরাক যেহেতু আরব সহযোগিতা পরিষদের সদস্য সুতরাং অনেক আরব রাষ্ট্রপ্রধানের ধারণা ছিল আক্রমণের পূর্বে মিসর, জর্ডান ও ইয়েমেনকে সে অবশ্যই বিষয়টি আগাম জানিয়েই তবে কুয়েতের উপর আক্রমণ করে থাকবে। সম্ভবত এ কারণে শাহ হোসাইন কুয়েত আক্রান্ত হওয়ার পর হোসনী মুবারককে ফোন করে বলেছিলেন আমি স্বয়ং ইস্কান্দারিয়ায় পৌঁছে এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করব। শাহ হোসাইন ও সা'দুন হাম্মাদী আনুমানিক একই সময় সন্ধ্যা ছয়টায় মিসরের ইস্কান্দারিয়ায় পৌঁছেন।

ইস্কান্দারিয়া শহরে পৌছলে সঙ্গে সঙ্গে সা'দুন হাম্মাদীকে সম্মেলন নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। এ সময় কুয়েতি জনতার একটি বিক্ষুব্ধ দল হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ঘিরে রেখেছিল। তাদের হাতে ছিল শায়েখ জাবেরের বড়সড় প্রতিকৃতি। মিসরের কুয়েতি দূতাবাস তাদের এই প্রতিকৃতি সরবরাহ করে। বিক্ষোভকারীরা বারবার একটি শ্লোগান উচ্চারণ করছি, কুয়েতবাসির একই কথা - শায়েখ (জাবের) আমাদের প্রিয় নেতা।

আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন শুরু হওয়ার একঘণ্টার মধ্যে সবার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সা'দুনের কাছে বলার মত কোন নতুন কথা নেই। তারপরও তাঁদের জন্য কোন অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব। মিসর ও সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে কী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে সে ব্যাপারে কোন

স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়নি। ওদিকে শাহ হোসাইন সম্মেলন শেষে মিসর আসতে চাচ্ছিলেন। পরে হোসনী মুবারক শাহ হোসাইনকে অভিযোগের সুরে বলেন, সাদ্দাম আমাকে পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে বেয়াকুব বানিয়ে ছেড়েছে। কারণ তিনিই পশ্চিমাদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন সাদ্দাম হোসেন কুয়েতের উপর আক্রমণ করবে না। উভয় নেতা এ ব্যাপারেও ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন যে, এ সংকটটি আরববিশ্বের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে, আরবরাই সংকটটি নিষ্পত্তির ব্যাপারে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তারা এ ব্যাপারেও একমত ছিলেন যে, শাহ হোসাইন নিজে বাগদাদ গিয়ে ইরাকি নেতার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন। হোসনী মুবারক আরও একটি প্রস্তাবও দেন তা হচ্ছে, সৌদি আরবে একটি মিনি কনফারেন্স আহ্বান করা হোক, যে কনফারেন্সে শাহ ফাহাদ, শাহ হোসাইন, সাদ্দাম হোসাইন, শায়েখ জাবের ও হোসনী মুবারক স্বয়ং অংশগ্রহণ করবেন। তবে উভয়নেতার মধ্যে কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সে ব্যাপারে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। প্রেসিডেন্ট মুবারকের বক্তব্য ছিল, উভয়নেতা এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, শাহ হোসাইন ইরাক গিয়ে সরাসরি সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে আলাপ করে ইরাকি নেতাকে কুয়েত ছাড়তে রাজী করবেন। সেই সঙ্গে শায়েখ জাবেরের সরকার পুণর্বহাল করতেও তাকে সম্মত করবেন। তারপর সৌদি আরবে প্রস্তাবিত মিনি কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হবে; কিন্তু শাহ হোসাইন একথা অস্বীকার করে বলেন, সাদ্দাম হোসেনের উপর যদি এ ধরনের শর্তারোপ করা হতো আর যদি তিনি তা মেনে নিতেন তাহলে প্রস্তাবিত মিনি কনফারেন্সের কি প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকত? আসলেও প্রয়োজন ছিল এমন একটি কনফারেন্সের যে কনফারেন্সে শায়েখ জাবের ও সাদ্দাম উভয়ই থাকবেন। সাদ্দাম যদি সম্মতি প্রকাশ করেন তাহলে তাঁর এ সম্মতি প্রমাণ করবে, শায়েখ জাবেরকে তিনি এখনও কুয়েতের আমির হিসাবে স্বীকার করেন। এভাবে উপসাগরীয় সংকট নিষ্পত্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছান সম্ভব।

শাহ হোসাইন বলেছিলেন সংকট নিষ্পত্তির এটাই ছিল সর্বোত্তম পন্থা। এই প্রক্রিয়ায় কুয়েতকে ইরাকি দখলমুক্ত ও জাবের সরকারকে পুনর্বহাল করা সম্ভব ছিল। এ ব্যাপারে পারস্পরিক ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট বুশ জনাব হোসনী মুবারক ও শাহ হোসাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং তাদের জানিয়ে দিলেন, ইরাকি পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে কুয়েতের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের শামিল, যা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমেরিকা কেবল নিন্দাসূচক বিবৃতি আর কুয়েতকে ইরাকি দখলমুক্ত করার দাবি জানিয়ে ক্ষান্ত

হবে না, তাদের দাবি আরও বড় হতে পারে। প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকি হামলাকে আমেরিকার স্বার্থের উপর হামলা মনে করেন। তিনি বললেন, আমেরিকার জনগণ, সরকার ও সংবাদ মাধ্যম তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করছে যে, সে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করুক। প্রেসিডেন্ট বুশ আরও বলেন, আরববিশ্ব এখনও পর্যন্ত ইরাকি হামলার নিন্দা করেনি। তিনি শাহ ফাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন; কিন্তু শাহ ফাহাদ তাঁর কাছে সাহায্যের আবেদন করেননি এজন্য তিনি খুব মর্মাহত হন। মিঃ বুশ সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আরববিশ্ব যদি তাকে সহযোগিতা না করে, তবে তিনি এককভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কুয়েত যদিও সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে; কিন্তু পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে সামনে রেখে তার একার আবেদন এই মুহূর্তে যথেষ্ট নয়। শাহ হোসাইন উত্তরে বলেন, কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি যেন জলদি না করেন। তিনি বিষয়টির নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া ভাবার জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময় চান, যেন আরবরা নিজ উদ্যোগে এই সংকট থেকে পরিত্রান পেতে পারে।

শাহ হোসাইন তাকে তার প্রস্তাবিত বাগদাদ সফর সম্পর্কেও অবহিত করেন। মিঃ বুশ রাগান্বিত অবস্থায় বলেন, "ঠিক আছে দিলাম তোমাকে ৪৮ ঘণ্টা, এরপরও যদি তোমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পার তাহলে আমি জানি না আগামীতে ফয়সালা কে করবে। "

প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে আলাপের পর শাহ হোসাইনকে ফোন করে তিনি বলেন, আমির কুয়েতকে ইরাকি বাহিনীর কবলমুক্ত ও ইরাকি হামলার নিন্দা করে একটি বিবৃতি প্রদানের কথা ভাবছে। জনাব মুবারকের বক্তব্য মতে, একথা শুনে শাহ হোসাইন পেরেশান হয়ে যান এবং তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এই মুহূর্তে আপনি কোন বিবৃতি প্রদান করবেন না, কারণ এ ঘটনায় বাগদাদে তাঁর আপোষ কার্য মীমাংসা মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হবে।

অপরদিকে মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাত আব্দুল মুগিদ টেলিফোন করে জনাব মুবারককে বলেন, সা'দুন হাম্মাদীর বক্তব্যে নতুন কিছু নেই, ফলে আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এ অনুভূতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, ইরাকি পদক্ষেপের কঠোর ভাষায় নিন্দা করা উচিত। ওদিকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ইরাকের বিরুদ্ধে নিন্দায় ছিল সকলের অগ্রগামী আর আরবরা ছিল তখন কেবল আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাকি হামলার নিন্দা করে বিবৃতি প্রদান

করে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি থেকে নিন্দাবাদের ধারা অব্যাহত থাকে। অপরদিকে ইসমাত আব্দুল মুগিদ হোসনী মুবারককে আরও জানান, সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদি আল ফয়সাল তার উপর চাপ দিচ্ছেন যে, ইরাকের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করা হোক, অন্যান্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও রয়েছেন তার পক্ষে। অতএব পরিস্থিতি এখন খুব ঘোলাটে! বলুন এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী? মিঃ মুবারক তার কথার কোন সরাসরি উত্তর না দিয়ে তিনি ফোন করলেন সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সালকে। তিনি তাকে বললেন, এ বিষয়ে আপনারা মোটেও তাড়াহুড়া করবেন না, আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কারণ, শাহ হোসাইন যে মিশন নিয়ে বাগদাদ রওনা হয়েছেন তিনি যেন তার মিশনে সাকসেসফুল হতে পারেন। সুতরাং পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভা আগামীকাল সকাল পর্যন্ত মুলতবী করে দেয়া হোক।

শাহ হোসাইনের জন্য সরাসরি ইস্কান্দারিয়া থেকে বাগদাদের উদ্দেশে রওনা হওয়া ছিল অসম্ভব। কারণ ইরাকি যুদ্ধবিমান ছাড়া অন্যসকল বিমানের জন্য ইরাকের আকাশসীমা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়া হয়। ফলে তিনি ইরাকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাগদাদের উদ্দেশে রওনা হন। এরপরও তিনি সরাসরি বাগদাদে পৌঁছাতে সক্ষম হননি। প্রথমে ইরাকি সীমান্তের নিকট একটি জর্ডানি বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। সেখান থেকে একটি ইরাকি হাওয়াই জাহাজ তাকে বাগদাদে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সকাল ১০টা ২০ মিনিটে হোসনী মুবারক তাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন, এখনও পর্যন্ত তিনি বাগদাদে পৌছাননি কেন? উত্তরে শাহ হোসাইন অসুবিধার কথা জানান এবং বলেন, খুব শিগগির তিনি বাগদাদ রওনা হবেন। শাহ হোসাইন বাগদাদ গিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে খুবই আস্থাশীল দেখতে পান। অনারব দেশগুলির পক্ষ থেকে অনবরত কঠোর সমালোচনার কারণে তিনি যথেষ্ট অবাক হচ্ছিলেন; কিন্তু তাঁকে দেখে নার্ভাস মোটেই মনে হয়নি। স্পষ্ট ভাষায় তিনি শাহ হোসাইনকে বলেন, কুয়েতিদের ব্যাপারে আলোচনা করে কোন লাভ নেই, ওরা অবুঝ, ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম, আমার যা করার আমি তাই করেছি। তবে হ্যাঁ জর্ডান, মিসর ও ইয়েমেনকে আগাম না জানানোর কারণ, আমি আমার বন্ধুদেরকে মুশকিলে ফেলতে চাইনি। লাভ-ক্ষতির পরোয়া না করে নিজেদের জিম্মাদারীতে আমরা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। শাহ হোসাইন আশংকাজনক অবস্থার বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি অন্য অনেকের তুলনায় পশ্চিমাদের খুব ভাল করে চিনি। আমি নিশ্চিত, পশ্চিমারা এ ব্যাপারে অবশ্যই নাক গলাবে। অতএব আমি অনুরোধ

করছি কুয়েত খালি করে দেয়া হোক। উত্তরে সাদ্দাম বলেন, আবু আবদুল্লাহ! (শাহ হোসাইনের উপনাম) ওদেরকে বলো ওরা যেন আমাদেরকে ভয় না দেখায়, আমরা তো কুয়েত খালি করতে চাই, আমাদের পক্ষ থেকে আজ সকালের বিবৃতিতে কুয়েত খালি করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল যে বিবৃতি জারি করে তাতে ভাষাশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন পেশ করে আবেগ আপ্লুতভাবে ইরাকি পদক্ষেপকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। উক্ত বিবৃতিতে পবিত্র কুরআনের আয়াতের আশ্রয় নিয়ে ইরাকি আক্রমণকে জায়েজ প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হয়। অপর দিকে কুয়েতের আমির শায়েখ জাবেরকে ইতিহাসধিকৃত কারুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যে তার অঢেল সম্পত্তি নিয়ে মাটির নিচে দাফন হয়ে যায়। সেই সঙ্গে কয়েক দিন অথবা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি অন্তরবর্তীকালীন স্বাধীন সরকার গঠনেরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। শাহ হোসাইন জানতে চান, ইরাকি বাহিনী কবে নাগাদ কুয়েত খালি করবে? উত্তরে বলা হয়, কয়েক দিন অথবা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। ইরাক কুয়েত খালি করে দেবে। জবাবে শাহ হোসাইন বলেন এরও আগে আপনার কুয়েত খালি করতে হবে, হয়ত এতোটা সময় পাবেন না। কিছু সময় পারস্পরিক বিষয় মতবিনিময়ের পর ইরাকি নেতার প্রস্তাবিত মিনি কনফারেন্সে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তার সম্মতির কথা জানান কিন্তু শায়েখ জাবেরের ঐ কনফারেন্সে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তিনি কঠোর ভাষায় আপত্তি জানান। তিনি বলেন, শায়েখ জাবের স্বয়ং ঐ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে তিনি তাঁর কোন প্রতিনিধি পাঠাবেন।

ইরাকি নেতার মতে, কুয়েতি নেতার অংশগ্রহণ অনেকের জন্য আত্মমর্যাদাহানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। শাহ ইরাকি নেতার উপর জোর দিয়ে বলেন, কনফারেন্স শুরু হওয়ার পূর্বে এমন কিছু পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যাতে সবাই মনে করে, ইরাক কুয়েত খালি করে দিতে প্রস্তুত রয়েছে। উত্তরে সাদ্দাম হোসেন এ ব্যাপারে তার সাথীদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য কিছুটা সময় চান। অতঃপর শাহ আম্মানের উদ্দেশ্যে রওনা হন। আম্মান পৌঁছানোর পূর্বেই তিনি পথিমধ্যে ইরাকি নেতার রেডিও পয়গাম পান যে, ইরাকি বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল তার মতের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে কুয়েত খালি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ৩রা আগস্ট ইরাকি বাহিনীর কুয়েত থেকে প্রত্যাবর্তনের তারিখ ঘোষণা দেয়া হবে। কয়েকঘণ্টা পর ইরাকের বার্তাসংস্থা ইরাকি বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের

জনৈক মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করে, উক্ত বিবৃতিতে বলা হয়- ইরাক ও কুয়েত যদি কোনপ্রকার আশঙ্কার সম্মুখীন না হয় তাহলে চার আগষ্ট কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের কাজ শুরু হবে। বিবৃতিতে বলা হয় এ সম্পর্কে একটি প্লান ও ইতোমধ্যে চুড়ান্ত করা হয়েছে। এটা ছিল এমন একটা সময় যখন ধারণা করা হচ্ছিল সাদ্দাম হোসেন তার বিপদের সমূহ সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে এবং তিনি তার উচ্চাভিলাষকে সংক্ষেপ করে বর্তমান সংকটের একটি সম্মানজনক নিষ্পত্তি চান। কারণ, কুয়েতের আমির ও তার পরিবারের কুয়েত থেকে পলায়ন ইরাকের সকল প্রোগ্রাম ভেস্তে দেয়। তাছাড়া কুয়েতী আমিরের পক্ষ থেকে আমেরিকার কাছে সাহায্য প্রার্থনার কথা তখন আর কারো কাছে অবিদিত ছিল না।

স্বার্থ উদ্ধারে মার্কিনীদের নির্লজ্জ আচরণ

এই অবস্থায় আরববিশ্বকে যদি ইরাক একথা স্বীকার করতে বাধ্য করতে পারত যে, কুয়েতি জনগণ শায়েখ জাবেরকে চায় না, তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করে, ইরাকি হামলা ছিল তাদের জন্য নাজাতস্বরূপ, ইরাকি আক্রমণ কুয়েতি জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়েছে, তাহলে কুয়েত থেকে সম্মানজনক সেনা প্রত্যাহার ইরাকের জন্য সম্ভব ছিল; কিন্তু সমস্যা হলো সেই মুহূর্তে ইরাকের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে কেউ প্রস্তুত ছিল না। তবে হ্যাঁ, জর্ডানের শাহ হোসাইন সাদ্দামের আশ্বস্তমূলক বক্তব্যকে তার সফলতা জ্ঞান করতে থাকেন। তিনি তার এই সাফল্যের কথা হোসনী মুবারককে জানাতে ব্যস্ত। দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে আম্মান কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি জানেন, প্রেসিডেন্ট বুশ তার সঙ্গে জরুরি আলাপ করবে। শাহ নির্দেশ জারি করে বলে, কায়রোয় নিযুক্ত জর্ডানের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে হোসনী মুবারককে জানিয়ে দেয়া হোক, আমি অতিসত্বর তাঁকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাসেজ প্রেরণ করব।

সময় খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হতে তখন আর খুব বেশী সময় বাঁকি নেই। ইত্যবসরে আলজেরিয়া ও মরোক্কো নিজ নিজ উদ্যোগে বিবৃতি দেয়। বিবৃতিতে কুয়েতকে ইরাকি দখলমুক্ত করার দাবি জানানো হয়। সিরিয়া ও লেবানন একরাত পূর্বে এ ধরনের একটি বিবৃতি প্রদান করে। এটা ছিল খুবই লজ্জার কথা যে, এতো দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও আরববিশ্ব ঐক্যবদ্ধভাবে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়নি, এমনকি ঐক্যবদ্ধভাবে কোন বিবৃতি প্রদানও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শাহ হোসাইন খুব ভাল করে জানতেন, আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দীর্ঘ সময়ধরে ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয়; কিন্তু তারপরও তাঁর নির্দেশে কায়রোয় অবস্থানরত জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফ্যাক্সের মাধ্যমে একটি পয়গামে বলা হয়, আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যেন অধৈর্য না হয়ে পড়েন সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। শাহ অনেক দেরি করে ফেলেছেন। কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হওয়ার দুইঘণ্টা পূর্বে মিসর ইরাককে নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করে। তবে মিসরীয় বিবৃতির ভাষা ছিল খুবই নরম। মিসর তার বিবৃতি সরকারিভাবে কখন প্রচার করে তা নিয়েও যথেষ্ট দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে। মিঃ হোসনী মুবারকের বক্তব্য হলো, তিনি শাহ হোসাইনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর উক্ত বিবৃতি

প্রচার করেন। কারণ শাহ হোসাইন ও সাদ্দাম হোসেনের মধ্যে তারই দেওয়া দু'টি প্রস্তাব অর্থাৎ ১। জাবের সরকারের পুনর্বহাল ২। কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে মতবিনিময়ে তারা কোন সিদ্ধান্তে যেহেতু উপনীত হতে সক্ষম হননি তাই তিনি আর দেরি না করে বিবৃতি প্রদান করেন।

অপরদিকে শাহ হোসাইন বলেন, আমার সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়াই হোসনী মুবারক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, সাদ্দামের ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে তিনি আলোচনা করছিলেন। ইরাকিরা যদি সময়মত তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নিত তাহলে সৌদি আরবের প্রস্তাবিত মিনি কনফারেন্সের ফলশ্রুতিতে কুয়েতে জাবের সরকারের পুনর্বহাল সম্ভব ছিল। শাহ তাঁর বক্তব্যের পক্ষে হোসনী মুবারকের সঙ্গে তার ফোনে কথাবার্তাকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন। শাহের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি হোসনী মুবারককে জিজ্ঞাসা করেন এত তাড়াহুড়া করে বিবৃতি প্রদানের পিছনে কী কারণ ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, জনগণ ও প্রেসের চাপের মুখে তিনি এমনটি করতে বাধ্য হয়েছেন। শাহ হোসাইনের মতে এ বিশ্লেষণ কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়।

মিসরের নিন্দাসূচক বিবৃতি আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদেরকেও অবাক করে ছেড়েছে। কারণ, এর দ্বারা শাহ হোসাইনের আপোষ মিশনকে কেন্দ্র করে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রমে পরিণত হলো। উল্লেখ্য, সেদিন সারাদিন প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁর

কাল্পনিক বিজয়

টেলিফোন ডিপ্লোম্যাসি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারকও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন যাদের সঙ্গে সেদিন প্রেসিডেন্ট বুশ ফোনে আলাপ করেন। আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ইরাক ব্যতীত সকলেই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, এ ঘটনার নিন্দা করা হোক। কীভাবে নিন্দা করা হবে এ নিয়ে অবশ্য মন্ত্রীদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। কোন কোন মন্ত্রীর বক্তব্য ছিল কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হোক, কেউ কেউ নিন্দা জ্ঞাপনের ভাষা নরম রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তাদের মতে, ইরাকের নাম না নিয়েই নিন্দা করা হোক। দীর্ঘ বিতর্কের পর মিসর, সৌদি আরব, আরব আমিরাত এবং সিরিয়ার বক্তব্য ছিল কঠোর ভাষায় ইরাকের সমালোচনা করা হোক। অপরদিকে পিএলও- ইয়েমেন এবং আরও কয়েকটি দেশ ছিল নমনীয় সমালোচনার পক্ষে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সে সময় আমেরিকার নৌ ও বিমান বাহিনী উপসাগরীয় অঞ্চলের দিকে রওনা হতে শুরু করেছে। ৩ আগষ্ট শাহ হোসাইন শাহ ফাহাদকে ফোন করে জানান, সাদ্দাম হোসেন মিনি কনফারেন্সে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। উত্তরে শাহ ফাহাদ বলেন, এখন এ ধরনের কনফারেন্স অনুষ্ঠানের আর কী প্রয়োজন? ততক্ষণে সৌদি আরব ইরাকের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদমূলক বিবৃতি প্রচার করে ছেড়েছে। উপসাগরীয় সংকটকে কেন্দ্র করে আরব জনগণের প্রতিক্রিয়ার সাথেসাথে অযাচিতভাবে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই মারাত্মক ধরনের। তবে আরবদের জন্য আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করা খুব একটা সহজ ছিল না। শাহ ফাহাদ রাজপরিবার ও আমেরিকার অনুরোধ সত্ত্বেও আমেরিকান সাহায্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ৩ আগষ্ট আমেরিকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বন্দর সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মিঃ ব্রেন্ট গোক্রাফট-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন, এক দশক পূর্বে ইরানি বিপ্লবের পর তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ জিমি কার্টার সৌদি আরবকে দুই স্কোয়াড্রন এফ-১৫ যুদ্ধবিমান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতির পর তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তনের আগেই মিঃ কার্টার ঘোষণা দেন যে, এ বিমানগুলো অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হবে। প্রিন্স বন্দর-এর মতে কার্টারের এ ব্যবহারের ফলে সৌদি আরব তার উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। ফলে, মার্কিনীদের কোন প্রতিকৃতির উপর ভরসা করা সৌদিদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রিন্স বন্দর নিষ্ট ব্রেন্টসোক্রাফ্ট-এর সঙ্গে এসব আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট বুশ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনায় শরিক হন। প্রিন্স বন্দর মিঃ বুশকেও প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের আচরণের কৃপা জানালে তিনি বলেন, তাঁর কথার মর্যাদা রক্ষা করবেন। যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচার ছিলেন বুশের কঠোর মনোভাবের গোঁড়া সমর্থক। এ সময় তিনি আমেরিকাতেই অবস্থান করছিলেন। অনেক পর্যবেক্ষকের ধারণা, উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নীতিনির্ধারণীতে তিনিই সবচে' বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একথা ঠিক যে, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাজ্যের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী; কিন্তু তারপরও অনেক আরব শায়েখের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের রয়েছে খুবই গভীর সম্পর্ক। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তারও অনেক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। এছাড়া কুয়েতে যুক্তরাজ্যের ইনভেস্টও কম ছিল না। এই কারণে কুয়েতের উপর হামলার অনেক পূর্বে মিসেস থ্যাচার কঠোর ভাষায় সাদ্দামের সমালোচনা করন। ইরাকি হামলা যুক্তরাজ্যের জন্য ইরাকের উপর বিষোদগার করার রাস্তা খুলে দিয়েছিল। এতদ্ব্যতীত মিসেস থ্যাচার আভ্যন্তরীণ সমস্যায় ছিলেন জর্জরিত। তাই ইরাকি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি।

মিঃ বুশের কথাবার্তায় প্রিন্স বন্দরের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, এ যাত্রা তিনি আর ওয়াদা খেলাপি করবে না। ফলে, তিনি ফাহাদকে আমেরিকান সাহায্য গ্রহণ করার জন্য চাপ প্রয়োগের বিষয় মিঃ বুশের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। প্রিন্স শাহ ফাহাদের কাছে ফোন করে সৌদি আরব আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। শাহ তো ভেবেই পাচ্ছিলেন না এমন সংকটময়ও নাজুক পরিস্থিতিতে প্রিন্স তার অফিস ছেড়ে রিয়াদ কেন আসতে চান। সুতরাং শাহ তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনি আপনার ম্যাসেজ আপনার কোন সহযোগীর হাতে দিয়ে পাঠান। প্রিন্স এতে সম্মত হলেন না; বরং রিয়াদ আসার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনড়। তিনি আরও বললেন, তার কাছে এমন কিছু সংবাদ আছে যা তিনি স্বয়ং শাহের খেদমতে পেশ করতে চান। প্রিন্স বলেন, আমি বড় মানুষটির (মিঃ বুশ) সঙ্গে স্বয়ং কথা বলেছি। তিনি বলেন, মহামান্য বাদশাহ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, মিঃ বুশ খুব ভাল মানুষ। তিনি সর্বদা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেন। শাহের ধারণা ছিল মার্কিনীরা নিজেদের স্বার্থে বারবার তাদের নীতি পরিবর্তন করে, যা সৌদি আরবের মত একটি দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু নাছোড় বান্দা প্রিন্স বন্দর রিয়াদ আসার ব্যাপারে শাহকে অনুমতি প্রদানে বাধ্য করেই ছাড়লেন।

রিয়াদ যাওয়ার পথে প্রিন্স বন্দর রাবাতে স্বল্প সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করেন। কারণ, তাঁর পিতা প্রিন্স সুলতানকে তিনি এখান থেকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছিলেন। প্রিন্স সুলতান শাহ ফাহাদের আপন সহদর হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন তখন সৌদি আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। রাবাত থেকে রিয়াদ যাওয়ার পথে তিনি শাহ হোসাইনের সাথেও মতবিনিময় করেন। শাহ হোসাইন লক্ষ্য করেন পিতা-পুত্রের কথার মধ্যে পুরো এক জেনারেশনের গ্যাপ রয়েছে। প্রিন্স সুলতান মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করতে ইতস্ততবোধ করছিলেন অপরদিকে প্রিন্স বন্দরের খেয়াল ছিল, কালবিলম্ব না করে এই মুহূর্তে মার্কিন অফারকে সাদরে গ্রহণ করা দরকার।

প্রিন্স বন্দর ও প্রিন্স সুলতান ৫ই আগষ্ট সৌদি আরব পৌছেই তাঁরা শাহ ফাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রিন্স বন্দর বলেন, আমেরিকান উপগ্রহের মাধ্যমে তোলা ছবি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এসব ছবিতে ইরাকি বাহিনীকে বিভিন্ন স্থানে আনাগোনা করতে দেখা যাচ্ছে। এসব ছবির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন। এসব কিছু শোনার পরও মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করার ব্যাপারে শাহ ফাহাদের ইতস্ততভাব তখনও কাটেনি। কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার ২৪ ঘণ্টা পর আমেরিকার বক্তব্য ছিল, যে কোন উপায়ে সে সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে; কিন্তু এক সপ্তাহ পর সে এমন ভাব দেখান শুরু করে যে, কুয়েত সরকারের পুনর্বহালের জন্য সে ইরাকের উপর হামলা করে বসতে পারে। স্বার্থ রক্ষার খাতিরে বারবার নীতি পরিবর্তনের এ প্রবণতা প্রমাণ করে, মার্কিনীদের কাছে আদর্শ ও নীতি বলে কোন কিছুরই বালাই নেই। সে পারে না এমন কাজ নেই। ফলে, উপসাগরীয় সংকটকে কেন্দ্রকে করে একটি বিরাট যুদ্ধ যে সংঘটিত হতে যাচ্ছে, অনেক পর্যবেক্ষক তা পূর্বেই আঁচ করে নিয়েছিলেন। শাহ ফাহাদ তাঁর আট বছরের রাজত্বকালে কখনও এমন সংকটের সম্মুখীন হননি। মার্কিন বাহিনীর জন্য যদি তিনি তার সীমান্ত খুলে দিতেন তাহলে তাঁর উপর মারাত্মক ধরনের অপবাদ আরোপের সম্ভাবনা ছিল। অপরদিকে সৌদি আরবের নিরাপত্তার বিষয়টিও ছিল খুব স্পর্শকাতর। মিঃ বুশ বারবার ফোন করে শাহ ফাহাদকে বুঝাতে চেষ্টা করছিলেন, ইরাক কুয়েত দখল করেই ক্ষান্ত হবে না, তাদের আগামী টার্গেট সৌদি। শাহ ফাহাদের মেধা আর অভিজ্ঞতা তাকে বারবার বলছিল তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই, সবর কর, ধৈর্য ধর, দেখ কী ঘটে! আমেরিকা এতো আহাম্মক নয় যে, সে সহজে শাহ ফাহাদকে তামাশা দেখার সুযোগ দিবে। কীভাবে প্রেসার দিয়ে শাহকে বশে আনা যায় তা মার্কিনীরা খুব ভাল করে জানে। পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে

শাহ্ ফাহাদ চাচ্ছিলেন ঐকমত্যের ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক। প্রথমে রাজপরিবার অতঃপর পুরো আরববিশ্বের সম্মতি অর্জনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর; কিন্তু বাস্তবতার আলোকে বলা যায় এমনটি কখনও সহজ ছিল না। সব সময় তিনি অবশ্যই কোন না কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি রাজপরিবারের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের কারণে কোন বিষয় মতৈক্যের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ ছিল না। রাজপরিবারের প্রধান নেতা ও বাদশাহ হওয়ার কারণে শাহ্ ফাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না সবাইকে সন্তুষ্ট করে কোন কাজ করা। ১৯৭৫ সালে শাহ্ ফয়সালের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা সৌদি রাজপরিবারের পারস্পরিক কোন্দলের সব থেকে বড় প্রমাণ। তাঁর জনৈক অসন্তুষ্ট ভাতিজা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শাহ্ ফাহাদের জন্য আরও একটি মুশকিল ব্যাপারে ছিল এই যে, তিনি মার্কিনীদের উপর অন্ধ আস্থা আনতে পারছিলেন না। প্রিন্স বন্দর যেসব ছবির কথা উল্লেখ করেন সেসব ছবিতে ইরাকি সেনাদের সৌদি সীমান্তের খুব কাছে দেখানো হয়েছে। সৌদি নেতা ভেবে পাচ্ছিলেন না, যদি এটা ঠিক হয় তাহলে সৌদি সেনারা বিষয়টি অনুধাবনে ব্যর্থতার পরিচয় দিল কেন? শাহের কাছে তাঁর নিজের এ প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর ছিল না। এদিকে মার্কিনীদের পক্ষ থেকে প্রেসার অনবরত অব্যাহত থাকে। সিনেট বশ আবারও শাহ্ ফাহাদকে ফোন করেন। আমেরিকান সাহায্য হবে আহ্বান জানান। বিষয়টি এড়ানোর জন্য শাহ্ বুশকে বলেন, এই মুহর্তে সৌদি আরবের কয়েকটি যুদ্ধবিমানের প্রয়োজন। এছাড়া আর তেমন কিছুই প্রয়োজন নেই।

মিঃ বুশও সহজে ছাড়ার পাত্র নন। মার্কিনীদের প্রেসারের মুখে শাহ তাদের এ প্রস্তাব মেনে নেন যে, এই মুহূর্তে সৌদি আরবের কী কী যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রয়োজন তা মনিটর করার জন্য একটি আমেরিকান বিশেষ দল রিয়াদ সফর করবে। শাহ ফাহাদের অভিমত ছিল এই যে, উক্ত দলে নিপর্যায়ের বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করবে। ওদিকে মিঃ বুশ চাচ্ছিলেন ঐ দলের নেতৃত্ব দিবেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মিঃ বেন্টসেক্রাফট। মোটকথা, যতই দিন যেতে লাগল শাহ ফাহাদের উপর মার্কিন সাহায্য গ্রহণের জন্য ততই চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকল। শাহের শত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মার্কিন অফার দীর্ঘ সময় দূরে ঠেলে রাখা সম্ভব ছিল না। শাহের নিজের আপন ভাই, ভাতিজা, ভাগিনা এমনকি নিজের ছেলে সবাই চাচ্ছিল তিনি মার্কিন অফারকে সানন্দে গ্রহণ করুন। কিছুসংখ্যক আরব শায়েখও ছিল তাদের পক্ষে এসব চাপের মুখেই হয়ত শেষ পর্যন্ত শাহ মিঃ বুশের এ প্রস্তাব

মেনে নেন যে, সৌদি আরবে আগমনকারী মার্কিন বিশেষজ্ঞ দলের নেতৃত্ব দিবেন সে দেশের প্রতিরক্ষা সচিব মিঃ ডিকচেনী।

সৌদি আরবের পুণ্যভূমিতে আমেরিকান সেনাদের অশুভ পদচারণা ৪ আগষ্ট সকালে শাহ ফাহাদ শাহ হোসাইনের কাছে ফোন করে তাঁকে আমেরিকান স্যাটালাইটের সাহায্যে সংগৃহীত ছবির ব্যাপারে অবহিত করলেন। এ ছবিগুলি প্রমাণ করে ইরাকি ট্যাংক বহর সৌদি আরব ও কুয়েতের সীমান্তের মাঝামাঝি নিরপেক্ষ এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শাহ হোসাইন সৌদি নেতার কথা শুনে বলেন, এসব ছবির ব্যাপারে আমার আস্থা নেই। এগুলো কতটুকু সত্য সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান, তবে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এ বিষয়টি নিয়ে আমি সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে আলাপ করব। শাহ তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি সাদ্দামের সাথে ফোনে যোগাযোগ করলেন। সাদ্দাম স্যাটালাইট থেকে সংগৃহীত ছবির কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এটা কী করে সম্ভব! কারণ সৌদি আরব ও ইরাকের মধ্যে ননবিলিগারেন্সী একোর্ড বহাল রয়েছে (যুদ্ধ না করার চুক্তি)। এমতাবস্থায় ইরাক কীভাবে সৌদি আরবের উপর হামলা করতে পারে? তাছাড়া যুদ্ধ না করার চুক্তিতে স্বাক্ষর করার প্রস্তাবত আমিই দিয়েছিলাম। আমি কীভাবে সৌদি আরবের উপর আক্রমণ চালাতে পারি? আপনি যা বললেন এসবই মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন খবর। তারপরও আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি এসব সংবাদের পিছনে সত্যতা কতটুকু। আমার আশপাশে কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা রয়েছেন আমি তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখি, আপনি কয়েক মিনিট ধৈর্য ধরুন। এই বলে তিনি আশপাশের সামরিক অফিসারদেরকে এ বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। তাঁকে জানান হলো ঐ এলাকায় কুয়েতি রাজপরিবারের সদস্যদের সন্ধান ছাড়া অন্য কোন কারণে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়নি। সাদ্দাম বলেন, আপনি সৌদি নেতাকে জানিয়ে দিন ইরাকি বাহিনী কখনও সৌদি আরবের দিকে অগ্রসর হবে না, এ বিষয় তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ইরাকি নেতার তখনও পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল প্রস্তাবিত মিনি কনফারেন্স অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি ঐ কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি যে মিনি কনফারেন্সে অংশগ্রহণে আগ্রহী তার প্রমাণস্বরূপ দখলদার ১০ হাজার ইরাকি ফৌজকে কুয়েত থেকে হটিয়ে নেন। তার ধারণায় এ ধরনের পদক্ষেপের ফলে আলোচনার জন্য শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে; কিন্তু এসময়

পরিস্থিতি এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে হোসনী মুবারক উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন না। ওদিকে শাহ হোসাইন এ সংকটের সুষ্ঠু ও মর্যাদাপূর্ণ সমাধান কামনা করছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি শাহ ফাহাদকে ফোন করে সাদ্দামের আস্থামূলক বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করার পর শাহ ফাহাদের সঙ্গে ইরাকি নেতার সরাসরি সাক্ষাতের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। শাহ হোসাইন বলেন, পরিস্থিতি দিনদিন মারাত্মক আকার ধারণ করছে, অতএব আমি চাই অনুগ্রহ করে আপনি তাকে একবার সাক্ষাতের সুযোগ দিন। সৌদি নেতা সাদ্দামের সঙ্গে সাক্ষাতে মোটেই রাজি ছিলেন না। জর্ডানি নেতার বারবার অনুরোধের পরও তিনি তাকেসাক্ষাতের অনুমতি দিলেন না; বরং তিনি বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সালকে আমি আম্মান পাঠাচ্ছি ও তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করবে।

প্রিন্স সৌদ আল ফয়সাল এসময় আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন উপলক্ষে কায়রোয় অবস্থান করছিলেন। তাই সৌদি নেতা তার স্থলে সৌদি আরবের উচ্চ শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রীকে আম্মান প্রেরণ করেন। ৫ আগষ্ট তিনি জর্ডানের রাজধানী আম্মান পৌঁছে শাহ হোসাইনকে অবহিত করেন যে, আমেরিকানরা শাহ ফাহাদকে কিছু ছবি সরবরাহ করেছে, ওসব ছবিতে ইরাকি ফৌজ সৌদি সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে দেখানো হয়েছে।

জর্ডানি নেতার জন্য ছবির এ ব্যাপারটি ছিল বড় রোমাঞ্চকর। তিনি সাদ্দামের কথায় ছিলেন পুরোপুরি আস্থাশীল, তাই সৌদি ও কুয়েত সীমান্তে জর্ডানবাহিনীর টহলদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু সৌদি নেতার শাহ হোসাইনের উপর আস্থা ছিল না। সৌদি নেতা ভাবছিলেন জর্ডানি নেতা সাদ্দামের স্বার্থে কাজ করছেন, একারণে তিনি জর্ডানি নেতার প্রস্তাবে আশাব্যঞ্জক সাড়া দেননি। জর্ডানি নেতার প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ার আরেকটি কারণ হলো সৌদি আরবের ক্ষমতাসীন নজদী রাজ পরিবার ও জর্ডানের ক্ষমতাসীন হাশেমী রাজপরিবারের পুরাতন বংশগত কোন্দল চলে আসছে। মোটকথা, উপসাগরীয় সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে যত ধরনের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো হয় তা সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এসময় রিয়াদে ডিকচেনী ও জেনারেল নরম্যান শোরাজকোফের আগমন ঘটে। বিভিন্ন বাহানায় শাহ ফাহাদ কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত আমেরিকান কর্মকর্তাদের তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দানে বঞ্চিত রাখেন। তিনি আসলে জানতে চাচ্ছিলেন সৌদি আরবে মার্কিনীদের উপস্থিতিকে ধর্মীয় উলামারা কীভাবে মূল্যায়ন করেন

এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া কী? সৌদি নেতার এই নীরব ভূমিকার অর্থ মার্কিনীরা ধরে নেয় যে, তিনি বর্তমান সংকট নিরসনে আরব ও ইসলামি দেশগুলির সাহায্য কামনা করছেন। সুতরাং মার্কিনীরা সৌদি আরবকে সাহায্য করার জন্য আমেরিকার সঙ্গে অন্যান্য ইসলামি দেশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মি. বুশ মরোক্কোর বাদশাহ শাহ হাসানসহ অন্যান্য আরব নেতাদের ফোনে জানান, সৌদি আরব যদি সামরিক সাহায্যের অনুরোধ জানায় তবে তাকে যেন ইতিবাচক উত্তর দেয়া হয়। অতপর আমেরিকান প্রেসিডেন্ট শাহ ফাহাদকে ফোনে আশ্বস্ত করে বলেন, অন্যান্য বন্ধুদেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আমেরিকান বাহিনীর উপস্থিতিতে সৌদি জনগণ ও ধর্মীয় সমাজ নূন্যতম আপত্তি উত্থাপন করবে বলে আমি আশা করি না। শাহ ফাহাদের জন্য এ প্রস্তাব ছিল গ্রহণযোগ্য। ইসলামি বাহিনীর আড়ালে আমেরিকান বাহিনীর আগমনের পথ এভাবে সুগম করা হয়। প্রিন্স আব্দুল্লাহর মত ছিল, যে সকল দেশের কাছে সামরিক সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তাদের লিস্টে সিরিয়ার নামও অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কারণ, ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না হওয়ার সুবাদে ইতিমধ্যে হাফেজ আল আসাদের একটি ইমেজ সৃষ্টি হয়েছিল, ফলে সিরিয়ার অংশগ্রহণে সৌদি আরবের রাজনৈতিক অবস্থান আরও দৃঢ় হওয়া ছিল বাঞ্ছনীয়। সৌদি আরব কিছুসংখ্যক আরব দেশ ছাড়াও পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার কাছে সামরিক সাহায্যের অনুরোধ জানায়। পাকিস্তান ও মালয়েশিয়া সৌদি অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেয়, অপরদিকে ইন্দোনেশিয়া সৌদি প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চাওয়ার কারণে সৌদি নেতা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।

২২শে ডিসেম্বর ১৯৯০ কাতারে অনুষ্ঠিত উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের এক বৈঠকে বাহরাইনের পক্ষ থেকে সৌদি নেতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মার্কিন সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে এতো দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরার পিছনে কারণ কী ছিল? আর কেনই বা আপনি এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন? উত্তরে শাহ ফাহাদ বলেন, অনেকের ধারণায় আমি এ বিষয়ে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছি, মোটেই দুর্বল ছিলাম না আমি, এটা ছিল অনেকের ভুল ধারণা। অনেকের মতে মার্কিন সাহায্যের ব্যাপারে আমি ছিলাম দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার, এ ধারণাও ঠিক নয়। মূলকথা হলো বিষয়টি ছিল খুবই স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করতেও আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম সকল কিছুর চাবিকাঠি নিজের হাতে রাখতে, যাতে সময়মত তা ব্যবহার করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি না

হয়। ডিকচেনী মি. বুশের পক্ষ থেকে সৌদি শাসককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, প্রয়োজন শেষে মার্কিনবাহিনী এক সেকেণ্ডও সৌদি আরবে থাকবে না। সৌদি নেতা যখন নির্দেশ দিবেন তখনই আমেরিকা তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য থাকবে। ডিকচেনী আরও বলেন, সৌদি আরবে সামরিক ঘাঁটি তৈরির কোন অভিপ্রায় আমেরিকার নেই। ওয়াশিংটন ফিরে যাওয়ার পথে মি. ডিকচেনী কায়রোয় যাত্রাবিরতি করে প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারকের সঙ্গে উপসাগরীয় সংকট নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলাপের ফলে মিসরীয় নেতা আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ আইজেন হাওয়ারকে সুয়েজ খাল অতিক্রম করার অনুমতি দেন। উল্লেখ্য, এ অনুমতি ছিল মিসরের প্রাক্তননীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, কারণ মিসর পূর্ব থেকেই এ ধরনের যুদ্ধজাহাজ সুয়েজ খাল অতিক্রম করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছিল। অতপর ঐ দিনই মি. বুশ মিসরীয় নেতার সঙ্গে ফোনে আলাপ করেন। ফলে হোসনী মুবারক সৌদি আরবে মিসরীয় সৈন্য পাঠাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। অন্যদিকে জর্ডানি নেতা যখন হোসনী মুবারক, শাহ ফাহাদ ও মরোক্কোর শাহ হাসানের সিদ্ধান্তের কথা শুনলেন তখন তিনি যারপরনাই আশ্চর্য হলেন, এমন একটি শক খাওয়ার কথা তিনি কখনও কল্পনা করেননি। তার মতে মার্কিনবাহিনী আসার আগে খুব দ্রুততার সঙ্গে কিছু শর্ত আরোপ করা উচিত ছিল, যাতে করে মার্কিনবাহিনীর আগমনকে আইনের গণ্ডীর ভেতর রাখা যায়।

ইত্যবসরে সিরিয়া প্রস্তাব দিয়ে বসে যে, সংকট নিরসনে আরব রাষ্ট্রপতিদের একটি শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করা হোক। জনাব ইয়াসির আরাফাতও এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি বলেন, আমি নিজে সাদ্দামের কাছে যাব এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণে তাকে বাধ্য করব। ওদিকে হোসনী মুবারক পিএলও নেতার সঙ্গে মতবিনিময়ের পর তাকে একটি বিশেষ পয়গাম দিয়ে ইরাকি নেতার কাছে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে তিনি কায়রোয় অবস্থিত ইরাকি রাষ্ট্রদূতকে ফোন করে বলেন, আপনি এই মুহূর্তে সাদ্দামের কাছে আমার এ পয়গাম পৌঁছে দিন যে, তিনি যেন নিঃশর্তভাবেকুয়েত খালি করে দেন। তারপর আমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখব বিষয়টি কীভাবে মীমাংসা করা যায়। তিনি আরও বলেন, আমার মাথায় এমন একটি প্লান আছে, যদি তা কার্যকর করা হয় তবে সাদ্দামকে কোন প্রকার আত্মসম্ভ্রমহানির সম্মুখীন হতে হবে না। ইরাকি দূত তৎক্ষণাৎ ঐ পয়গামটি নিয়ে ইরাকের উদ্দেশে রওনা হন।

দ্বিতীয় দিন ইরাকি রাষ্ট্রদূত ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ্জাত ইব্রাহিমের সঙ্গে মিসরের ইস্কান্দারিয়া এয়ারপোর্টে এসে উপস্থিত হন। ইজ্জাত ইব্রাহিমের বিমানটি ঠিক সেখানে এসে ল্যান্ড করে যেখানে ডিকচেনীর বিমানটি ল্যান্ডিং ছিল। হোসনী মুবারক ইজ্জাত ইব্রাহিমের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে বলেন, আরবদেশগুলি বর্তমান সংকটকে মীমাংসার পরিবর্তে আরও হাওয়া দিয়ে চলেছে। এ কথার জবাবে জনাব ইজ্জত ইব্রাহীম বলেন, এমতাবস্থায় ইরাকি নেতার জন্য কোন আপোষমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই মুশকিল। তাছাড়া আগামীতে কুয়েত খালি করার কোন ইচ্ছা তার নেই। এ বিষয় কোন আলোচনার তিনি পক্ষপাতি নন। অপরদিকে ইজ্জাত ইব্রাহিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, জনাব হোসনী মুবারক যেভাবে সাদ্দাম হোসেনের উত্তরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মোটেই যথাযথ নয়। সাদ্দাম কুয়েতখালি করতে প্রস্তুত ছিলেন। মতানৈক্য ছিল কেবলমাত্র সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে। মিসরীয় নেতা চাচ্ছিলেন ইরাকের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্বে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়া হোক। অপরদিকে সাদ্দাম চাচ্ছিলেন সম্মেলন অনুষ্ঠানের পূর্বে এ ধরনের ঘোষণা আদৌ সম্ভব নয়। কার কথা ঠিক সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সত্যিই খুব কঠিন। তবে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সমস্যাটির নিষ্পত্তির ব্যাপারে যে ধরনের আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছিল তা যেন সব মাঝ পথেই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

৮ই আগস্ট ১৫টি জেট যুদ্ধবিমান সেনা সদস্যসহ মার্কিনবাহিনীর প্রথম দলটি সৌদি আরব এসে পৌঁছে। এসময় মিসরের একটি সেবা ইউনিটও সৌদি আরব যাওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ইরাকের বিরুদ্ধে যেকোন হামলার জন্য তখন তিন লাখ সৈন্য ও ৪৫ দিনের প্রয়োজন ছিল।

এদিন জনাব হোসনী মুবারক জাতির উদ্দেশে টেলিভিশনে ভাষণ দেন, সেই ভাষণের মাধ্যমে আরববিশ্ব মোটামুটি অনুমান করে নেয় যে, অবস্থা যেখানে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সকল পথ অবরুদ্ধ। মিসরীয় নেতা তার ভাষণে বলেন, পরিস্থিতি যতদূর গড়িয়েছে, তা যদি আমরা নাগালে আনতে না পারি তবে যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই। আমি একজন প্রাক্তন সেনা অফিসার। আমি খুব ভাল করে জানি যদি একবার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তবে তার পরিণাম কী হবে!

পরদিন ৯ই আগস্ট হোসনী মুবারক কায়রোয় আরব রাষ্ট্রপতিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। উদ্দেশ্য ছিল, সংকট মীমাংসার জন্য শেষবারের মত চেষ্টা করা। তিনি তার উক্ত ভাষণের শেষে বলেন, আমি আশা রাখি ইরাকি নেতা তার সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করবেন। তিনি আরও বলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেক আমি আমার পয়গাম সাদ্দামকে পৌঁছে দিয়েছি। হোসনী মুবারকের সম্মেলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম কায়রো পৌঁছেন লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কায়রোয় যেন আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের ঢল নেমে এলো।

৯ই আগষ্ট প্রত্যুষে মিসরীয় নেতা কায়রোয় অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনের ব্যাপারে ইরাকি রাষ্ট্রদূতকে ফোন করে বলেন, কায়রোয় অনুষ্ঠিতব্য আরব রাষ্ট্রপতিদের শীর্ষ সম্মেলনের সংবাদ তিনি যেন সাদ্দামকে পৌঁছে দেন এবং তাকে বলবেন তিনি যদি স্বয়ং উপস্থিত না হতে পারেন তবে তার স্থলাভিষিক্ত কোন প্রতিনিধি দল অবশ্যই প্রেরণ করেন। ইরাকি রাষ্ট্রদূত একঘণ্টা পর ফোন করে মিসরীয় নেতাকে জানান, সাদ্দামের পক্ষ থেকে উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল অচিরেই কায়রোয় এসে পৌঁছুবে। উক্ত প্রতিনিধি দলে কারা কারা অন্তর্ভুক্ত আছেন সে ব্যাপারে ইরাকি রাষ্ট্রদূত কিছুই জানতেন না। সন্ধ্যা ছয়টায় একটি ইরাকি বিমান কায়রো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে। তখন সবাই জানলেন ইরাকি প্রতিনিধি দলে কে কে শামিল আছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইরাকি প্রতিনিধি দলটি সত্যিই ছিল উচ্চ পর্যায়ের। উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রধান ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইরাকি ন্যাশনাল গার্ড-এর কমান্ডার ত্বহা ইয়াসীন রমাদান। উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. তারেক আজিজ ছিলেন ঐ প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য। ইরাকি প্রতিনিধি দল বাগদাদ ছাড়ার সময় তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা যেন অন্যান্য প্রতিনিধি দলের ন্যায় হোটেলে অবস্থান করেন; কিন্তু কায়রো এয়ারপোর্টে পৌঁছে তারা জানতে পারেন মিসরীয় কর্মকর্তারা তাদেরকে সরকারি গেস্ট হাউসে থাকার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। মি. তারেক আজিজ জানতে চান অন্যান্য মেহমানরা যখন হোটেলে অবস্থান করছেন তখন সরকারি গেস্টহাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে? তিনি আরও প্রশ্ন করেন আমরা কি এখন থেকে নিজেদের কয়েদি ভাবব? উত্তরে মিসরীয় কর্মকর্তারা বলেন, না! এমনটি ভাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই; বরং আপনাদের সিকিউরিটির বিষয়টি বিবেচনা করে এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কারণ, কায়রোয় কুয়েতিদের একটি বিরাট জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং অধিকাংশ মিসরবাসী রয়েছে কুয়েতের পক্ষে। তারেক আজিজ এ বিশ্লেষণে সন্তুষ্ট হলেন না,

যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমরা প্রস্তুত বলে জানালেন তিনি। অতএব, সবকিছু অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দেওয়াটাই কল্যাণজনক হবে বলে আমি মনে করি। কিন্তু মিসরীয় কর্মকর্তারা তাঁর কথায় সম্মত হলেন না। তারা বললেন এটা সিকিউরিটির ব্যাপার, ইরাকি প্রতিনিধি দলের হেফাজত আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা আমাদের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করব। অতপর ইরাকি প্রতিনিধি দলকে "ইনডাস" নামক সরকারি গেস্ট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা অল্পক্ষণের মধ্যে অনুভব করেন, তাঁদের গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

বই কেনার
সামর্থ্য
থাকলে
বইটি
কিনে পড়ুন

সংকট নিরসনে আরব নেতাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

প্রেসিডেন্ট মুবারকের সঙ্গে কেবলমাত্র তাদের দলপতি ত্বলহা ইয়াসীন সাক্ষাৎ করতে পারবেন আর কেউ নয়, এমনটি জানানোর পর তাদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। ইরাক প্রতিনিধি দলের তারেক আজিজ এ প্রস্তাবে মোটেই সম্মত ছিলেন না। তার বক্তব্য ছিল আমিও মিসরীয় নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, মিসরীয় কর্মকর্তারা তাকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখেন।

ইরাকি প্রতিনিধি দলের নেতা মি. ত্বলহা ইয়াসীন সৌদি আরব, মরোক্কো ও মিসরের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে প্রেসিডেন্ট মুবারককে বলেন, অনেক আরব দেশ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ইরাকের জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বুনা হচ্ছে। তার বক্তব্য ছিল ইরাকিরা এ সম্মেলনে এজন্য অংশগ্রহণ করেছে কারণ তাদের এখনও মিসরীয় নেতার উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। মিসরীয় নেতা উত্তরে বলেন, এ ধরনের আলোচনায় সময় নষ্ট করার দিন পার হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে যা করণীয় তা আমাদেরকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। ইরাককর্তৃক গৃহীত কোন বিশেষ পদক্ষেপ উদ্ভূত অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে। কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে, যা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে আরবলীগের উপর। উত্তরে ত্বলহা ইয়াসীন বলেন, টাইমটেবিলের ব্যাপারে কথা বলার কোন অধিকার আমার নেই। হোসনী মুবারকের ধারণা ছিল এ ধরনের বক্তব্যকে ইরাক একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করবে। কারণ, এ প্রক্রিয়াই কেবল সম্মানজনকভাবে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহার সম্ভব ছিল। অপরদিকে সাদ্দামের বক্তব্য ছিল, আমরা ইতোমধ্যে কুয়েতে বিপ্লবী সরকার গঠন ছাড়াও কুয়েত থেকে এক ব্রিগেড সৈন্য প্রত্যাহার করেছি। আমরা যে কুয়েত থেকে সম্মানজনকভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করতে চাই এটাই তার সব থেকে বড় প্রমাণ। তারমতে, এই মুহর্তে সৈন্য প্রত্যাহারের সুনির্দিষ্ট টাইম-টেবিল প্রদান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া সাদ্দাম যখন জানতে পারলেন হোসনী মুবারক মার্কিন গণতরী আইজেন হাওয়ারকে সুয়েজ খাল অতিক্রম করার অনুমতি প্রদান করেছেন তৎক্ষণাৎ তিনি উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের একটি বৈঠক আহ্বান করলেন। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, যে কোন উপায়ে মার্কিনীদের মোকাবেলা করা হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত ছিল আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। অপরদিকে আমেরিকা তার লক্ষ্য অর্জনে ছিল উদগ্রীব। মি. বশ ৮ই আগস্ট জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। অনুরোধ জানালেন জাতির কাছে, তারা যেন

সৌদি আরবে মার্কিনসেনা প্রেরণকে সমর্থন করেন। এসময় আরব দেশসমূহ ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতগণ সৌদি আরবে সৈন্য প্রেরণের পথ সুগম করেন। পরে সম্মিলিত এই বাহিনীকে মিত্র বাহিনী নাম দেয়া হয়। ৯ই আগষ্ট ১৯৯০ মনে হচ্ছিল কায়রো শহরে বিস্ময়কর কিছু ঘটে গেছে। শহরজুড়ে বিরতিহীনভাবে বাজতে থাকে সাইরেনের শব্দ। এসবের কারণ ছিল এই যে, গোটা আরব দেশের রাষ্ট্রপতিগণের পদচারণায় কায়রো তখন ধন্য হয়ে উঠেছে। শহরের সকল ফাইভস্টার হোটেলগুলো তখন আরব রাষ্ট্রপতিগণ আর তাদের সফরসঙ্গীদের ভারে নুয়ে পড়ার উপক্রম। দীর্ঘদিন পর কায়রোর চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হলো। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির অপরাধে যে আরববিশ্ব মিসরের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল সেই আরব নেতারাই আজ আবার নতুনকরে কায়রোকে ধন্য করতে এগিয়ে এসেছেন। নিরপেক্ষদৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, আরব নেতারা তখন প্রমাণ করেছিলেন তারা যে কোন সমস্যার সম্মানজনক সমাধান করতে সক্ষম।

আরবদের ব্যাপারে অতীতেও মিসর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বর্তমানেও নেতৃত্ব প্রদানের আসনে অধিষ্ঠিত। পশ্চিমা সংবাদ জগতের একঝাঁক সাংবাদিক তখন কায়রোয় এসে ভিড় জমিয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক সাংবাদিক বর্তমান পরিস্থিতিকে দু'টি শব্দে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিলেন Peace or war, অর্থাৎ যুদ্ধ' অথবা শান্তি' অথচ বিষয়টি এতো সহজ ছিল না। কুয়েতের উপর ইরাকি আক্রমণের ফলে আরব জনগণের সেন্টিমেন্ট শুরুতে ছিল কুয়েতের পক্ষে; কিন্তু সময়ের তাগিদে তা পরিবর্তিত হয়। সাদ্দাম হোসেন হয়ে ওঠেন আরব ও ইসলামি বিশ্বের হিরো। কারণ, এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্রদের মাত্রারিক্ত নাক গলানো ইসলামিবিশ্বের কাছে মোটেই শুভলক্ষণ মনে হয়নি। প্রকাশ্যে বিভিন্ন স্থানে তারা তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

বর্তমান সংকটের ছিল দুটো দিক প্রথমত ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল, দ্বিতীয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাকের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ। অনেক আরবের কাছে ইরাককর্তৃক কুয়েত দখল তেমন কোন বড় সমস্যা ছিল না, যত বড় সমস্যা ছিল আমেরিকাকর্তৃক সম্ভাব্য সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ। ডক্টর আব্দুল জাবের-এর মতে আরবদের উচিৎ ছিল মার্কিন আগ্রাসনে বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠা। কারণ, তারা আরবদের বড় শক্তি ইরাককে পঙ্গু করতে চেয়েছিল। ক্রমশ তার এই মতের সঙ্গে অন্যান্যের মত সংযোজিত হয়। কায়রোর বড় বড় হোটেলে যেখানে আরব

রাষ্ট্রপতিগণ অবস্থান করছিলেন সেখানকার অবস্থাও ভিন্নরূপ ছিল না। সবাই ছিল উৎকণ্ঠিত। তবে তখন প্রত্যেকের উৎকণ্ঠার কারণ ছিল ভিন্নভিন্ন। প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৯ই আগস্ট সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু আরবলীগ সেক্রেটারিয়েট তখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল কাজ সমাধা করেনি। কোন এজেন্ডা তৈরি করা সম্ভব হয়নি, প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়ন করাও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমনকি সম্মেলনের নিয়মমাফিক কোন প্রোগ্রাম তৈরিও সম্ভব হয়নি। এমন সময় তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট জয়নুল আবেদীন বিন আলীর পক্ষ থেকে অনুরোধ এলো, দু'দিন বিলম্বে সম্মেলন শুরু করা হোক। যাতে এই সুযোগে আরবলীগ সেক্রেটারিয়েট তাদের বাকি কাজ সমাধা করেতে পারে। ওদিকে মরক্কোর শাহ হাসান সংবাদ পাঠালেন তিনি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তার ধারণা ছিল এ সম্মেলনের ফলাফল হবে জিরো। অবশ্য তিনি তার প্রতিনিধিস্বরূপ উচ্চ পর্যায়ের একটি ডেলিগেশন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কায়রো প্রেরণ করেন। কারণ শাহ হাসান আরবলীগ আহূত কায়রো সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য তার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো যথেষ্ট মনে করেন।

এমন সময় বাগদাদ রেডিও থেকে ঘোষণা দেয়া হয় যে, কুয়েতকে রীতিমত ইরাকের অংশ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। বাগদাদ রেডিওর এই ঘোষণায় পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে যায়। এ ঘোষণার আগ পর্যন্ত আরব রাষ্ট্রপতিদের ধারণা ছিল, সাময়িকভাবে ইরাক কুয়েত দখল করেছে। সাদ্দাম পরে শাহ হাসানের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে তার ঐ ঘোষণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছিল আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে অবশ্যই শক্তি প্রয়োগ করবে সুতরাং ইরাকি বাহিনীকে অবহিত করা প্রয়োজন ছিল যে তারা তাদের মাতৃভূমি রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ করছে। তাদেরকে যদি কুয়েত রক্ষার সবক দেয়া হতো তবে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াত। এজন্য এ ধরনের ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন ছিল যে, কুয়েত ইরাকেরই অংশ।

৯ই আগস্ট ১৯৯০ আরব রাষ্ট্রপতিগণ যখন সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তড়িঘড়ি করে ইরাকের বিরুদ্ধে তৃতীয় প্রস্তাব মঞ্জুর করে বসে। স্মরণ রাখতে হবে প্রথম প্রস্তাবটি ২রা আগস্ট ১৯৯০তে মঞ্জুর করা হয়। এই প্রস্তাবে ইরাককে বলা হয়েছিল, অনতিবিলম্বে সে যেন কুয়েত খালি করে। দ্বিতীয় প্রস্তাব আগস্টের ৬ তারিখে পাস করা হয়। এ প্রস্তাবের সূত্র ধরে ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর এই তৃতীয় প্রস্তাব,

যা সর্বসম্মতিক্রমে পাস করা হয় তাতে বলা হয় ইরাকি ভৌগোলিক সীমারেখার সঙ্গে কুয়েতের সংযোজন কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। ঐদিন এক প্রেস কনফারেন্সে প্রেসিডেন্ট বুশ একটি বেফাঁস কথা বলে ফেলেন, পরে তার এই কথা খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি বলেন, 'আমি বালির উপর একটি দাগ টেনে দিয়েছি।' এদিকে তুরস্ক বিমানবাহিনীকে সার্বক্ষণিক সতর্কাবস্থায় থাকার নির্দেশ দেয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তুরস্ক তার এই ঘোষণায় পর্বতমালার উপর যেন একটি দাগ টেনে দিতে উদগ্রীব। তুরস্কের ঘোষণায় স্বভাবতই ইরাকের অবাক হওয়ার কথা। কারণ কখনও কল্পনাও করেনি তুরস্ক এমন একটি ঘোষণা দিয়ে বসতে পারে। সাদ্দামের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, এই সংকটে তুরস্ক নিজেকে কখনও জড়াবে না; কিন্তু তুরস্কের ঘোষণা তার দৃঢ়বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ছাড়ল। ধারণা করা হয়, মার্কিন স্টেট সেক্রেটারি মি. জেমস বেকার-এর আংকারা সফরের পর তুরস্ক এ ধরনের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। একদিকে আরব রাষ্ট্রপতিগণ তাদের সম্মেলন নিয়ে ব্যস্ত, অপরদিকে পশ্চিমারা যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। সম্মেলন শুরু হওয়ার পর দ্বিপ্রহর নাগাদ আরব রাষ্ট্রপতিদের হাত কপালে ওঠে। তারা ভেবে ব্যাকুল হন যে, ইতিপূর্বে কোন সম্মেলনে এমন বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করেননি। এর নেপথ্যে কারণ হলো, কনফারেন্স শুরু হওয়ার পূর্বে রীতিমত একটি প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে। সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী কার্যপ্রণালী সমাধা হওয়ার কথা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগস্টের ১০ তারিখ থেকে সম্মেলন শুরু হওয়ার দরকার ছিল, কারণ ৯ তারিখের প্রোগ্রাম বাতিল ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, ১০ তারিখ ছিল শুক্রবার, জুমার নামাজের কারণে দুইঘণ্টা বিরতি হওয়ার কথা। তারপর যদিও বা সম্মেলন শুরু হলো কিন্তু মাঝপথে তা বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ করে সম্মেলন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানান হলো, আজই সম্মেলন সমাপ্ত করতে হবে। আগামীকাল কোন অবস্থাতেই সম্মেলন চালু রাখা সম্ভব হবে না। ফলে, আরব রাষ্ট্রপতিগণ ভাবতে বাধ্য হন, এতো স্বল্প সময়ের জন্য তাদেরকে এখানে ডাকার অর্থ কী? অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, এই সম্মেলন আহ্বানের পিছনে উদ্দেশ্য কী? উদ্যোক্তারা কি আদৌ চেয়েছিলেন, আরবরা নিজেরা মিলেমিশে নিজেদের সমস্যার সমাধান করুক? অবস্থাদৃষ্টে মোটেই তা মনে হয়নি; বরং মনে হয় কে বা কারা আগেই কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। আরব নেতাদের দ্বারা তারা কেবল তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করিয়ে নিতে চায়। অনেকের ধারণা ছিল শাহ ফাহাদ কর্তৃক মার্কিন সেনা তলবের সিদ্ধান্তকে আরবলীগ সমর্থন জানাবে। কায়রোয় অবস্থানরত ইরাকি

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. তারেক আজিজ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতিদের শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বে আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি বৈঠক আহ্বান করা হোক। যাতে রাষ্ট্রপতিদের শীর্ষ সম্মেলনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আগেই চুকিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। অপরপক্ষে মিসরীয় কর্মকর্তাগণ বলেন, পরিস্থিতি এমন হোলাটে হয়ে গেছে যে, বিষয়টি বিবেচনার দায়িত্ব আরব রাষ্ট্রপতিদের উপর ছেড়ে দেয়াটাই উত্তম হবে। এ উত্তর শুনে তারেক আজিজ গর্জে ওঠে বলেন, এমনটি ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। গতানুগতিক নিয়ম অনুযায়ী সর্বদা শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মি. তারেক আজিজের বক্তব্য ছিল, শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে এজেন্ডা তৈরিও শীর্ষ সম্মেলনে কী কী প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে বৈঠকে তার একটি খসড়া প্রণয়ন করা হোক। মিসরীয় কর্মকর্তারা তারেক আজিজের এই যুক্তি শোনার পরও তাদের সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, অস্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণত রীতিবিরুদ্ধ পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়দিন একথা প্রমাণিত হয় যে, অস্বাভাবিক অবস্থায় রীতিবিরুদ্ধ পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়েছে। সৌদি আরব ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ মিলে অত্যন্তগোপনে একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণরত অধিকাংশ প্রতিনিধির জানা ছিল না ঐ খসড়া প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তু কী। তবে অনেকে বিভিন্ন পন্থায় খসড়া প্রস্তাবের কপি সংগ্রহ কররে। সম্মেলন শুরু হওয়ার পূর্বেই তারা তা বিভিন্নজনের কাছে পৌঁছে দেন। আরব রাষ্ট্রপতিদের শীর্ষ সম্মেলন শুরু হওয়ার পূর্বে সৌদি প্রতিনিধি আরব লীগ সেক্রেটারি জেনারেল শাজলী আল কলবীকে ঐ খসড়ার একটি সরকারি কপি প্রদান করেন। এই কপিটি পাওয়ার পর এবং এ প্রস্তাবটি পড়ার পর ছাপানোর মত তার হাতে সময় ছিল না। পরে তার জনৈক সহযোগী একটি দফার দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ঐ দফায় বলা হয়, সকল আরব দেশ যেন তাদের সৈন্য সৌদি আরবে প্রেরণ করে এবং তারা যেন সেখানে পূর্ব হতে মওজুদ সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে। কে না জানে সৌদি আরবে পূর্ব হতে মজুদ সৈন্য ছিল আমেরিকার।

এ বক্তব্য দেখার পর শাজলী আল কলবী সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সালের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেন, একথার পরিস্কার অর্থ এই যে, আরব সৈন্যদেরকে

বলা হচ্ছে তারা যেন আমেরিকান সৈন্যদের সাথে সহযোগিতা করে, আরবলীগ সেক্রেটারির আপত্তির পর সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সাল উক্ত দফাটি প্রস্তাব থেকে বাদ দিয়ে দেন। ঐ দফাটি বাদ দেওয়ার পর প্রস্তাবের অর্থ অনেকটা এরকম দাঁড়ায়, আরব সৈন্যরা যেন সৌদি বাহিনীকে সহযোগিতা প্রদান করে। জর্ডানের শাহ হোসাইন খসড়া প্রস্তাবের কপি আগেই সংগ্রহ করে। তার বিশ্বাস ছিল খসড়া প্রস্তাবটি মূলত আরবি ভাষায় মোটেই লেখা হয়নি; বরং ভিনদেশী কোন ভাষায় তা তৈরি করা হয়। আরবি ভাষায় কেবল তার অনুবাদ পেশ করা হয়। শাহ হোসাইন ছাড়াও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রপতিদের অভিমত ছিল একইরকম। ফলে, গুঞ্জন শোনা যায়, এই প্রস্তাবের মূল খসড়া তৈরি করা হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। এ কারণে সম্মেলন কক্ষে তুমুল হৈ চৈ শুরু হয়। জর্ডান, ইরাক ও লিবিয়ানদের বক্তব্য ছিল, প্রস্তাবটির খসড়া তৈরি করেছে আমেরিকা। আমেরিকার তৈরি ইংরেজি প্রস্তাবটির আরবি অনুবাদ এখানে পেশ করা হয়েছে। ইত্যবসরে লিবীয় নেতা মুয়াম্মার আল গাদ্দাফী প্রস্তাবটির একটি কপি হাতে নিয়ে আমিরাত নেতা শায়েখ যায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানকে বলেন, তোমরা এভাবে আমেরিকার ধরনা ধরে বেড়াচ্ছ কেন? এভাবে আমেরিকার পিছনে পিছনে না ঘুরে ইসরায়েলের কাছে সাহায্য চাওয়াটাই তোমাদের জন্য উত্তম নয় কি? মুয়াম্মার গাদ্দাফী পরে উপসাগরীয় আরব দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শায়েখ সায়াদের কাছে যান এবং বলেন এত শ্রম ব্যয় না করে সরাসরি ইসরায়েলের কাছে গিয়ে সাহায্য চাও। তারা যেন সৈন্যবাহিনী তোমাদের প্রতিরক্ষায় পাঠিয়ে দেয়।

ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক আজিজ দাবি জানিয়ে বলেন, বিলম্ব না করে এই মুহূর্তে খোঁজ লাগানো হোক কারা এমন কাজটি করল? তার বক্তব্য ছিল সবকিছু আগে থেকেই তৈরি করে রাখা হয়েছে। যে কারণে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন হতে দেয়া হয়নি। কথা ছিল সকাল ১০ টায় সম্মেলন শুরু হবে; কিন্তু তার আগেই খসড়া প্রস্তাব সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে কেউ আর গ্রান্ড হলে প্রবেশ করতে রাজি হলেন না। বাইরের লবিতে সবাই ছিলেন অপেক্ষমান। খসড়া প্রস্তাবটি দ্বিতীয় বার প্রিন্টের কারণেও কিছুটা বিলম্ব ঘটল। মোটকথা নির্দিষ্ট সময়ের দেড়ঘণ্টা পর অর্থাৎ সাড়ে ১১টায় সম্মেলন শুরু হলো।

উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন স্বাগতিক দেশের প্রেসিডেন্ট জনাব হোসনী মুবারক। তিনি তার ভাষণে আশংকাজনক পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে জোরাল কণ্ঠে বললেন, কোন অবস্থাতেই আরবরা যেন আগ্রাসনের বিষয়টি বিস্মৃত হবার চেষ্টা না করেন;

বরং আমাদের সবাইকে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তার বক্তব্য ছিল আমরা যদি বর্তমান সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে বের করতে সক্ষম না হই, তবে একাজ অন্যরা করবে। 'অন্যরা' বলতে পরোক্ষভাবে তিনি আমেরিকানদের বুঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, সবরকম নেতিবাচক কল্পনার পরও আমি মনে করি আমরা খুব বেশী বিলম্ব করে ফেলিনি। এখনও আমাদের হাতে সময় আছে। তবে সম্মেলনে উপস্থিত অনেকের ধারণা ছিল আরবদের কিছু করার সময় পার হয়ে গেছে। অতপর জুমার নামাজের বিরতি ঘোষণা করা হয়; কিন্তু কিছুসংখ্যক প্রতিনিধি এরপরও লবিতে উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুসারে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বেলা দুইটায় শুরু হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। তার পর ঘোষণা দেয়া হয় বিকাল চারটায় সম্মেলন শুরু হবে; কিন্তু তাও আর সম্ভব হলো না। আগত মেহমানরা সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ না করে সবাই বাইরে পরস্পর আলাপচারিতায় ব্যস্ত রইলেন। প্রত্যেকেই ভিতরে প্রবেশ করতে ইতস্তত বোধ করছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে দাবানলের মত সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক আজিজ ও কুয়েতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শায়েখ সাবাহ আল আহমাদ আস্ সাবাহ-এর মাঝে হাতাহাতি হয়ে গেছে। ফলে, কুয়েতি মন্ত্রী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। এ ঘটনার ব্যাপারে ধারণা করা হয়, তারেক আজিজ শায়েখ সাবাহকে প্লেট ছুঁড়ে মারেন। যার ফলে তার নাক ফেটে গলগল করে রক্ত বের হয়। সে মুহূর্তে আর কিছু সামনে না পেয়ে তিনি তার জুব্বা দিয়ে নাক চেপে ধরেন। এ কারণে তার জুব্বা রক্তাক্ত হয়ে যায়; কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় আসলেও কি ঘটনাটি ছিল এরূপ? নিশ্চয়ই নয়! আসল ঘটনাটি ছিল, ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক আজিজ ও সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সাল আলাপচারিতায় ছিলেন ব্যস্ত, সৌদ আল ফয়সাল তার ইরাকি প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে বলছিলেন

বাগদাদ রেডিও আজকাল অপমানজনক বিবৃতি প্রচার করছে। তারেক আজিজ উত্তর দেওয়ার আগেই কুয়েতি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শায়েখ সাবাহ তাকে প্রশ্ন করে বসেন, মি. তারেক! আমাদের সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট বলাটা কি ঠিক? উত্তরে তারেক আজিজ বলেন, আমি দুখিত! একথা আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে মোটেও বলিনি। আপনার অফিস থেকে পাওয়া কাগজপত্রই আপনাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট প্রমাণ করেছে। এ উত্তর শুনে শায়েখ সাবাহ রাগে ফেটে পড়েন, এই অবস্থায় হল থেকে বের হবার জন্য দরোজার দিকে এগিয়ে যান। বাইরে বের

হবার পূর্বে মোটা কাচের দরোজার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটির উপর পড়ে যান। ফলে সাংঘাতিকভাবে নাকে ব্যথা পান। অমনি শুরু হয় অঝোর ধারায় রক্ত ঝরা।

সন্ধ্যা সোয়া সাতটার দিকে অনেক কষ্টের পর সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। কিন্তু হলে কি হবে? ততক্ষণে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, এ অবস্থায় কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা সম্ভব ছিল না। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট শাজলী দাঁড়িয়ে বলেন, আমরা সারাটা জীবন সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে কাটিয়ে দিলাম। অথচ আজ ভাবলক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। হয়েছে কোন দেশের নাম উল্লেখ না করেই তিনি বলেন, যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আমরা সারাটা জীবন সংগ্রাম করলাম আজ আরব দেশের কেউ কেউ তাদের নিজেদের দেশে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

হোসনী মুবারক বলেন, উদ্ভূত সমস্যাটির সমাধানের ব্যাপারে আরবরা সব ধরনের সুযোগ পেয়েছে; কিন্তু তারা সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। একথা শুনে লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী হাত উঠিয়ে বলেন, হ্যাঁ। আরবরা সুযোগ পেয়েছে ঠিকই তবে সে সুযোগ ছিল মাত্র ৪৮ ঘণ্টার। সম্মেলনে মঞ্জুরীর জন্য প্রস্তাবের পান্ডুলিপি সামনেই রাখা ছিল। অধিকাংশের ধারণা ছিল কোনরকম বিতর্ক ছাড়াই কেবলমাত্র দস্তখত করার জন্য এটা সামনে রাখা হয়েছে। এসময় মিসরীয় কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রস্তাবটির খসড়া তৈরির সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে উপসাগরীয় দেশের প্রতিনিধিরা ছাড়াও মিসর, সিরিয়া ও লেবাননের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু খসড়া প্রস্তাবটি তৈরি করতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তাই অন্যান্য ভাইদের ঘুম নষ্ট হবে সেই ভয়ে তাদেরকে উক্ত বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান হয়নি। তাদের এই ব্যাখ্যায় কেউ কর্ণপাত করেননি। অধিকাংশের ধারণা ছিল, তাদের রাবার স্ট্যাম্পের ন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে। অতপর ভাষণ দিতে এলেন কুয়েতের আমির শায়েখ জাবের আল আহমাদ আস্ সাবাহ। তিনি কোন প্রকার উত্তেজনামূলক বিবৃতি দানে বিরত থাকেন। কারণ তার ভয় ছিল এতে করে পরিবেশ আরও তিক্ত হয়ে উঠবে। তার ভাষণের পর স্টেজে আসলেন ইরাকি প্রতিনিধি দলের নেতা ত্বলহা ইয়াসীন রমাদান। তিনি তার ভাষণে বললেন, আমরা জানি না, কীসের ভিত্তিতে শায়েখ

জাবের আমাদেরকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখছেন। কারণ, বর্তমানে পৃথিবীর মানচিত্রে কুয়েত নামক কোন দেশের অস্তিত্ব নেই।

মি. ত্বলহা ইয়াসীন প্রায় ২৫ মিনিট পর্যন্ত ভাষণ দেন। তিনি তার ভাষণে কুয়েতের সঙ্গে তার দেশের কী কী বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। আর এসব মতানৈক্য দূরীকরণে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার বিষদ বর্ণনা দেন। তার ভাষণ চলাকালেই কুয়েতি আমির সম্মেলন কক্ষ ছেড়ে যান। তিনি সেখান থেকে সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে যান। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা তায়েফ পৌঁছান। এখানেই কুয়েতের প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়।

মি ত্বলহা ইয়াসীনের ভাষণের পর কুয়েতি যুবরাজ শায়েখ সায়াদ ভাষণ দিতে আসেন। তিনি বলেন, ইরাক বরাবর বলে এসেছে, কুয়েতের তেলনীতি ইরাকের পিঠে খঞ্জর মারার সমতুল্য। ইরাকি বন্ধুদের কাছে জানতে চাই কে কার পিঠে খঞ্জর মারল? কুয়েত না ইরাক? তিনি আরও বলেন, আমরা বারবার বলেছি, ইরাকের কাছে আমরা ঋণের অর্থ ফেরত দাবি করি না। তবে ইরাকের ঋণ আমরা মাফ করে দিয়েছি সরকারিভাবে এই ঘোষণা না দেওয়ার পিছনে কারণ হলো, আমরা যদি ঢাকঢোল পিটিয়ে তাদের ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেই তবে এতে তাদের সমূহক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য পাওনাদার তাদেরকে ঋণ পরিশোধের চাপ দেবে। আমরা ইরাকিদেরকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছি, ঋণ মওকুফের সরকারি ঘোষণা না দেওয়াতে আমাদের কোন লাভ নেই; বরঞ্চ এতে আপনাদের লাভ অধিক। আর একটি কারণ হলো, আজ যদি কুয়েত ইরাকের ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেয় তবে কুয়েতের কাছে ঋণী অন্যান্য দেশ তাদের ঋণ মওকুফ করার জন্য কুয়েতের উপর প্রেসার দেবে। এসব কারণে আমাদের পক্ষ থেকে ইরাকি ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেয়া সম্ভব হয়নি। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ ইরাকি বন্ধুদের আমরা বারবার এসব বিষয় বুঝাবার চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা আমাদের কোন যুক্তি গ্রহণ করতে নারাজ। সীমান্ত নির্ধারণের ব্যাপারে শায়েখ সায়াদ বলেন, ১লা আগস্ট জেদ্দায় অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে বাগদাদে এ বিষয়ে আরও আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে কুয়েত সম্মতি প্রকাশ করে। আমরা ইরাকিদের প্রয়োজনের বিষয়টি পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। কুয়েতের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে আমরা তাদের প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলাম। ১লা আগস্ট জেদ্দা বৈঠকের পর ৪ঠা আগস্ট বাগদাদে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের জন্যও আমরা প্রস্তুত ছিলাম। ইরাক-ইরান যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে শায়েখ সায়াদ বলেন, যুদ্ধ চলাকালীন

সময় সাদ্দাম বারবার বলতেন আজকের এই কঠিন সংকটময় মুহূর্তে কুয়েতি ভাইয়েরা যদি একটা রুটি পায় তার অর্ধেক তারা ইরাকি ভাইদের খাওয়ানোর জন্য প্রস্তুত কুয়েতের এই অনুগ্রহের কথা আমরা কখনও ভুলব না।

জনাব ইয়াসির আরাফাতের ধারণা ছিল, পুরাতন আলোচনা এই মুহূর্তে নিরর্থক। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমার কাছে একটা বাস্তবসম্মত ও কার্যকর প্রস্তাব আছে। এ বিষয়ে অনেকে সম্মেলন হলের বাইরে পরস্পর মতবিনিময়ও করেছেন। তিনি বলেন, এই সম্মেলনের পক্ষ থেকে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গঠন করা হোক। এই প্রতিনিধি দলে আরব সহযোগিতা পরিষদ, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ, আর পশ্চিমা দেশসমূহের পক্ষ থেকে একজন একজন করে সদস্য নেয়া হোক। প্রতিনিধি দলের কাজ হবে তারা বাগদাদ গিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে বলবে, তিনি যেন কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন। জনাব আরাফাতের ধারণায় এ উদ্যোগ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। পরে জানা গেছে, এ প্রস্তাবে ইরাক সম্মত ছিল। জনাব আরাফাতের ধারণায় এই প্রক্রিয়ায় যদি মি. সাদ্দামকে সম্মত করার চেষ্টা করা হয় তবে মি. সাদ্দাম এটাকে সম্মানজনক পদক্ষেপ জ্ঞান করে সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে আশা করা যায়। সম্মতি প্রকাশ করবেন।

ফিলিস্তিনি নেতার প্রস্তাব নিয়ে যখন চিন্তা-ভাবনা চলছে এমন সময় সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সাল শাহ ফাহাদকে একটি লিখিত নোট দেন এবং তাকে কানে কানে কিছু বলেন। শাহ ফাহাদ নোটটি পড়ে হোসনী মুবারকের দিকে ঠেলে দেন। তারা কোন মন্তব্য করে না তবে তাদের হাবভাব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল নিশ্চয়ই কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। সম্মেলন কক্ষের অবস্থা মুহূর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। আরাফাতের দেয়া প্রস্তাব তখন উপস্থিত প্রতিনিধিদের সমর্থন লাভ করছিল; কিন্তু মি. হোসনী মুবারক তাতে কোন আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না; বরং তিনি তা উপেক্ষা করে চলছিলেন। সম্মেলন কক্ষে তখন অনেকেই জানতেন না কী এমন ঘটনা ঘটেছে যার কারণে হঠাৎ অবস্থায় এমন পরিবর্তন এসেছে; কিন্তু পরে জানা গেল সাদ্দাম হোসেনের পক্ষ থেকে বাগদাদ রেডিও থেকে একটি আবেদন প্রচার করা হয়, উক্ত আবেদনে মিসর ও সৌদি আরব সরকারের পরিবর্তে সেসব দেশের জনগণের প্রতি বলা হয়, তারা যেন ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মিসরীয় জনগণকে বলা হয় তারা যেন মার্কিন রণতরী আইজেন হাওয়ার'কে সুয়েজ খাল অতিক্রম করতে না দেয়। আর

সৌদি আরবের দু'টি অঞ্চল হেজাজ ও নাজদের অধিবাসীদের বলা হয় তারা যেন পবিত্র স্থানসমূহের উপর অবৈধ কর্তৃত্ব স্থাপনকারীদেরকে এসমস্ত অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে। শাহ ফাহাদ ও হোসনী মুবারক উভয়ের ধারণায়, এভাবে ইরাকি নেতা তাদের দেশের জনসাধারণকে বিদ্রোহের প্রতি উস্কানি দিয়েছেন।

জনাব ইয়াসীর আরাফাত উত্থাপিত প্রস্তাব খুব কমসংখ্যক ভোটের ব্যবধানে মঞ্জুর হয়। অংশগ্রহণরত অনেক প্রতিনিধির ধারণা ছিল বিষয়টি যেহেতু আরব জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত অতএব জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতেই যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু মিসরীয়রা এ যুক্তিকে মোটেই আমল দেননি। এ ধরনের কোন বিষয়ে আরব জাতি ইতিপূর্বে কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এ ধরনের প্রত্যেকটি ঘটনার সময় তারা শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ইয়াসির আরাফাত তখনও পর্যন্ত তার প্রস্তাবের উপর জোর দিচ্ছিলেন। তিনি হোসনী মুবারককে বলেন, বাগদাদগামী প্রতিনিধি দলে তিনিও যেন শরিক হন এবং নেতৃত্ব প্রদান করেন। উত্তরে মুবারক বলেন, এ ব্যাপারে তার যা করণীয় তিনি তা আগেই করে ফেলেছেন। অতএব বাগদাদগামী প্রতিনিধি দলে তার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তার ভাষায়, এ ধরনের পাগলামীতে অংশগ্রহণের মত ফালতু সময় আমার হাতে নেই। প্রেসিডেন্ট মুবারকের এ উত্তর শুনে জনাব আরাফাত শাহ হোসাইনের দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন ইয়োর মেজিস্ট্রি আপনি কি... শাহ? হোসাইন তার কথা পূর্ণ হতে দিলেন না। মাঝপথে কথা কেটে দিয়ে বললেন, মি. আরাফাত আসলে সমস্যা কি জানেন? আমি অনেকবার বাগদাদ গিয়েছি, এই সুবাদে অনেক সাথী আমাকে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করছেন। ভাবছেন আমি কারো পক্ষ হয়ে কাজ করছি অথচ তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। আমি কেবল আরব জাতিকে ভয়ংকর ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। জনাব আরাফাত অতপর শায়েখ যায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের দিকে তাকান এবং ঐ প্রতিনিধি দলে তাকে শরিক হওয়ার অনুরোধ জানান; কিন্তু জনাব মুবারকের ন্যায় তিনিও অসম্মতি প্রকাশ করেন। এরপর সুদানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ওমর হাসান আল বশির দাঁড়িয়ে বলেন, আমাদের ভূখণ্ডে কোন বিদেশি শক্তিকে অবস্থান করার সুযোগ দেয়া মোটেই সমীচীন হবে না। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ তার উত্তরে বলেন, যারা অবৈধভাবে কুয়েত দখল করে রেখেছে তারাই আরবভূখণ্ডে বিদেশী শক্তিকে অবস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। শাহ ফাহাদ বলেন, সৌদি আরবে যেসব

বিদেশি সৈন্য অবস্থান করছে তাদেরকে কোন আগ্রাসনমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না। তবে হ্যাঁ তারা যদি আক্রান্ত হয়, তবে সে কথা ভিন্ন।

শাহ ফাহাদ একদিন পূর্বে সৌদি টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন, বন্ধুদেশ আমেরিকা ও ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশের সৈন্যরা স্থায়ীভাবে থাকার জন্য সৌদি আরবে আসেনি, তারা এখানে অস্থায়ী মেহমান, সৌদি ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষা ও সম্মিলিত সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণের জন্যই কেবল তারা এখানে এসেছে। সরকার নির্দেশ দিলে অনতিবিলম্বে তারা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য থাকবে। শাহ ফাহাদ তার লিখিত ভাষণটি পড়ার সময় একবারও মাথা উঠিয়ে এদিক-ওদিক দেখলেন না।

লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী প্রস্তাব দিলেন, আরব দেশের প্রেসিডেন্ট ও শায়েখদের একটি গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করা হোক। কারণ, এখানে অপ্রয়োজনীয় অনেক ব্যক্তিরা উপস্থিত রয়েছে। একথা শুনে হোসনী মুবারক রেগে গিয়ে বললেন, এ বিষয়টিকে আমি আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না, উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখনই ভোটাভুটির জন্য পেশ করছি। তার এ কথায় অনেকে আপত্তি তোলেন। তাদের মতে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু হোসনী মুবারক ছিলেন তার বক্তব্যে অনড়। তিনি আবারও বললেন আমি মিটিং করাতে যাচ্ছি। বলুন, আপনাদের মধ্যে কে এই প্রস্তাবের পক্ষে আর কে বিপক্ষে? ইরাকি প্রতিনিধিদের ধারণায় তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পরিস্থিতি প্রতিকূল ভেবে তারা চট করে উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াকআউটের ভঙ্গিতে হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। কেবলমাত্র ইরাকের একজন প্রতিনিধি সম্মেলন কক্ষে অবশিষ্ট থাকলেন, অন্যরা সোজা চলে গেলেন এয়ারপোর্টের দিকে। যাওয়ার আগে তারা তাদের লাগেজ অন্যদেরকে দিয়ে আনিয়ে নিলেন। চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী তার মহিলা দেহরক্ষীদের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। হোসনী মুবারকের এই ব্যবহারে তিনি যারপরনাই অবাক হন। মি. মুবারককে লক্ষ্য করে তিনি বলেন ব্রাদার মুবারক, দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। অনুগ্রহ করে ভোটাভুটি কিছু সময়ের জন্য মুলতবী করা হোক। গাদ্দাফীর অনুরোধের পূর্বেই ভোটাভুটি শুরু হয়ে যায়। এখন আরব লীগের গঠনতন্ত্রে অনুযায়ী ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে কোন প্রস্তাব মঞ্জুর হওয়া বাঞ্ছনীয়। গঠনতন্ত্রের এই অনুচ্ছেদ নানা সময় অনেক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ক্রমে কয়েক বছর পূর্বে এই অনুচ্ছেদে

পরিবর্তন আনা হয়। অতপর ভোটাভুটির পদ্ধতি চালু হয়, তবে এই পদ্ধতিটি তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়েই কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় কার্যকর। তবে নিরাপত্তা বিষয়ে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে আজও ঐকমত্য প্রয়োজন। প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে কতসংখ্যক ভোট পড়েছে সে বিষয়ে পরে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ফিলিস্তিন, সুদান, মৌরিতানিয়া শর্তসাপেক্ষ মত প্রকাশ করে।

ইরাক ও লিবিয়া প্রস্তাবের বিপক্ষে রায় দেয়। তিউনেসিয়া রায় দানে বিরত থাকে। আলজেরিয়া এবং ইয়েমেন ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেনি। আরব প্রতিনিধিরা সম্মেলন কক্ষ থেকে যাওয়ার সময় আরব লীগ সেক্রেটারি জেনারেল শাহ হোসাইনের পথ আগলে দাঁড়ান। শাহ তখন তার গাড়িতে বসতে যাচ্ছিলেন। সেক্রেটারি জেনারেল তাকে জিজ্ঞাসা করেন ইয়োর মেজিস্টি! আপনার ভোটটা কোন পক্ষে জানতে পারি কি? উত্তরে শাহ বলেন, আমার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করুন। এই বলে তিনি গাড়িতে উঠে বসেন। ইয়াসির আরাফাত তখনও সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। একতরফাভাবে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা সবসময় বেআইনিই হয়। আরাফাতের চিৎকারের জবাবে মিসরীয় কর্তৃপক্ষের কেউ অনুরূপ জোরদার আওয়াজে বললেন, এটা সম্পূর্ণ আইনি ও সংবিধানসম্মত। মিসরীয় পক্ষের আইন বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুফিদ শিহাবই ইয়াসির আরাফাতকে এ উত্তর দিয়েছিলেন। এ উত্তর শুনে জনাব আরাফাত রাগে-ক্রোধে চিৎকার কর বলে ওঠেন, তোমরা সবাই সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল, প্রতিউত্তরে ডক্টর শিহাব বলেন, তুমি যদি সাম্রাজ্যবাদীদের দালালদের দেখতে চাও তবে তোমার পিছনের সারিতে যারা বসে আছে তাদেরকে দেখ। তবে বুঝতে পারবে প্রকৃত পক্ষে কারা দালাল।

প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারক এসময় প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে তালাশ করতে থাকেন। গাদ্দাফী তখন সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। হোসনী মুবারক তখন ভাই মুয়াম্মার কোথায়, ভাই মুয়াম্মার কোথায়?- বলে চিৎকার করতে থাকেন। কিছু সময় পর মুয়াম্মার গাদ্দাফী তার সামনে এসে উপস্থিত হন। ততক্ষণে হোসনী মুবারককে সাংবাদিকরা এসে ঘিরে ধরেছে। মুয়াম্মার গাদ্দাফী মুবারককে লক্ষ্য করে বলেন, বৈঠকে আপনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। উত্তরে হোসনী মুবারক বলেন, আপনাকে আমি এ ধরনের কথা বলার অনুমতি দিতে পারি না। সে মুহূর্তে কেবল গাদ্দাফিই তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন না ততক্ষণে আশেপাশে

অন্যরাও এসে ভিড় জমিয়েছে। অতপর তিনি এক কোনায় চলে যান এবং গাদ্দাফির সঙ্গেকানে কানে কথা বলতে শুরু করেন।

রাত ৯ টা ১০ মিনিট নাগাদ প্রাচ্যের আরব দেশগুলি অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বে আরবদের ইতিহাসে এ ধরনের পার্থক্য আর কখনও লক্ষ্য করা যায়নি।

উপসাগরীয় সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে আরবদের জন্য এটা ছিল সর্বশেষ সুযোগ। কায়রোয় আরব লীগের তত্ত্বাবধায়নে ইরাক কুয়েত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আরব রাষ্ট্রপতিদের সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবের চূড়ান্ত ফলাফল জাতিসংঘের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঐ ফলাফলে জর্ডানের নাম ঐসব দেশের সঙ্গে দেখানো হয় যারা ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেনি। ভোটাভুটিতে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ১০টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। অন্য নয়টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের ছিলনিজ নিজ নিজ রায়, ভোটাভুটির ফলাফল দেখে সহজেই অনুমান করে নেয়া যায়, আরববিশ্ব অভ্যন্তরীণভাবে দারুণ অনৈক্যের শিকার। প্রস্তাবের প্রধান প্রধান প্যারাগুলি ছিল নিম্নরূপ :

> তৃতীয় প্যারায় কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকি আগ্রাসনের নিন্দা করা হয়। ইরাকের সঙ্গে কুয়েতকে একীভূতকরণকে অস্বীকৃতি জানান হয়, আর দাবি জানানো হয় যে,ইরাকি বাহিনী যেন অনতিবিলম্বে ১লা আগষ্টের অবস্থানে ফিরে যায়।
>
> চতুর্থ প্যারায় কুয়েতের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে সবিবেশ গুরুত্বারোপ করা হয় এবং বলা হয় কুয়েতের সাবেক বৈধ সরকার পুন প্রতিষ্ঠা করা হোক। সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা পুন প্রতিষ্ঠায় কুয়েতকর্তৃক গৃহীত সম্ভাব্য সকল উদ্যোগের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা হয়।
>
> পঞ্চম প্যারায় উপসাগরীয় দেশগুলিকে দেয়া ইরাকি হুমকি ও সৌদি সীমান্তে ইরাকি সৈন্য মোতায়নের নিন্দা করা হয়। সেইসঙ্গে সৌদি আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলিকে সাহায্যের ঘোষণা দেয়া হয়। উক্ত প্রস্তাব অনুলিপিতে আরব লীগের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা, আর্থিক সহযোগিতা চুক্তির দ্বিতীয়

অনুচ্ছেদ জাতিসংঘ মেনিফেস্টোর ৫১ নং অনুচ্ছেদ, নিরাপত্তা পরিষদে মঞ্জুরকৃত ৬ই আগস্টের প্রস্তাবের উদ্ধৃতি দেয়া হয়। ঐ প্যারায় একথা খুব জোর দিয়ে বলা হয় যে, ইরাকের বিরুদ্ধে গৃহীত সকল পদক্ষেপ কেবল তখন বন্ধ করে দেয়া হবে যখন ইরাক কুয়েত থেকে তার সকল সৈন্য পিছে হটিয়ে নেবে এবং কুয়েতের প্রাক্তন আইনগত ও বৈধ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্যারাগ্রাফ নং ৬-এর ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের মাঝে যথেষ্ট মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এ প্যারাগ্রাফে বলা হয়, উপসাগরীয় ও সৌদি সরকারের অনুরোধে সকল আরব বাহিনী সৌদি বাহিনীকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে এবং সৌদি আরব যদি কখনও আগ্রাসনের শিকার হয় তবে আমেরিকা তার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। ওদিকে,ইরাকি প্রতিনিধি দল তেলে-বেগুনে জ্বলতে জ্বলতে কায়রো থেকে বাগদাদের উদ্দেশে রওনা হয়। তাদের ধারণায় প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারক তাদেরকে ষড়যন্ত্রের জালে আটকে ফেলেছিলেন, তাদের এ সন্দেহ ছিল অমূলক। মি. মুবারক অথবা অন্যকোন আরব রাষ্ট্রপতি তাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের জাল বোনেননি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের জালে আটকা পড়ে যায়। ইরাকিরা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে কুয়েতের উপর হামলা করে বসে। কুয়েত দখলের পর বিশ্বব্যাপী ইরাকের বিরুদ্ধে যে নিন্দাবাদের ঝড় ওঠে সে ব্যাপারেও ইরাকের অনুমান ছিল বাস্তব বিবর্জিত। একবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার জন্য তেলের গুরুত্ব সম্পর্কেও সে সঠিক অনুমান অর্জনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ইরাকের এ কথাও জানা ছিল না সভ্যতার এ যুগে কোন দেশকে স্বীয় শক্তি বলে জবর দখল করার পরিণাম কত ভয়ংকর হতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শক্তির ভারসাম্যতায় যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সে ব্যাপারে ইরাকের অনুমান ছিল সম্পূর্ণ ভুল। ইরাক ভুলে গিয়েছিল তার এই সংকটের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর তার জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে না। ইরাকের এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয় যে, আরব শায়েখরা নিজ নিজ দেশের জনগণের ভয়ে কোন বিদেশী সৈন্য বাহিনীকে নিজেদের দেশে আমন্ত্রণের সাহস করবেন না।

ইরাক আক্রান্ত হওয়ার পথে

১০ই আগস্ট ১৯৯০-এর সন্ধ্যা পর্যন্ত আরববিশ্বে যে মারাত্মক বিপর্যয় আসছে সে বিষয়ে অনেকেই আগাম আঁচ করে নিয়েছিলেন। কারণ, এ ধারণা ক্রমান্বয়ে বদ্ধমূল হতে থাকে যে, উপসাগরীয় সংকটের ব্যাপারে পশ্চিমাদের মাত্রাতিরিক্ত নাক গলানোর প্রবণতা দেখে আরববিশ্ব রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এরপরও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলের মত পরিস্থিতি তখনও সৃষ্টি হয়নি। যদিও ফিলিস্তিনীরা পরে মার্কিন ভূমিকার বিরোধিতা করে; কিন্তু ইতিপূর্বে তারাও ছিল নিশ্চুপ। হাজার হাজার কুয়েতবাসী যারা ছিল তখন দেশের বাইরে তারাই কেবল ছিল তখন যুদ্ধের পক্ষে। কারণ, সম্ভাব্য আমেরিকা কর্তৃক ইরাকের উপর আক্রমণ ও প্রাক্তন কুয়েত সরকার পুনর্বহালের উপর তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল নির্ভরশীল। কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা, জনৈক কুয়েতী মন্ত্রী একজন আরব পর্যবেক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কী মনে হয় মার্কিনীরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে? আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস বর্তমানে যা কিছু হচ্ছে এর শেষ পরিণতি কিন্তু যুদ্ধ, যুদ্ধ ব্যতীত এ সংকট নিরসনের আর কোন উপায় নেই। উত্তরে ঐ আরব পর্যবেক্ষক বললেন আমি আপনার সঙ্গে একমত। প্রতি উত্তরে কুয়েতী মন্ত্রী বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি সদয় হন। আপনি আমাকে আশার জগতে ফিরিয়ে এনেছেন। কায়রো সম্মেলনের ফলাফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলি স্বস্তির নিস্বার্ত নিল, কারণ ব্যর্থ কায়রো সম্মেলন পশ্চিমাদের বৃহত্তর ঐক্যের জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পথ সুগম করে দিয়েছিল। অনেক আরবনেতা যুদ্ধ শেষে মন্তব্য করেছিলেন, কায়রো সম্মেলনের প্লান-প্রোগ্রাম মার্কিনীদের নির্দেশ ও স্বার্থকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছে। এ সম্মেলন পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে পূর্ব থেকে প্লান তৈরি করে রাখা ছিল। ঐ সকল আরব নেতারা আরও মনে করেন যে, এটা ছিল একটা সাজানো নাটক। আমেরিকার ইঙ্গিতেই তা মঞ্চায়িত করা হয়।

এই নাটকের পিছনে একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাহলো, সামরিক, অর্থনৈতিক ও কুটনৈতিকভাবে ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি করা। এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল। ১২ই আগস্ট ১৯৯০ ভিলাডিঅস্টাকে এডওয়ার্ড শেওয়ার্ড নাডজের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মি. জেমস বেকার সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে এই সহযোগিতা আদায় করতে সমর্থ হন। ওদিকে জাতিংসঘ নিরাপত্তা পরিষদকে আপন মর্জিমত পরিচালনা করা এবং

সৌদি আরবে মার্কিনী সেনা উপস্থিতির ব্যাপারে শাহ ফাহাদের সকল আপত্তি তিরোহিত করাও প্রয়োজন ছিল। একটি সম্মিলিত মিত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠার পূর্বে এসব উদ্দেশ্য হাসিল করা আমেরিকার জন্য ছিল অতীব প্রয়োজন। আমেরিকানরা এসব উদ্দেশ্য লাভে ধন্য হয়। ওয়াশিংটনের মতে নিরাপত্তা পরিষদের নজিরবিহীন ঐকমত্যের অর্থ হলো, পৃথিবীতে একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ফলে, মার্কিন রাজনীতিকরা একথা ভেবে মনে মনে আত্মতৃপ্তি লাভ করছিলেন যে, বিশ্বশান্তির স্বর্ণালী যুগ শুরু হবার দ্বার উন্মুক্ত হতে শুরু করেছে। শান্তির এ স্বর্ণালীযুগে কোন বৃহৎ শক্তির পক্ষ থেকে দুর্বলের উপর আগ্রাসনের কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

মার্কিন রাজনীতিকদের এ বিশ্লেষণের সঙ্গে অনেক আরবরা একমত ছিলেন না। তাদের ধারণায় পৃথিবীর কোন কিছুতে পরিবর্তন আসেনি। যদি পরিবর্তন এসে থাকে তা কেবল আমেরিকার নতুন বিশ্বব্যবস্থার ধরনে পরিবর্তন এসেছে। নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তে আমেরিকান প্রভাবের কারণ সম্পর্কে কারো অজানা ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের বাকি চার স্থায়ী সদস্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, বৃটেন এবং চীন কোন না কোনভাবে আমেরিকার ইশারায় চলতে ছিল বাধ্য। মি. গর্বাচেভের নতুন পররাষ্ট্রনীতি ও আমেরিকানির্ভর অর্থনীতির কারণে আমেরিকা তোষণনীতি গ্রহণে সে ছিল বাধ্য। চীনের জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধে ভেটো শক্তি প্রয়োগ ছিল অসম্ভব। কারণ, ১৯৮৯ সালে তিয়ানমিন' স্কোয়ারে সংঘটিত ঘটনার পর পশ্চিমাদের সহযোগিতা ও সমর্থন ছিল তার একান্ত কাম্য। বৃটেন তো শুরু থেকেই ছিল আমেরিকার পিছে পিছে। সব ব্যাপারে সে ছিল আমেরিকার সমর্থক। ফ্রান্স যদিও ছিল রক্ষণশীল মনোভাবের; কিন্তু আমেরিকার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক সমর্থন আদায় করা তার একার পক্ষে ছিল অসম্ভব ব্যাপার। অপরদিকে জাতিসংঘ মহাসচিব পাঁচ বড় শক্তির বারবার ঐকমত্য দেখে ছিলেন হয়রান। এ ব্যাপারে তার কিছুই করার ছিল না।

জাতিসংঘের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে হঠাৎ করে আমেরিকার তৎপর হয়ে ওঠার মহানুভবতা দেখে জাতিপুঞ্জের জেনারেল সেক্রেটারি মি. প্যারেজডিকুয়েলার আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারেননি। অথচ ১৯৭৭ সাল থেকে আমেরিকার জন্য ধার্যকৃত অর্থ সে জাতিসংঘকে প্রদানের ব্যাপারে সবসময় গড়িমসি করে এসেছে; কিন্তু ইরাক-কুয়েত সংকট সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার কাছে পাওনা ১৪৬ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ৫০ মিলিয়ন ডলার নগদ প্রদানে সে রাজি হয়ে যায়। এই

অর্থের চেক ৩রা আগস্ট সে জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করে। হঠাৎ করে আমেরিকার এ শুভ বুদ্ধির উদয় হলো কেন? উত্তর খুব সহজ! এ প্রক্রিয়ায় সে চেয়েছিল জাতিপুঞ্জ তার ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করুক। উপসাগরীয় সংকট যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল জাতিসংঘ মহাসচিব ততই চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। কারণ, তখন মিত্রজোটকে জাতিসংঘ বাহিনী হিসাবে পরিচয় দেয়া হচ্ছিল। যার সহজ অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এ যুদ্ধকে জাতিসংঘের যুদ্ধ আখ্যায়িত করা হবে। জাতিসংঘের মঞ্জুরকৃত প্রস্তাবগুলি মিত্রজোটের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল; কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মিত্রজোট তৈরির ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আদৌ ছিল না। এ কারণে মিত্রজোট জাতিসংঘের পতাকা অথবা জাতিসংঘ নির্ধারিত নীল ইউনিফরম কখনও ব্যবহার করেনি।

মি প্যারেজডিকুয়ার তার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেন, যাতে জাতিসংঘের মিত্রজোট ও প্রস্তাবগুলির মাঝে পার্থক্য বজায় থাকে; কিন্তু পরিস্থিতি ছিল তখন খুবই আশাহত। সংবাদমাধ্যম তখন বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিতে থাকে। সবাই জানত জাতিসংঘ ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে। তবে প্রশ্ন দাঁড়ায় মিত্রজোট তৈরির পিছনে উদ্দেশ্য কী ছিল? উপসাগরীয় সংকটে আমেরিকা যেভাবে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলে তা দেখে উপসাগরীয় দেশগুলির তুলনায় অন্যান্য আরবদেশ অধিক চিন্তিত হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, যে লাখ লাখ যুবক উপসাগরীয় সংকটে আমেরিকার দাদাগিরির বিরোধী তারা সবাই সাদ্দাম হোসেনের সমর্থক। অথচ বাস্তব অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইরাকের বাইরে সকল আরব জনগণ ইরাকি হামলার নিন্দা করেছে। তাদের সবার আন্তরিক কামনা ছিল ইরাকি বাহিনী কুয়েত থেকে চলে যাক। এমনকি যে ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে ইরাকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তারাও কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীর অপসারণ কামনা করেছিল। আসল কথা ছিল এই যে, আরবরা চেয়েছিল আমেরিকার দাদাগিরি ছাড়াই ইরাক-কুয়েত সমস্যাটির সমাধান হোক।

আরববিশ্বে গোপন কূটনীতির রয়েছে আপন ঐতিহ্য। উসমানি খেলাফতের যুগ থেকেই এ পদ্ধতি সেখানে বিশেষভাবে কার্যকর। গোপন সংবাদ প্রেরণ প্রক্রিয়া উসমানি খলিফার বিরুদ্ধে যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মামলুক শাসকবর্গ ও আরব শায়েখদের সঙ্গে শুরু থেকেই ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের গোপন সম্পর্ক ছিল। সম্ভবত এ কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরববিশ্বে নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে

ইংল্যান্ডের বেগ পেতে হয়নি। যেসব আরব সর্দার ও শায়েখদের ইংল্যান্ডের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের সহযোগিতায় আরব দুনিয়ায় বৃটিশরাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। গোপন কূটনীতির সেই সনাতনী রীতি আজও আরব বিশ্বে বলবৎ রয়েছে। এই রীতিই কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রান্ত হবার কিছুদিন পর বুশ প্রশাসনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল এমন একজন ফিলিস্তিনি ব্যবসায়ী হোয়াইট হাউসে ফ্যাক্সের মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠান। বার্তাটি ছিল নিম্নরূপ :

> ৫ই আগস্ট রোববার ১৯৯০ ৪ টা থেকে ৭টা পর্যন্ত ইরাকের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নজর হাম্মাদুন আমার কাছে দু'বার ফোন করেছেন। তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক আজিজের পক্ষ থেকে আমাকে বাগদাদ যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমার নিজের নিরাপত্তা ও সাংসারিক কিছু ঝামেলার কারণে আমি তার কাছে আমার অপারগতা প্রকাশ করি। ইতােমধ্যে পিএলও নেতা জনাব ইয়াসির আরাফাত যিনি আজকাল কুয়েত-ইরাক সংকট নিষ্পত্তির একটি মিশনে কাজ করছেন তিনিও আমাকে ফোন করে বাগদাদ যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি তাকেও আমার অক্ষমতার কথা জানিয়েছি এবং প্রস্তাব দিয়েছি যে, লন্ডনের নিকটবর্তী কোন এক জায়গায় আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। সোমবার নজর হাম্মাদুন আমাকে দ্বিতীয়বার ফোন করে বলেছেন, আমি যেন অবশ্যই বাগদাদ যাই; কিন্তু আমি ছিলাম আমার কথায় অবিচল। ইতোমধ্যে আমাকে রিচার্ড মফীর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, এই মুহূর্তে আমার বাগদাদ অথবা ওয়াশিংটন যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপ বাগদাদে আমেরিকান দূতাবাস অথবা আমেরিকায় ইরাকি দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখারও কোন দরকার নেই। এজন্যই আমি ফ্যাক্সের মাধ্যমে এ সংবাদ পাঠাতে বাধ্য হলাম। সোমবার সন্ধ্যায় ইয়াসির আরাফাত আমাকে আবার ফোন করেছেন এবং প্রস্তাব দিয়েছেন যে, আগামী দিন আমি যেন তার সঙ্গে ভিয়েনায় সাক্ষাৎ করি।

সেদিন তার অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন চ্যান্সেলর 'ক্রনোক্রেসীর' অন্তেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের কথা। মঙ্গলবার ৭ই আগস্ট ভিয়েনায় আমি চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সাক্ষাতের সময় তিনি আমাকে সাদ্দামের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনার বিষয় অবহিত করেন। সে সময় তারা উভয় এ ব্যাপারে একমত হন যে, বাগদাদ ও ওয়াশিংটনের মাঝে যোগাযোগের কোন মাধ্যম হওয়া উচিত। একাজের জন্য সেখানে আমার নাম প্রস্তাব করা হয়। পিএলও চেয়ারম্যান তার উদ্বিগ্নের কথা আমাকে জানিয়ে বলেন, পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কালবিলম্ব না করে এই মুহূর্তেই কিছু করা দরকার। ইয়াসির আরাফাত আরও বলেন, কারো পক্ষপাতিত্ব থেকে আমি নিজেকে বিরত রাখতে চাই। উল্লেখ্য, এসব কায়রো সম্মেলনের আগের কথা। উক্ত ফিলিস্তিনি ব্যবসায়ীর ভাষ্য অনুযায়ী ইয়াসির আরাফাত তাকেনিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী ওয়াশিংটন পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

১. ইরাকি সৈন্যরা কুয়েত খালি করে দিতে প্রস্তুত।
২. সাবাহ পরিবারের ক্ষমতা পুনর্বহাল করা হবে।
৩. বুবিয়ান দ্বীপ ও কুয়েতের বিতর্কিত উত্তরাঞ্চলে ইরাকি বাহিনী মোতায়েন থাকবে।
৪. ইরাকের দাবি অনুযায়ী তার ঋণ মওকুফ করে দিতে হবে এবং তাকে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৫. ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার সঙ্গে তেলের ব্যাপারে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে আগ্রহী।

ঐ ফিলিস্তিনী ব্যবসায়ীর বক্তব্য মতে ইয়াসির আরাফাতের ধারণা ছিল, কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই যদি কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। এরমধ্যে ইরাকের উপর ইরানি সন্ত্রাসীদের সম্ভাব্য আক্রমণকে মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। আরাফাতের মতে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের পূর্বে কুয়েতে অস্থায়ীভাবে আরব লীগের সৈন্য মোতায়েন করা আবশ্যক।

উক্ত ফ্যাক্সে ফিলিস্তিনী ব্যবসায়ী বলেন, অবস্থা এতোই বিস্ফোরণোন্মুখ যে, আমি নিজের মতামত সম্পর্কে এখানে কিছুই আলোচনা করতে পারছি না। পরিস্থিতি যেদিকেই গড়াক আমি অনুভব করছি চেয়ারম্যান আরাফাত ঐ সকল ব্যক্তির

একজন যারা যে কোন মূহুর্তে ইরাকি নেতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এই তমশাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে তিনিই আমাদের একমাত্র আলোকবর্তিকা। তিনিই পারেন বাগদাদও ওয়াশিংটনের মাঝে কোন সমঝোতা করাতে। প্রয়োজনে আমিও ওয়াশিংটন আসতে প্রস্তুত। উপরে বর্ণিত গোপন ডিপ্লোমেসীর কোন সুফল পাওয়া যায়নি। কারণ, আমেরিকার পক্ষ থেকে ঐ ফ্যাক্সের কোন ইতিবাচক সাড়া দেয়া হয়নি। প্রেসিডেন্ট বুশের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, আলাপ আলোচনার দ্বারা এ সমস্যার কোন সমাধান হবে না। স্মরণ করা যেতে পারে, শেষ পর্যন্ত সাদ্দাম হোসেন কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মতি প্রকাশ করেন। তার কেবল একটাই দাবি ছিল- অধিকৃত কিছু কিছু অঞ্চলের উপর তার কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম নিজেও উপসাগরীয় সংকটের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করছিলেন। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ৬ই আগস্ট ১৯৯০ ইরাকে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত 'এপ্রিগ্লাসপী'র অবর্তমানে তার সহকর্মী জোসেফ উইলসান'কে ইরাকি নেতা তার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করেন। কেবল তাই নয়, জোসেফ উইলসানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ইরাকি নেতা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, তিনি মার্কিন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির পুরোপুরি খেয়াল রাখতে প্রস্তুত। তিনি আরও বলেন, ইরাক আমেরিকার সঙ্গে দ্বন্দ্ব চায় না। সাদ্দাম বলেন, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোন বিষয়ে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। অতএব আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের নিন্দার জন্য আমরা আমেরিকার ব্যাপারে মোটেই অবাক হয়নি; কিন্তু আমি আশা করব আমেরিকা এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না, যার ফলে আমরা বর্তমান ও ভবিষ্যতে সংঘাতের কষাঘাতে জর্জরিত হই।

কুয়েত সংকটের ব্যাপারে সাদ্দাম বলেন, আমি এ বিষয়ে তিনটি জিনিস পরিষ্কার করে দিতে চাই।

১. কুয়েত এমন একটি দেশ যার নিজস্ব কোন সীমান্ত নেই, ১৯৬১ সাল থেকে আমরা প্রত্যেকে কুয়েতকে পৃথক দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেইনি।
২. ইরাক ও সৌদি আরবের মাঝে ১৯৫৭ সাল থেকে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রয়েছে। এই সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই মার্কিন স্বার্থের পরিপন্থী নয়। সাদ্দাম বলেন, আমার ভাবতে অবাক লাগে হঠাৎ এ ধারণা কেন জন্য নিল যে, ইরাক সৌদি আরবের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে যাচ্ছে। সৌদি আরবের জন্য ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে হ্যাঁ,

> তাকে যদি ইরাকি স্বার্থের পরিপন্থী কোন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উস্কানী দেয়া হয় তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে তিনি সৌদি আরবের সঙ্গে যুদ্ধ না করার চুক্তির কথা পুনউল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইরাকের উদ্যোগেই এ চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল। তবে কুয়েতের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, শুরু থেকেই কুয়েত ইরাকের অংশ ছিল কিন্তু সৌদি আরব! তারা সর্বদাই একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ।

ইরাকি নেতা মার্কিন সহকারী রাষ্ট্রদূতকে আরও বলেন, অতীতেও সৌদি আরবের সঙ্গে ইরাকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় সৌদি আরব ইরাকি তেল পাইপ লাইনের সাহায্যে লোহিত সাগর পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দিল । তেল সরবরাহের এই পরামর্শও সৌদি আরব আমাদের দিয়েছিল অথচ বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনারা আমাদের সম্পর্ক খারাপ করতে আদাজল খেয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। সৌদি আরবের ব্যাপারে আসলেও যদি আপনারা চিন্তিত হয়ে থাকেন তবে আপনাদের সকল প্রকারের সংশয় দূর করে দিয়ে বলতে চাই, এ ব্যাপারে আপনাদের সব ধরনের সন্দেহ সব ধরনের সংশয় ভিত্তিহীন ও অমূলক। আর যদি "সৌদি সার্বভৌমত্ব বিপন্ন" এই মিথ্যা প্রোপাগান্ডা দ্বারা অন্য কোন উদ্দেশ্য হাসিল করতে চান তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

তৃতীয়ত যে বিষয়টি ইরাকি নেতা সহকারী মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সামনে পরিষ্কার করতে চান, তার বক্তব্য হলো- আমি কাউকে এ আশ্বাস কখনও দেইনি যে, ইরাক কখনও কুয়েতের উপর আক্রমণ করবে না। কারণ, ১লা আগস্টের পূর্বে কুয়েতের বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রকার সামরিক হামলা পরিচালনা করতে চাইনি। অথচ ইতিপূর্বে মিসরীয় নেতা হোসনী মুবারক দাবি করে বলেন যে, সাদ্দাম আমাকে অভয় দিয়ে বলেছেন, তিনি কখনও কুয়েতের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করবেন না। ইরাকের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল ১লা আগস্ট সৌদি আরবে অনুষ্ঠিতব্য আলাপ- আলোচনার ফলাফল ইতিবাচক, সুদূরপ্রসারী ও ফলপ্রসূ হবে; কিন্তু ইরাকের ভাইস প্রেসিডেন্ট যখন ফিরে এসে বললেন সৌদি আরব থেকে কুয়েত তার সিদ্ধান্ত থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ পিছু হটতে প্রস্তুত নয় তখন বল প্রয়োগ ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর রইল না।

কুয়েতের উপর কেন হামলা করা হলো তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাদ্দাম বলেন, আমরা আরব জাতি আমাদের স্বভাব হলো যখনই আমরা দেখব কেউ আমাদের

ক্ষতি করছে তখন আমরাও তার ক্ষতি সাধন করে ছাড়ব। আমরা আমাদের স্বার্থ রক্ষার্থে বারবার প্রচেষ্টা চালিয়েছি; কিন্তু তারপরও দেখেছি ইরাকের স্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। আমরা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ও আমেরিকার সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাদের কোন স্বার্থে আঘাত পড়েছে যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে? আপনারা একটি বড় শক্তি। আমি খুব ভাল করে জানি আপনারা আমাদের ক্ষতি সাধন করতে পারেন; কিন্তু একথা মনে রাখবেন আপনাদের সর্বশক্তিও নিয়োগ করেও আমাদের মাথা নোয়াতে পারবেন না। আপনারা আমাদের সকল সামরিক, আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও তেল কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করতে পারেন; কিন্তু মনে রাখবেন এর দ্বারা আপনাদেরই বেশি ক্ষতি হবে। এ অঞ্চলে আপনাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই নিশ্চুপ বসে থাকব না। আপনারা আমাদের শত্রু কেন হতে চান? অতীতে আপনাদের বন্ধুদের দুর্বল করে মারাত্মক ভুল করেছেন, আমি জোর দিয়ে বলব, আপনারা আমাদের স্বার্থে আর একবার সুযোগ দিন।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম বলেন, আমেরিকার স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন' মার্কিন প্রেসিডেন্টের একথা মোটেও ঠিক নয়; বরং আমি বলব ইদানীং গৃহীত তার বিভিন্ন পদক্ষেপই তার স্বার্থবিরোধী। তিনি আরও বলেন, আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা চাই; কিন্তু গোলামি কোন অবস্থাতেই বরদাশত করব না। আমরা গোলামির জীবনকে ঘৃণা করি। অতএব কোন অবস্থাতেই আমরা গোলামির জীবন গ্রহণ করতে পারি না। অনুরূপ আমরা ক্ষুধার্ত থাকতেও ঘৃণাবোধ করি। আমারা দেশের জনগণ হাজার বছর ধরে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করেছে। আমরা আর সেই যুগে ফিরে যেতে চাইনা। এটা হলো আমার নতুন ম্যাসেজ, এ ম্যাসেজ আমি প্রেসিডেন্ট বুশের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

উইলসন-সাদ্দাম আলোচনা ও শাহ হোসাইনের কূটনৈতিক মিশন

মি উইলসন ইরাকি নেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আপনার ম্যাসেজ প্রেসিডেন্ট বুশকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। এসময় জোসেফ উইলসনকে রাষ্ট্রদূত এপ্রিলগ্লাসপী থেকেও বেশি আশাবাদী মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন, কেবল ইরাক-আমেরিকা সম্পর্কের খাতিরেই নয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার প্রশ্নেও বর্তমান সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইরাকি নেতা তার কাছে জানতে চান কি কারণে বর্তমান সময়টা গোটা পৃথিবীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ? উত্তরে মি. উইলসন বলেন, দেখতেই পাচ্ছেন আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে কেমন ধ্বংসাত্মক ধস নেমেছে। প্রতিউত্তরে সাদ্দাম বলেন, মি। উইলসন! এটা আবার আপনি কেমন কথা বললেন? আপনার কি মনে নেই আপনারা আপনাদের স্বার্থে তেলের আন্তর্জাতিক মার্কেট নষ্ট করেছেন? আমরা প্রতি ব্যারেল তেলের মূল্য ২৫ ডলার মেনে নিয়েছিলাম; কিন্তু তারপরও আপনাদের ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি। আপনারা অন্যদের তেলের মূল্য কম করতে প্ররোচিত করেন। এটা তো এমনই একটা ব্যাপার যে, কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে জোর করে কিছু আদায় করে নেওয়া। একথা শুনে মি. উইলসন বলেন, স্যার আমি দুখিত। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি মনে হয় আপনার কোন দুর্বল জায়গায় আঘাত করে বসেছি। মহামান্য রাষ্ট্রপতি! পরিস্থিতি যাইহোক আমি মনে করি আমাকে আপনাকে আমাদের সবাইকে বাস্তববাদী হতে হবে। আমাদের অনুমান হতে হবে বাস্তবনির্ভর। তাহলেই কেবল আমাদের জন্য আবেগ মিশ্রিত বর্তমান পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। মি. উইলসন ইরাকি নেতার কাছে জানতে চান, আপনি কি বাস্তবিকই মনে করেন, কুয়েত ইরাকেরই অংশ? উত্তরে সাদ্দাম বলেন, ঐতিহাসিকভাবে আমাদের দাবি সত্য। তিনি আরও বলেন, মি. উইলসন! আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক সৌহার্দের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ কথা শুনে মি. উইলসন বলেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি! পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে আপনি যে কথা বললেন, আমরা কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইরাক-কুয়েত সম্পর্কের মাঝে এসব নীতিকথার প্রতিফলন দেখতে পারছি না। উত্তরে সাদ্দাম বলেন হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক। গত এক সপ্তাহ ধরে আমাদের সম্পর্কে দারুণ অবনতি ঘটেছে। মি. উইলসন বলেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি! আমি চাই আপনি আমাদের আশ্বস্ত করুন যে, কুয়েতের পর

ইরাক সৌদি আরব দখল করবে না। উত্তরে সাদ্দাম বলেন, আপনি প্রেসিডেন্ট বুশকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, ইরাক সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বলপ্রয়োগের দুরভিসন্ধি পোষণ করে না। তিনি বলেন, যারা আমাদের উপর হামলা না করবে আমরা তাদের উপর হামলা করব না, যারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের মনোভাব পোষণ করবে আমরা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সর্বাগ্রে হস্তপ্রসারিত করব। এ সময় জোসেফ উইলসন কুয়েতে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাস কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি উত্থাপন করেন, উত্তরে সাদ্দাম তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, মার্কিন দূতাবাস কর্মচারী ও মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে। কুয়েত থেকে সৈন্য অপসারণের ব্যাপারে ইরাকি নেতা বলেন, কুয়েতে প্রবেশ করতে আমাদের সময় লাগে তিনদিন। অতএব একদিনের ভিতর কুয়েত খালি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত ইরাকি সেনা অপসারণের বিষয়টি সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক অবস্থার উপর নির্ভর করছে। আমরা কুয়েতকে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা যদি তাকে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেই, তবে যেকেউ দেশটিকে গ্রাস করতে পারে। তৃতীয়ত আমেরিকা যদি এ ব্যাপারে নাক গলানোর চেষ্টা করে, তবে কুয়েত থেকে সৈন্য অপসারণের বিষয়টি জটিল হয়ে পড়বে। তিনি আরও বলেন, কুয়েত যদি কখনও হুমকির সম্মুখীন হয় তবে আমরা সেখানে আমাদের সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলব। হুমকির গতি যে হারে বৃদ্ধি পাবে আমরা ঠিক সে হারে আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলব। তিন থেকে ছয় আগস্টের মধ্যবর্তী সময় ইরাকি নেতা ইঙ্গিত দেন, কুয়েত থেকে দ্রুত সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য আরব রাষ্ট্রপতিদের খুদে সম্মেলনের

ব্যাপারে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। সাদ্দাম হোসেন কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের নিদর্শনস্বরূপ কুয়েত থেকে কিছু সংখ্যক সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন। এ উদ্দেশ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি আমেরিকার কাছে একটি গোপন সংবাদ প্রেরণ করেন; কিন্তু আমেরিকার ধারণা ছিল, ইরাক-কুয়েত সমস্যাটি আরো দীর্ঘায়িত করার জন্য সাদ্দাম হোসেন এ ধরনের রাজনৈতিক চাল চালছেন। তবে এ বিষয়ে বাস্তব সত্য যে কি- সে বিষয়ে সঠিক ধারণা পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। যদিও কায়রো সম্মেলনের পর ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেন সৌদি আরব ও মিসরের জনগণকে নিজ নিজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য উস্কানী দিয়েছিলেন। এছাড়া এ দাবিও করেছিলেন যে, কুয়েত ইরাকেরই অংশ; কিন্তু তারপরও সাদ্দামকে এ অপবাদ দেয়া যায় না যে, তিনি

উপসাগরীয় সংকট নিরসনে আরবদের সর্বশেষ প্রচেষ্টা ভণ্ডুল করে দিয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ, কায়রো সম্মেলনের পূর্বে যদি তিনি এ ঘোষণা দিতেন তবে তাকে এ অপবাদ দেয়া যেত যে তিনি ইরাক-কুয়েত সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে আরবদের উদ্যোগে গৃহীত সর্বশেষ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ১২ই আগস্ট ১৯৯০ উপসাগরীয় সংকট মারাত্মক ঘোলাটে রূপ ধারণ করে। সাদ্দাম এই সংকট সম্পর্ক কুয়েতের পরিবর্তে ইসরায়েলের সঙ্গে জুড়ে দেন। ঐদিন ইরাক থেকে একটি সরকারি বিবৃতি প্রদান করা হয়। ঐ বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত জাতিসংঘে যেসব প্রস্তাব পাস করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিকে কার্যকর করা হোক। অর্থাৎ নিঃশর্তভাবেসে অধিকৃত আরব অঞ্চল খালি করে দিক। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটাই মনে করা হয় যে, এ বিবৃতির উদ্দেশ্য ইসরায়েল যদি অধিকৃত আরব এলাকা খালি করে দেয় তবে ইরাক কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে, অন্যথায় নয়। অধিকাংশ পর্যবেক্ষকের ধারণা এই বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে সাদ্দাম হোসেন আরব ও পশ্চিমা নেতাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমারাও শুরু থেকে ইরাককে একটি চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল প্রস্তুত, আগামীতে যেন কেউ এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের কল্পনাও না করতে পারে। তাদের মতে এ মুহূর্তে ইরাককে একটি উচিত শিক্ষা দেয়া ছিল খুবই প্রয়োজন। অন্যদিকে ইরাকের আচরণ ছিল

বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দেশটি একের পর এক কুয়েত থেকে সম্মানজনক প্রত্যাবর্তনের সকল রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যকথা ক্রমান্বয়ে তারা পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়ছিল। ভাব-লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছিল, বর্তমান ভয়ংকর পরিস্থিতির সঠিক অনুভূতিও তাদের নেই। কুয়েত থেকে সৈন্য অপসারণে দেশটি প্রস্তুত ছিল কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। তবে রমলা অয়েল ফিল্ড এবং সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপগুলি খালি করার জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। ইত্যবসরে ইরাক তার আর্থিক সংকটের একটি সমাধান খুঁজে বের করেছিল। আর্থিক সংকট তার জন্য এখন আর কোন সমস্যাই ছিল না। কারণ, কুয়েত দখল করার পর কুয়েত স্টেট ব্যাংক থেকে সে ২০ হাজার কোটি ডলার মূল্যের নগদ অর্থ ও স্বর্ণ বাগিয়ে নিয়েছিল।

১২ই আগস্ট জর্ডানের শাহ হোসাইন একটি কূটনৈতিক মিশনে পশ্চিমা দেশগুলির উদ্দেশে রওনা হন। অনেকের ধারণা ছিল সাদ্দাম হোসেনের ম্যাসেজ পৌঁছানোর জন্যই তিনি পশ্চিমে সফর করেন। তবে শাহ হোসাইন একথা

অস্বীকার করে বলেন, এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি যতই অস্বীকার করুক না কেন প্রত্যেকের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, ইরাক ও পশ্চিমাদের মধ্যে একটি আপোষের জন্য শাহ হোসাইন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় শাহ বলেন, আমেরিকানদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমনের পরিবর্তে তা আরও বৃদ্ধি পাবে। উত্তরে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার জন্য আমরা নয় অন্য কেউ দায়ী, তারা সেখানে উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে চায়। জর্ডানি শাহের তখন বুঝতে বাকি রইল না, অতীতের তুলনায় বর্তমানে মি. বুশের ভাবমূর্তি অনেক বেশি মারমুখী। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, আমরা জর্ডানের আর্থিক অসুবিধার কথা জানি। এ ব্যাপারে সৌদি আরব এবং অন্যরা তাকে সাহায্য করতে পারে। উত্তরে শাহ বলেন, এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি এখানে আসিনি। এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য শান্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমি এখানে এসেছি।

'মি হোসাইন! আমাদের জীবন তেলের উপর নির্ভর। আমি তাকে(সাদ্দাম) উপসাগরের দুই তৃতীয়াংশ তেল কুক্ষিগত করে রাখার অনুমতি দিতে পারি না। এ সেই ব্যক্তি যে আমেরিকার কট্টর দুশমন। সে আমাদের নরম জায়গায় আঘাত হেনেছে। তোমরা আরবরা বারুদের ¯তুপের উপর বসে আছ। এ ব্যক্তি তোমাদের জন্য ভীতির কারণ, সে আমাদের জন্য মোটেও ভীতির কারণ নয়। তবে সে যেখানে বাস করে তার আশপাশে আমাদের অনেক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। আমরা আমাদের স্বার্থ কখনও বিঘ্নিত হতে দেব না।' বলেন উত্তরে প্রেসিডেন্ট বুশ।

শাহ হোসাইন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলেন, সাদ্দাম কুয়েত খালি করে দিতে চায়। তাছাড়া বেশকিছু শর্তে সৈ্যে প্রত্যাহারেও সম্মত তারা।

উত্তরে বুশ বলেন, শর্তসাপেক্ষ সৈন্য প্রত্যাহার! না, না, হোসাইন তা হয়।আমরা এ রকম সৈন্য প্রত্যাহার চাই না। সে যদি সত্যিই সৈন্য প্রত্যাহারে প্রস্তুত থাকে তবে নিঃশর্ত সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে হবে। সাদ্দাম কেবল আমেরিকার সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়নি; বরং সে নতুন বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধেও কাজ করে যাচ্ছে।

এদিকে শাহ হোসাইন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করেন; কিন্তু তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরে জর্ডানিশাহ তার দেশের পার্লামেন্টকে বলেন, একটি টেলিফোন কলের কারণে মি. বুশের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।

এই টেলিফোন কলটি ছিল মিসরীয় নেতা হোসনী মুবারকের। মি. বুশ শাহ হোসাইনকে জানান, আপনাদেরই এক সঙ্গী আমাদের উপর প্রেসার দিচ্ছে, কালবিলম্ব না করে আমরা যেন তাড়াতাড়ি ইরাকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

আমেরিকায় ব্যর্থ সফর শেষ করে শাহ হোসাইন ইংল্যান্ড চলে যান। সেখানে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে উভয়নেতার সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু হয়। থ্যাচার জানতে চান, এই মুহূর্তে তিনি মানুষরূপী শয়তান সাদ্দামকে কেন সহযোগিতা করছেন? উত্তরে শাহ বলেন, আমি কারও সহযোগিতা করছি না। আমি কেবল আমার ভূখণ্ডের আশপাশে শান্তি বলবৎ রাখতে চাই।

মিসেস থ্যাচার তাকেপ্রশ্ন করে বলেন, আপনার অঞ্চলে শান্তিতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে কে? শাহ হোসাইনের মত একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদও তার এ প্রশ্নে ক্ষণিকের জন্যে হলেও বিচলিত হয়ে পড়েন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, মিসেস থ্যাচার! আমি আপনার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতে চাই। বল প্রয়োগের রাজনীতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে শেষ হয়ে গেছে। এ উত্তর শুনে মার্গারেট থ্যাচারের সুন্দর চোখ দু'টি রাগে লাল হয়ে ওঠে। অনেকটা চিৎকারের স্বরে তিনি বলেন, মি. হোসাইন! আপনি পরাজিত ব্যক্তির সহযোগিতা করছেন। রাগান্বিত অবস্থায় তিনি বলেন, আমি আগেই আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই সাদ্দাম হোসাইন হলো স্বৈরাচার।

এই সাক্ষাতের পর শাহ হোসাইন ও মিসেস থ্যাচারের সম্পর্কের এখানেই ইতি হয়। পরে জর্ডানি নেতা বলেন, মিসেস থ্যাচার এমন একজন মহিলা যার শরীর থেকে তার জিহ্বা লম্বা বেশী।

৩রা সেপ্টেম্বর শাহ হোসাইন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রেসিডেন্ট মি. মিতরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মি. মিতরার আচার-আচরণ ও কথাবার্তা ছিল তুলনামূলক অনেক নমনীয়। তিনি বলেন, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড একটি লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, কুয়েত খালি করে দেয়াটাই এই মুহূর্তে সাদ্দামের জন্য উত্তম কাজ হবে। এই প্রক্রিয়ায় আমেরিকাকে বল প্রয়োগ থেকে বিরত রাখা সম্ভব। মিত্রজোটে তিনি শরিক হবেন কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, সকল আরব দেশ মিলে যদি কোন একক ও অভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণ করে তবে তিনি তার করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতে পারেন।

মার্কিন ইহুদী নেতাদের সঙ্গে সৌদি সরকারের গোপন যোগাযোগ

শাহ হোসাইন দুখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আম্মান চলে আসেন। তিনি ছিলেন তার মিশনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, পশ্চিমারা মনে করছিল তিনি সাদ্দামকে বাঁচাবার প্রয়াস চালাচ্ছেন। সৌদি নেতাদেরও অভিমত ছিল এরকম। শাহ হোসাইনের আমেরিকা সফরের পর সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স বন্দর-এর একটি খোলা চিঠি আমেরিকার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ চিঠিতে শাহ হোসাইনের ব্যাপারে বলা হয়, তার এ বক্তব্য ঠিক নয় যে, কুয়েত-ইরাক সীমান্ত সমস্যা একটি বিতর্কিত বিষয়। প্রিন্স শাহের বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, এ বক্তব্য যেমন ঠিক নয় তেমনি এ বক্তব্যও সঠিক নয় যে, এ সমস্যা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সৃষ্টি করা একটি সমস্যা।

শাহ ফ্রান্স সফরের সময় প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইরাক কুয়েত খালি করে দিক তদস্থলে সেখানে আরবলীগ সৈন্য মোতায়েন করা হোক। সেই সঙ্গে ইরাকের বিরুদ্ধে আরোপিত সকল অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হোক। আর বুবিয়ানসহ আরব দ্বীপদ্বয়ে এবং বিতর্কিত অয়েল ফিল্ডে অস্থায়ীভাবে ইরাকি সৈন্য মোতায়েন থাকুক। এ সমস্যা সমাধানের পর ইরাক তার বাকি সৈন্যও সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নেবে। এছাড়া কুয়েত অধিবাসীদের অধিকার দেয়া হোক, তারা নিজেদের পছন্দমত সরকার বাছাই করুক। প্রেসিডেন্ট মিত্ররা মনে করতেন কুয়েতি জনগণ সাবাহ পরিবারকে পছন্দ করে না, এ কারণে তারা ইরাকি হামলার পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ফ্রান্স শাহ হোসাইনের দেয়া প্রস্তাব সমর্থন করে; কিন্তু সৌদি আরব এবং মিসর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতপর অন্যান্য আরব দেশও তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বর মাস সাদ্দামের জন্য ছিল একটি কঠিন মাস। কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তার জন্য কোন মুশকিল কাজ ছিল না। তিনি ভাবছিলেন এই মুহূর্তে যদি দুর্বলতার পরিচয় দেয়া হয় তবে মার্কিনীদের সামনে ইরাকের ভাবমূর্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। একারণে তিনি চাচ্ছিলেন, কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সময় ইরাককে আন্তর্জাতিক সিকিউরিটির জামানত দেয়া হোক।

১২ই আগস্ট ১৯৯০ সাদ্দাম প্রস্তাব দিলেন, কুয়েত সমস্যাকে আরব-ইসরায়েল সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত করা হোক। এই প্রস্তাবের কারণে তার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পায়। এই প্রস্তাবকে কেবল তারাই জোরাল সমর্থন জানাচ্ছিলেন যারা মার্কিন পরাশক্তির মুকাবিলায় এমন একজন শক্তিধর আরব নেতার স্বপ্ন দেখছিলেন যিনি

মার্কিন প্রভুর চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস রাখেন। সাদ্দাম যদি মনে মনে এ ধরনের কোন আকাঙ্খা পোষণ করে থাকেন তবে আগাম ফায়দা হাসিল করা ছাড়া কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার তার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত কোন দেন-দরবার না করে যদি সাদ্দাম কুয়েত খালি করে দিতেন তবে ইরাক সরকারের পজিশন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। তৃতীয়ত সাদ্দামের আচার-আচরণ ছিল তখন পরস্পরবিরোধী এবং অনেকটা বোধগম্যের বাইরে। তিনি তার ব্যক্তিচরিত্র বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলতে অভ্যস্ত। যে যেমন তার সঙ্গে তিনি তেমন ব্যবহার করেন। আরব ও মুসলিম জনগণের সমর্থন আদায়ের সময় তিনি হন অনলবর্ষী বক্তা; কিন্তু যখন তিনি আরব নেতাদের সম্পর্কে কথা বলেন, তখন তার কথার ধরন পাল্টে যায়। যখন তিনি পশ্চিমা নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তাকে খুব স্বাভাবিক মনে হয়। আর তখন তার সুরও হয় খুব নরম। সাদ্দামের এই বহুরূপী চরিত্রের কারণে তার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের ভিতরেও আস্তে আস্তে মতানৈক্যের দানা বাধতে শুরু করে। সেখানে কারো কারো ধারণা ছিল, সৌদি আরবকে রক্ষা করাই হলো আমেরিকার একমাত্র উদ্দেশ্য। ধারণা করা হচ্ছিল, কুয়েতে অবস্থিত ইরাকি সৈন্যদের উপর আমেরিকা অবশ্যই আক্রমণ করবে।

১১ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে প্রদত্ত প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষণ এ ধারণাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। মি. বুশ তার ঐ ভাষণে পরিষ্কার বলেন, আমরা কখনও সাদ্দামকে ইরাকের সঙ্গে কুয়েতকে একীভূত করার অনুমতি দিতে পারি না। কায়রো সম্মেলনের পর ইরাকি নেতার বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, বর্তমান সমস্যাটির সমাধান আরবদের পক্ষে সম্ভব নয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর শাহ হোসাইনের মিশন ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ অবহিত হওয়ার পর সাদ্দাম হোসেনের এই আশাও তিরোহিত হয় যে, সৌদি বাদশাহ শাহ ফাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বর্তমান সংকট নিরসন করা যেতে পারে। মার্কিনীদের চাপের মুখে উভয় নেতার এই সাক্ষাতের সম্ভাবনাও বিদূরিত হয়। শাহ হোসাইন ইরাকি নেতাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, এখন কুয়েত খালি করার প্রশ্ন নয়; বরং ইরাকের অস্তিত্ব সমুন্নত রাখাই বড় কথা। একথা শুনে সাদ্দাম তার এক সেনা কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আমি যদি কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেই তবে এর প্রতিক্রিয়া কী দাড়াবে? উত্তরে ঐ সেনা কর্মকর্তা বলেন- স্যার! আল্লাহর ওয়াস্তে এ ধরনের কথা মুখেই আনবেন না। এরপর শাহ হোসাইন সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে বেশি একটা জোর দিলেন না।

ইরাকিনেতার ধারণা ছিল, পশ্চিমা নেতারা খুব তাড়াতাড়ি মতানৈক্যের শিকার হয়ে পড়বে। নিদেনপক্ষে জার্মানী, জাপান এবং ফ্রান্স মার্কিন উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করবে। শাহ হোসাইন তাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন, স্বার্থের খাতিরে ওরা সবাই এক, আপনি এসব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিন। মনে রাখবেন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আপনি যেসব দেশের নাম নিলেন, যুদ্ধ শুরু হলে ওরা সবাই আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করবে। শাহ তাকে আরও বুঝালেন, কুয়েত খালি করার ব্যাপারে এবং জিম্মীদের রেহাই দেওয়ার ব্যাপারে আপনি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করুন। স্মরণযোগ্য, কুয়েত দখল করার পর হাজার হাজার পশ্চিমা নাগরিককে ইরাক কর্তৃক জিম্মি বানিয়ে রাখা হয়। এদের মধ্যে চার হাজার ছিল বৃটিশ নাগরিক আর দুই হাজার ছিল মার্কিন নাগরিক। সাদ্দাম ওদেরকে বিভিন্ন হোটেল এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে রাখতে চেয়েছিল। যাতে ওসব স্থানে আমেরিকানরা হামলা করতে না পারে। কুয়েত এবং ইরাকে ছিল ৫৩০ জন ফরাসী নাগরিক, ইরাকের ধারণা ছিল ফ্রান্স তার ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব পোষণ করবে; কিন্তু তার এই আশার গুড়ে বালি পড়ে তখন, যখন ১৫ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্স কর্তৃক ঘোষণা দেয়া হয় যে, আরও একটি ম্যাকনাইজড ব্রিগেড সৌদি আরব পাঠানো হবে। এই বিগ্রেড পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল সৌদি আরবে অবস্থানরত মিত্র বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা। ঐদিনই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্যারিসে অবস্থানরত ইরাকি এ্যাটাচি ও ১৫ জন আমলাকে ফ্রান্স ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। এসময় ইরাক অনুভব করে, সংকট নিষ্পত্তির সকল কূটনৈতিক পথ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইরাকের আশা ছিল, এ পরিস্থিতিতে সংকট নিরসনের ব্যাপারে জাতিসংঘ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পালন করতে সক্ষম হবে; কিন্তু তার এ আশা ও পূরণ হয়নি। তার আরও আশা ছিল, এই দুর্দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে অবশ্যই সহযোগিতা করবে। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯০ পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক আজিজকে মস্কো পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। দু'দিন পর তিনি মস্কো হাজির হলেন এবং এডওয়ার্ড শেওয়ার্ডনাডজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মি. নাডজে তার ইরাকি প্রতিপক্ষের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যাবহার করলেন। জানিয়ে দিলেন, মস্কো এই মুহূর্তে ইরাককে রাজনৈতিক সমর্থন দিতে অপারগ। তিনি বললেন, ইরাকের উচিত এই মুহূর্তে কুয়েত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়া। এ কথা শুনে তারেক আজিজ বললেন, ৪৫ বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সুনাম, সুখ্যাতি ও নির্ভরশীলতা অর্জন করেছে এ ধরনের বক্তব্য দ্বারা তা সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। উত্তরে মি. নাডাজে বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তন হয়েছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা আমাদের নতুন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। আশাহত পরিস্থিতির মাঝে উভয়নেতার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সমাপ্ত হয়।

১৫ই সেপ্টেম্বর মার্কিন বিমানবাহিনী প্রধান মাইকেল ডোগেন' এক বিবৃতিতে বলেন, যুদ্ধ যদি একান্তই হয় তাহলে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন, তার পরির্বা, উচ্চপদস্থ উপদেশটা পরিষদ ও সামরিক কমান্ডারদের বিশেষভাবে টার্গেট বানানো হবে। তিনি আরও বলেন, যুদ্ধের সময় পদাতিক বাহিনীর তুলনায় বিমারবাহিনীর উপর বেশি নির্ভর করা হবে। সামরিক ঘাটির তুলনায় বাগদাদের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রের উপর বিমান হামলা চালানো হবে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডিকচেনী মাইকেল ডোগেনের উক্ত বিবৃতির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং পরেরদিন তাকে চাকুরি হতে অব্যাহতি দেয়া হয়। ১৯৪৯-এর পর এই প্রথম মার্কিন জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের কোন সদস্যকে এভাবে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো। ইরাকিরা মনে করল, মিথ্যা বলার কারণে মাইকেল ডোগেনকৌ বরখাস্ত করা হয়েছে। তারা ভাবল মি. ডোগেন তার বিবৃতিতে যেসব কথা বলেছেন আমেরিকানরা আদৌ এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না; কিন্তু বাস্তবতা আমেরিকার সকল প্রোগ্রাম ফাঁস করে দেওয়ার কারণে কারনে মি. ডোগেনকে বরখাস্ত করা হয়।

২৩শে সেপ্টেম্বরের পর ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, যুদ্ধ শুরুর পর 'ইসরায়েলের উপর অবশ্যই ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত হানা হবে এবং এই যুদ্ধকে আরব ইসরায়েল যুদ্ধের মাপ দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। এমনটি সম্ভব হলে সহজেই আরবদের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হবে। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সৌদি আরবের তেল কেন্দ্রের উপরও হামলা করা হবে। যাতে পৃথিবীতে তেল সংকট সৃষ্টি হয়। এসব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য সরকারিভাবে বলা হয় যে, আমেরিকা যদি জংলি আচরণ কার্যকর করার চেষ্টা করে তবে প্রতিটি বিতর্কিত বিষয়কে এ যুদ্ধের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হবে। সেইসাথে মার্কিন হামলার দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হবে।

২৬শে সেপ্টেম্বর ইসরায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামির মি. বুশকে লিখলেন, ইরাকি ঘোষণার আলোকে আমি মনে করি সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। তিনি ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, ইরাক-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই যদি ইরাকি ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ধ্বংস করে দেয়া যায় তবে যুদ্ধের সম্ভাবনা একেবারেই তিরোহিত হওয়া সম্ভব। মি. বুশ উত্তরে বলেন, আপনি শান্ত থাকুন এবং এ

ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। আমরা জানি পরিস্থিতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। মি. বুশ ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামিরকে আরও বলেন, আপনারা এমন কোন কাজ করবেন না যাতে পশ্চিমা ও আরব দেশগুলির ঐক্যের মাঝে ফাটল ধরে। মার্কিন নেতা তাকে এ পরামর্শও দেন যে, বর্তমান সংকট থেকে ইসরায়েল নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখবে। ইতিহাসের এই ক্রান্তিকাল থেকে ইসরায়েলকে অবশ্যই ফায়দা লুটতে হবে। ইসরায়েলের জন্য এটা কি কম সুসংবাদের কথা যে, এই যুদ্ধে কোন ত্যাগ স্বীকার করা লগবে না অথচ দেখতে না দেখতে তাদের একটি শত্রু ধ্বংস হবে! শামিরকে খুশী করার জন্য এ পর্যায়ে বুশ তাকে আমেরিকা ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

সম্ভাব্য ইসরায়েলি হামলার কারণে পশ্চিমা ও আরবদেশ ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশংকায় সৌদি সরকার গোপনে আমেকিায় ক্ষমতাসীন ইহুদি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার নয় মাস পর অর্থাৎ জুলাই ৯১ তে এই তথ্য উদঘাটিত হয়। আমেরিকান ইহুদি কংগ্রেসের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মি. হেনরী সিগম্যান এই গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। তিনি স্বীকার করেন যে, গত নয় মাসে তিনি এবং অন্যান্য মার্কিন ইহুদি নেতারা কয়েকবার আমেরিকায় নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত মি. প্রিন্স বন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এসব সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি প্রিন্স বন্দরকে জিঙ্গেস করি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কি সৌদি আরব ও অন্যান্য আরবদেশ নিঃশর্তভাবে ইসরায়েলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবে এবং আগামীতে ইসরায়েল তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে? আপনি কি মনে করেন ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের পর সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম হবে?

মি. সিগম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী প্রিন্স বন্দর বলেন, আসলে আমি একথাই জানাতে চাচ্ছিলাম, কেবল আমরাই নই বরং সিরিয়াও আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত। হেনরী সিগম্যান বলেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি পুনরায় প্রিন্স বন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তার দেয়া আশ্বস্তমূলক বক্তব্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের কিছুদিনের জন্য সময় দেয়া হোক, আমরা এ ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছি।

নিরীহ ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরায়েলের বর্বর হামলা

১৮ই অক্টোবর জেরুসালেম শহরে এমন একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে যায়, যে কারণে বিশ্বব্যাপী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় ওঠে। এই ঘটনায় ২০ জন ফিলিস্তিনি শহীদ এবং ১৫০ জন আহত হন। ইহুদি সন্ত্রাসীদের একটি দল ধর্মীয় স্থানে তাদের দাবির সমর্থনে নির্মাণ কাজের বাৎসরিক অনুষ্ঠান চলাকালীন এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। কিছুসংখ্যক বিক্ষুব্ধ জনতার পাথর নিক্ষেপের জবাবে ইসরায়েলি সিকিউরিটি ফোর্সের জোয়ানরা তাদের উপর এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে ১২ই অক্টোবর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি নিন্দাপ্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়। এ হৃদয়বিদারক ঘটনা তদন্তের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি মিশন গঠন করা হয়, কিন্তু ইসরায়েল সরকার দলটিকে তাদের সীমান্তে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। মজার কথা হলো এই যে, অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে আমেরিকা এবার নিন্দা প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানায়। অথচ অতীতে এ ধরনের যে কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করে এসেছে তারা। এমন কথা ভাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে, দেরিতে হলেও মার্কিনীদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। আসল ব্যাপার ছিল এই যে, এই মুহূর্তে ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করে আরব-আমেরিকা ঐক্যের মূলে ফাটল ধরাতে মার্কিনীরা প্রস্তুত ছিল না।

২২শে সেপ্টেম্বর শাহ হোসাইন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের কাছে একটি চিঠি লেখেন, ঐ চিঠিতে তিনি লেখেন, আপনাকে এমন কথা বলা আমার জন্য কোন গর্বের ব্যাপার নয় যে, বর্তমান সমস্যার কোন আরব সমাধান সম্ভন নয়। আমার মনে হয় আপনাকে এ প্রশ্ন করার অধিকার আমার আছে যে, আপনি মূলত কী চান? আপনি যদি সত্য সত্যই এ সমস্যার কোন সমাধান চান তবে নমনীয়ও গ্রহণযোগ্য শর্ত পেশ করুন। এই চিঠি লেখার পূর্বে শাহ আলজেরিয়া ও মরক্কো সফর করেন। সেখানে তিনি শাহ হাসান ও শাজলী বিন জাদিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যদিও কুয়েত সংকটের কোন আরব সমাধানের সম্ভাবনা খুব কমই ছিল; কিন্তু তারপরও তিন নেতা এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। শাহ তার চিঠিতে পরিষ্কার ভাষায় জানতে চান, মি. সাদ্দাম পরিষ্কার করে বলুন সীমান্তের ব্যাপারে আপনার অভিপ্রায় কী? ঋণের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? সমুদ্র পথে তেল রপ্তানির জন্য আপনি কোন কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা কামনা করেন? এসব প্রশ্নের

নির্ভেজাল উত্তর পেলে আপনার উদ্দেশ্যে সিদ্ধির ব্যাপারে আমরা তিন নেতা মিলে ওয়াদা করছি, আমরা আমাদের সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। আমরা আপনার সমস্যাগুলো সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরব। তবে একটি কথা স্মরণ রাখবেন, শক্তিতে মদমত্ত হয়ে আপনি কারো ভূখণ্ড দখল করে রাখবেন পৃথিবী কখনো আপনাকে এ অনুমতি দেবে না।

শাহের এ চিঠির উত্তর তারেক আজিজের আম্মান সফরের মাধ্যমে দেয়া হয়। তারেক আজিজ বলেন, ইরাকি নেতা আপনার অব্যাহত প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার নজরে দেখেন। তার আন্তরিক কামনা, আগামীতেও আপনি আপনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। উত্তরে শাহ বলেন, আমার সাধ্যানুযায়ী আমি সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছি। তবে কথা হলো, কোন ব্যাপারেই যেন আমাদেরকে অন্ধ করে না রাখা হয়। ইরাকের পক্ষ থেকে তার এ কথার কোন উত্তর দেয়া হয়নি।

ইরাকের পক্ষ থেকে কোন সদুত্তর না পাওয়ার কারণে উক্ত তিন নেতা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতরার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মি. মিতরা ১০ই অক্টোবর একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ প্রস্তাবে সাদ্দামকে লক্ষ্য করে বলা হয় কালবিলম্ব না করে অতিসত্বর কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সিডিউল ঘোষণা করুন। সেইসাথে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে বলা হয়, তার পক্ষ থেকে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে বলে দেয়া হোক যে, মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সাদ্দামের একটি পুরাতন দাবিও পূরণ হয় যে, তিনি বারবার বলে আসছিলেন, কুয়েত সমস্যার সঙ্গে ফিলিস্তিন সমস্যারও সমাধান করা হোক। এ ঘোষণার মাধ্যমে ইরাক-কুয়েত সমস্যার ব্যাপারে একটি কূটনৈতিক সমাধান খুজেঁ বের করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়; কিন্তু ইরাক ও আমেরিকা উভয়ই এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ইরাকিরা পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করতে শুরু করে। জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আস্তে আস্তে অনুভব হওয়া শুরু হয়। বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্য বাগদাদ শহরের স্ট্রিটলাইটগুলির আলো কমিয়ে দেয়া হয়। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপরও কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পেট্রোলের কোটা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। ইরাক সরকার এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে যে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে ছিল খুবই উদ্বিগ্ন। তাই জনসাধারণের মধ্যে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে কী ধরনের বিরূপ

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে, সে বিষয়টি জানার চেষ্টা করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ছয়জন ইরাকি বুদ্ধিজীবির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সাদ্দাম সহদর ও ইরাক ইন্টালিজেন্সের প্রধান "ছবাহী আৎ তাকরিতী" উক্ত ছয়জন বুদ্ধিজীবিকে আলোচনার আমন্ত্রণ জানান। একাধারে তিনদিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মতবিনিময় বলবৎ থাকে। এই বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য একটি গ্রুপ তৈরি করা হয়। এই গ্রুপে ইরাকি প্রেসিডেন্টসহ তার কয়েকজন উপদেষ্টা শরিক হন। এদের মধ্যে চারজনের মতে ইরাক ছিল আশংকাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন। এজন্য কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার জরুরি। বৈঠকের তৃতীয় দিনে বুদ্ধিজীবীদের এমন সমাধান খুঁজে বের করার অনুরোধ জানানো হয় যার ফলে কোন লজ্জাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়ে সৈন্য প্রত্যাহার পর্ব চুকিয়ে ফেলা যায়। তারা বলেন, এ ব্যাপারে শাহ হোসাইনের দেয়া প্রস্তাব অধিক গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, সৈন্য প্রত্যাহারের পূর্বে ইরাকের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার গ্যারান্টি দেয়া হোক। ক্ষমতাসীন বাথ পার্টিও এসময় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মাঝেও অনৈক্যের ছায়া রেখাপাত করতে থাকে। কারো কারো তখনও ধারণা ছিল এখন যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই। অক্টোবরের মাঝামাঝি বাথ পার্টির একটি প্রতিনিধি দল ইয়েমেন সফর করে।

জনৈক ইয়েমেনী মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট বুশের ভাইয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয় সে সম্পর্কে উক্ত প্রতিনিধি দলটি অবহিত হয়। মি. বুশের ভাই ইয়েমেনী মন্ত্রীকে বলেন, এই মুহূর্তে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী নয়। বাথ পার্টির ধারণায় প্রেসিডেন্ট বুশের ভাই তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। তাই তারা ধরে নেন যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই। আরবদের গোত্রকেন্দ্রিক সমাজে এটা সম্ভব যে, গোত্র প্রধানের ভাই তার সব ব্যাপারে অবহিত হবেন; কিন্তু আমেরিকার গণতান্ত্রিক সমাজে এটা জরুরি নয় যে, মি. বুশের সব ব্যাপারে তার ভাই খবর রাখবেন।

অক্টোবরের শুরুতে মি. গর্বাচেভের বিশেষ দূত মি. প্রেমাকোফ বাগদাদ সফর করেন। এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল উপসাগরীয় সংকটের কোন কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করা যায় কিনা সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা। মি. গর্বাচেভ কঠোর ভাষায় সাদ্দামের কাছে ম্যাসেজ পাঠান যে, কালবিলম্ব না করে অতিসত্বর কুয়েত থেকে যেন সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং কুয়েতের সার্বভৌমত্ব যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫ই অক্টোবর সাদ্দাম প্রেমাকোফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাধারণ কথাবার্তার পর ইরাকি নেতা তার কাছে তিনটি প্রশ্ন করেন-

১. সৈন্য প্রত্যাহারের পর আমাদের আঞ্চলিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি কে দেবে?
২. ইরাকের জনগণ ও সরকারের হেফাজতের দায়িত্ব কে নেবে?
৩. অধিকৃত আরব অঞ্চলে ফিলিস্তিনীদের হেফাজতের কী ব্যবস্থা নেয়া হবে?

উত্তরে মি. প্রেমাকোফ বলেন, আমরা কোন প্রকার গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত নই। প্রতি উত্তরে সাদ্দাম বলেন, আমেরিকা ইরাককে ধ্বংস করার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। প্রেমাকোফ তাকে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হলে মার্কিনীরা যুদ্ধের কোন অজুহাত খুঁজে পাবে না। অতএব হতে পারে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর নাও হতে পারে। মি. প্রেমাকোফের এসব আশাব্যঞ্জক কথার উপর নির্ভর করে সাদ্দাম সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। মি. প্রেমাকোফের বাগদাদ সফরের আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল, ইরাকে অবস্থানরত ৭৮৩০ জন সোভিয়েত নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা। সাদ্দাম তাকে প্রতি মাসে ১ হাজার ৫০০ সোভিয়েত নাগরিক ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। ঐদিন সন্ধায় মি. প্রেমাকোফ ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার অনুরোধেই মি. আরাফাত ঐদিন বাগদাদ পৌঁছেছিলেন। ফিলিস্তিনী নেতা তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ইরাককে ধ্বংস করে ফিলিস্তিনীরা কখনও নিজেদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেবে না। দুইদিন পর মি. প্রেমাকোফ প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভকে তার রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি তার রিপোর্টে প্রস্তাব করেন যে, ইরাকের উচিত এই মুহূর্তে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া। সৈন্য প্রত্যাহার পর্ব শুরু হলে পর আরব-ইসরায়েল বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে প্রচেষ্টা শুরু করা যেতে পারে।

১৯শে অক্টোবর একটি সোভিয়েত প্রতিনিধি দল সাদ্দামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মি. প্রেমাকোফের প্রস্তাবগুলি তার সামনে পেশ করে কিন্তু সাদ্দাম তাদের প্রস্তাব মানতে অস্বীকৃতি জানান। প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষায় সাদ্দামের মতিগতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি। তিনি প্রেমাকোফকে বলেন, আপনি সাদ্দামের ব্যক্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করুন তবে বুঝবেন তিনি কেমন চরিত্রের মানুষ। এরপর পাঁচজন

আমেরিকান বিশেষজ্ঞের অভিমত সম্পর্কে তাকে অভিহিত করা হয়। আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের মতে সাদ্দাম হলেন একজন আতংক সৃষ্টিকারী ও অত্যাচারী ব্যক্তি। আর মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতে তিনি ভয়ংকর, আতঙ্কজনক, ধোঁকাবাজ ও রক্তপিপাষু ব্যক্তি। মার্কিন নেতা এ ধরনের উপাধিতে সাদ্দামকে বারবার স্মরণ করেছেন। সাদ্দাম সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করার পর তার পক্ষ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার আশা কীভাবে করা যায়?

মস্কো ফেরার পথে মি. প্রেমাকোফ লন্ডনে যাত্রাবিরতি করেন এবং প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। একঘণ্টা স্থায়ী ঐ বৈঠকে মিসেস থ্যাচার ইরাকের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস করার ব্যাপারে বক্তব্য দিতে থাকেন। তার মতে এখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোন গতি নেই। মি. গর্বাচেভের তখনও ধারণা ছিল, এ সমস্যার কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। মি. প্রেমাকোফের মিশন ব্যর্থ হওয়ার পরও তিনি তাকে আরেকবার মধ্যপ্রাচ্য সফরে পাঠান। সাদ্দামের সঙ্গে তার এবারকার বৈঠকে তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, মিত্রজোট হামলার জন্য প্রস্তুত। কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতেই থাকবে। সব শোনার পরও সাদ্দাম ছিলেন তার সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি তার সিদ্ধান্তে কোন প্রকার পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত ছিলেন না। তার ভাষায় কোন শর্ত ছাড়া সৈন্য প্রত্যাহারের অর্থ আত্মহত্যার শামিল। ইরাকের নিরাপত্তা, সৌদি আরব থেকে মিত্রবাহিনীর প্রত্যাবর্তন এবং ফিলিস্তিনীদের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রশ্নই আসে না। প্রেমাকোফ দামেস্ক, কায়রো এবং রিয়াদেও গেলেন। হোসনী মুবারকের সঙ্গে আলাপের সময় তিনি তাকে বললেন, ইরাক-ইরান যুদ্ধ থেকে তিনি কিছুই শিক্ষা লাভ করেননি। এ যুদ্ধে ইরাকের প্রতি সমর্থনের একমাত্র কারণ ছিল ইরানের ইসলামি বিপ্লবে আমেরিকা ছিল শঙ্কিত। আজ ১০ বছর পর ইরাক ইরানের ভূমিকায় অভিনয় করছে। আমেরিকা মনে করে ইরাকের বাড়ন্ত শক্তি মধ্য প্রাচ্যের তেল সাপ্লাইকে বিঘ্নিত করে তুলবে।

প্রেমাকোফের সফর শেষে প্যারিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মি. গর্ভাচেভ বলেন, এই মুহূর্তে আরব নেতাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করা উচিত। আরব রাষ্ট্রপতিদের তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, তারা যেন আর একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করে বর্তমান সমস্যার কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করে। আমেরিকা ছিল মি. গর্বাচেভের এই অভিমতের সম্পূর্ণ বিরোধী। ৩ শে অক্টোবর

মার্কিন স্ট্রেট ডিপার্টমেন্টের জনৈক মুখপাত্র বলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার মস্কোর কাছে মি. গর্বাচেভের উক্ত বিবৃতির ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছে। বিশেষ সোভিয়েত দূত মি. প্রেমাকফের বাগদাদ সফরের পূর্বে অষ্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট মি. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম বাগদাদ সফর করেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তিনি পশ্চিমাদের নজরে আস্থাভাজন ছিলেন না। কারন, তার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় যে, তিনি নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নাজি বাহিনীকে সহায়তা করেছিলেন। ফলে, তার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মি. ওয়াহ ইমর পর প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বাগদাদ সফর করেন। তার প্রচেষ্টায় ৫৯ জন বৃটিশ নাগরিককে ইরাক থেকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। মি: এডওয়ার্ড হেথ যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি সমাধান খুঁজে বের করার ছিলেন পক্ষপাতি। মি: হেথ আর্মড সার্ভিস কমিটির বৈঠকে যুক্তরাজ্য সরকারকে উপসাগরীয় সংকটে ব্যাপারে যুদ্ধের পথ অবলম্বন না করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার প্রতি জোর প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান। তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

যুদ্ধ এড়ানোর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ

প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বাগদাদ সফরের পর আরও কয়েকজন আন্তর্জাতিক নেতা পরপর বাগদাদ সফর করেন। জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মি. ইয়াহিরে নাকাসোনে নভেম্বরের ৩ তারিখ বাগদাদ সফর করেন। পশ্চিম জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলর 'বিলিবন' ৭ই নভেম্বর থেকে ১৯ই নভেম্বর পর্যন্ত বাগদাদ সফর করেন। বিলিবান পরিষ্কার ভাষায় ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে বলেন, আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে বিজয় লাভে ইরাককে নিবৃত্ত রেখেছে, আমেরিকা আপনাকে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিবে? নিশ্চয়ই নয়!

মি. প্রেসিডেন্ট কেন ভুলে যাচ্ছেন পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ তেল কুয়েত উত্তোলন করে, আর সেই কুয়েতকে আপনি কুক্ষিগত করে রাখবেন আমেরিকা এটা কি করে সহ্য করবে? উল্লেখ্য, পৃথিবীর বর্তমানে যে পরিমাণ তেল মজুদ আছে তার শতকরা ৬২% ভাগ তেল আছে মধ্যপ্রাচ্যে। মোট কথা প্রতিটি আন্তর্জাতিক নেতা ইরাক থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। ফলে, উপসাগরীয় সংকটের কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করা সম্ভব হলো না।

ইরাকিদের ধারণা ছিল কুয়েত দখলের পর বিশ্ববাজারে তেলের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিহবে। এই ধকল সামলাবার মত শক্তি পশ্চিমাদের নেই। তাদের এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। প্রেসিডেন্ট বুশ আমেরিকার রক্ষিত স্টক থেকে তেল বিক্রির নির্দেশ জারি করেন। সুতরাং ১৪ই আগস্ট ১৯৯০ থেকে প্রতিদিন ৫০ লাখ ব্যারেল তেল উত্তোলন শুরু হয়। সৌদি আরবও এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রতিদিন ২৬ লাখ ব্যারেলের পরিবর্তে ৯২ লক্ষ ব্যারেল তেল উত্তোলন শুরু করে। অপরদিকে ভেনিজুয়েলা ২০ লাখ ব্যারেল তেল উত্তোলনের পরিবর্তে ৫৫ লাখ ব্যারেল তেল উত্তোলন শুরু করে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অল্পদিনে ইরাকিরা বুঝে নেয় তাদের তেল ছাড়াও পৃথিবী চলতে পারে। নভেম্বরের শুরুতে কুয়েতের বালুকাময় প্রান্তরে দু'টি বিশাল বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। আর প্রতিদিন যুদ্ধের সম্ভাবনাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে লাগল। কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকা তার সেনাবাহিনীর ৭৫ হাজার সদস্যকে পৌঁছে দিল সৌদি আরবে। সঙ্গে পাঠাল এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টন গোলা-বারুদ। তার মধ্যে ৬৫ হাজার টন এলো নৌপথে আর ৮০ হাজার টন এলো আকাশপথে। কে না জানে এই বিশাল বাহিনী আর হাজার হাজার টন গোলা-

বারুদ এত অল্প সময়ের ভিতর সৌদি আরবে পৌঁছানো কোন সহজ কাজ নয়। জেনারেল কোলান পাওয়েল মার্কিন সিনেটরকে জানিয়ে ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম এতো বড় বিশাল মার্কিন বাহিনীকে এতো সংক্ষিপ্ত সময়ে অন্যকোন দেশে পৌঁছানো হলো। সেপ্টেম্বরের মাঝ নাগাদ যে কোন বড় ধরনের ইরাকি হামলা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য সৌদি আরবে পৌঁছায়; কিন্তু তারপরও আগামী দুই মাস ধরে মার্কিন বাহিনীর সদস্যরা একের পর এক সৌদি আরবে আসতে থাকে। নভেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহে সবার বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল, মার্কিনীরা একটা কিছু হেস্তনেস্ত করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তারপর এই আভাসও দেয়া হয় যে, আক্রমণ শুরু করতে যদি অধিক কালক্ষেপণ করা হয়, তবে সামরিক বাহিনীর মোরাল দুর্বল হয়ে পড়বে।

২রা নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, এই মুহূর্তে যদি সাদ্দাম কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মতি প্রকাশ করে তারপরও আঞ্চলিক শান্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। ওদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন কূটনীতিকরা সামরিক হামলা চলাকালীন সময় অন্যান্য সদস্যদের সমর্থন আদায়ের জন্য তখন থেকেই জোর প্রচেষ্টা শুরু করেন। ৮ই নভেম্বর মি. জর্জ বুশ ঘোষণা দেন, মার্কিন বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে। এ সময় ইরাক অনুভব করে, মার্কিনীরা তাদের হামলা প্রতিহত করার পরিবর্তে আগ্রাসনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো অক্টোবর মাসে যেসব আন্তর্জাতিক নেতারা ইরাক সফর করেন তারা প্রত্যেকে সাদ্দামকে সতর্ক করা সত্বে¦ও ইরাকি নেতা তার নীতিতে সামান্যতম পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে, ইরাক যুদ্ধ থেকে বাঁচার উপায় খোঁজার পরিবর্তে সে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইরাকি নেতার বিশ্বাস ছিল, এই মুহূর্তে সৈন্য অপসারণের ফলে ইরাকি সৈন্যদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়বে। সুতরাং সৈন্য প্রত্যাহার যে ইরাক-কুয়েত সংকটের একমাত্র সমাধান এই দর্শনের সঙ্গে সাদ্দাম একমত হতে পারছিলেন না। তার ধারণায় ইরাক যদি দুর্বলনীতি গ্রহণ করে তবে পশ্চিমাদের দাবির ফিরিস্তি বেড়েই চলবে। তিনি আরও মনে করতেন ইরাক যদি কুয়েত খালি করে দেয় তবে আমেরিকা তার মিসাইল ব্যাটারী, পরমাণু ও রাসায়নিক অস্ত্রগুলি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে ছাড়বে। এককথায় মার্কিনীরা ইরাকের সামরিক শক্তিকে তছনছ করে ছাড়বে।

১লা নভেম্বর শাহ হোসাইন সাদ্দামের কাছে চিঠির মাধ্যমে জানতে চান এই মুহূর্তে জর্ডান তার কোন উপকার করতে পারে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তারেক আজিজ স্বয়ং আম্মান হাজির হন; কিন্তু ইরাকের তখনো ছিল একই জিদ অর্থাৎ কোন জমানত ব্যতীত ইরাক কুয়েত খালি করতে প্রস্তুত নয়। এই সুযোগে শাহ হোসাইন ঐ সকল জিম্মীদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন যাদেরকে ইরাকিরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আটকে রেখেছিল। ১৫ই নভেম্বর শাহ প্যারিসে প্রেসিডেন্ট মিতরার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। মি. মিতরা বলেন, আমেরিকানরা সাদ্দামের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রস্তুত নয়। তার অবশ্য দু'টি কারণও রয়েছে-

১. ইরাকিরা কুয়েতকে ইরাকের অংশ বলে ঘোষণা দিয়েছে।

২. তারা হাজার হাজার পশ্চিমা নাগরিককে জিম্মি বানিয়ে রেখেছে। মি. মিতার ধারণা ছিল আমেরিকাকে আলাপ-আলোচনায় রাজি করতে হলে প্রথমে পরিবেশ অনুকূলে আনতে হবে। উত্তরে শাহ বলেন, যদি ফ্রান্স, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী এবং জাপান প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ইরাকের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করা হবে না তবে জিম্মী সমস্যার একটা আশু সমাধান সম্ভব। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর শাহ বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের কেবল মাত্র দু'টি সদস্য অর্থাৎ ফ্রান্স এবং চীন অথবা ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি গ্যারান্টি দেয় যে, ইরাকের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হবে না, তাহলেও জিম্মী সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব; কিন্তু মি. মিতরা শাহের এই প্রস্তাবের সাথেও একমত হননি। তার ধারণায় জিম্মীদের নিঃশর্ত মুক্তিই কেবল আমেরিকাকে নরম ভাবমূর্তি গ্রহণে বাধ্য করতে পারে। জিম্মী মুক্তির ব্যাপারে ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলও কোন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। কারো কারো ধারণা ছিল গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি রক্ষার জন্য সেখানে জিম্মীদের রাখা জরুরি। কারও মতে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ওদের নিঃশর্ত মুক্তি অত্যাবশ্যক। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হয় প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে। ইরাকি প্রেসিডেন্ট ১৭ই ডিসেম্বর একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ঐ বিবৃতিতে বলা হয় ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি যদি দেয়া হয় তবে তিন মাসের মধ্যে কোন পূর্ব শর্তারোপ ছাড়াই পর্যায়ক্রমে জিম্মীদের মুক্ত করে দেয়া হবে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত জিম্মী মুক্তির সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। যদিও কোন শর্তারোপ ছাড়া তিন মাসের মধ্যে জিম্মীদের মুক্তি দেওয়ার

ঘোষণা হয়; কিন্তু ইরাকি নেতা বলেন, যদি এই সময়ের মধ্যে ইরাকের উপর আক্রমণের চেষ্টা করা হয় তবে জিম্মী মুক্তি প্রক্রিয়া অবশ্যই ব্যাহত হবে। অপরদিকে মিত্রজোট ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার আইনগত ভিত্তি কী হতে পারে তা নির্ণয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ধারণায় কুয়েতের আমির যেহেতু জাতিসংঘ সনদের ৫১ ধারা অনুযায়ী সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন, সেই আবেদনকে ভিত্তি করেই এই হামলা পরিচালিত হওয়া উচিত। উল্লেখ্য, এই ধারা অনুযায়ী যে কোন দেশ তার নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরে জাতিসংঘ সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশের কাছে সাহায্যের আপীল করতে পারে; কিন্তু ঐ ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ সমস্যাটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে না নেয়া পর্যন্ত আক্রমণের অনুমতি নেই। কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার পর তার বিরুদ্ধে এ ধরনের একটা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়ার ফলে সেই সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়ে যায়। জাতিসংঘ আইনজীবীদের পক্ষ থেকে যখন এ বিষয়টির দিকে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন তারা উভয় মিলে নিরাপত্তা পরিষদের প্লাটফরম থেকে আর একটি প্রস্তাব মঞ্জুর করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। মি. জেমস বেকার নভেম্বরের ৪ তারিখ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সফর শুরু করেন। এই সফরে একটি উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী দেশগুলিকে তাদের পূর্ব গৃহীত সিদ্ধান্তে অবিচল রাখা। বন্ধুদেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে জেমস বেকার জানতে পারেন, আরব রাষ্ট্রপ্রধানরা কালবিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। ওদিকে প্রেসিডেন্ট বুশ নিজেও ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি সফর করেন। যাতে মিত্র দেশগুলির মাঝে আস্থাশীলতায় পরিবর্তন আসে। এ সময় শাহ হোসাইন তার কাছে প্যারিসে সাক্ষাতের আগ্রহ ব্যক্ত করে একটি ম্যাসেজ পাঠান। শুরুতে মি. বুশ তার সঙ্গে সাক্ষাতে সম্মত হন এবং ১৭ই নভেম্বর সাক্ষাতের তারিখ ধার্য হয়; কিন্তু পরে তার মত পরিবর্তন হয়। তিনি শাহের সঙ্গে সাক্ষাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তার ধারণায় শাহ হোসাইন সাদ্দামের বিশেষ দূত হিসাবে কাজ করছেন। অতএব এই মুহূর্তে শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে মিত্র দেশগুলির মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। একদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৬ই নভেম্বর বুশের পক্ষ থেকে শাহকে জানিয়ে দেওয়া হয়, আপাতত তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব নয়।

মধ্যপ্রাচ্য সফরকালে সৌদি শাহ এবং কুয়েতের আমির শায়েখ জাবের মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপর চাপ দেন যে, দেরি না করে এই মুহূর্তে ইরাকের বিরুদ্ধে

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। উভয় নেতার বক্তব্য ছিল, মাত্র কিছুদিন পর শবে মি'রাজ ও শবে কদরের মত পবিত্র ধর্মীয় উৎসব শুরু হতে যাচ্ছে। এসব পবিত্র ধর্মীয় উৎসব শুরু হওয়ার পূর্বে যদি ইরাকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়, তবে পরে সৌদি আরবে মার্কিনীদের উপস্থিতির কারণে জনসাধারণের ভিতর তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া মার্চ মাসে পবিত্র রমাদান মাস শুরু হতে যাচ্ছে, তাই সৌদি ও কুয়েতী নেতা চাচ্ছিলেন শবে মিরাজ, শবে কদর ও রমাদান মাস শুরু হওয়ার পূর্বেই ইরাকিদের একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া হোক। তাছাড়া নিরর্থক মার্কিন সৈন্য সৌদি আরবে ফেলে রাখা ছিল আমেরিকার স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মার্কিন সেনা কমান্ডাররা ভাল করে জানতেন যে, সৌদি আলিমরা যে কোন সময় জনসমক্ষে এই গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে পারেন যে, মার্কিন সৈন্যরা তাদের ক্যাম্পে গোপনে গোপনে বড়দিনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করছে। এসব তথ্য সৌদি জনগনকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে।

২২শে নভেম্বর প্রেসিডেন্ট বুশ কুয়েতের আমীর শেখ জাবেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলাপ প্রসঙ্গে মার্কিন নেতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার মতে যুদ্ধ কবে নাগাদ শুরু করা উচিত? উত্তরে শায়েখ জাবের বললেন, এই মুহূর্তের, ঘণ্টা শেষ হওয়ার পূর্বে। যুদ্ধ কবে নাগাদ শুরু হতে যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা না করলেও মি. বুশ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, আমরা খুব তাড়াতাড়িই যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মি. বুশ বলেন, এরপর হয় আমি থাকব অথবা সাদ্দাম হোসেন থাকবে। তিনি আরও বলেন, ইতিহাসে আমার স্থান কীভাবে নির্ণয় হবে এবং আগামী নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতির পদটি কে অলংকৃত করবে-এসবকিছু যুদ্ধের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে। শাহ ফাহাদ আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে বলেন, আমাদের জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। তারা বলাবলি করছে, মার্কিনীরা যুদ্ধের জন্য মোটেও প্রস্তুত নয়, তারা কেবল অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেই ক্ষান্ত দেবে। সবরকম অর্থনৈতিক অবরোধ প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে নিরাপত্তা পরিষদের মঞ্জুরকৃত প্রস্তাবগুলি মানতে বাধ্য করতে পারবে না। ফলে ইরাকিদের সামরিক শক্তি ঠিকই থাকবে। এ কথার উত্তরে প্রেসিডেন্ট বুশ বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। শাহ ফাহাদ শায়েখ জাবেরসহ সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদও অনতিবিলম্বে যুদ্ধ শুরু করার পক্ষপাতী ছিলেন। সিরীয় প্রেসিডেন্ট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য তার দেশের ইনফেন্টারী ও একটি আর্মাড ব্রিগেড সৌদি আরব পাঠিয়েছিলেন। তার

মতে ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য জাতিসংঘের অনুমতির প্রয়োজন নেই। ২৯শে নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে ৬৭৮ নং প্রস্তাবটি পাস করা হয়। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ইরাকের বিরুদ্ধে মিত্র জোটকে সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয়। এ প্রস্তাব সম্পর্কে নানাজনের নানা মত শুনতে পাওয়া যায়, তবে একথা ঠিক যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জাতিসংঘ আইনের কোন তোয়াক্কা করা হয়নি। আইন ভঙ্গের এ বিষয়টির দিকে স্বয়ং সেক্রেটারি জেনারেল মি. প্যারেজডি কুয়েলারই ইঙ্গিত করেন। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের অনেকের ধারণা, উল্লেখিত প্রস্তাবটি পাস করার সময় জাতিসংঘ আইন লংঘন করা হয়েছে।

৬৭৮ নং প্রস্তাবের ব্যাপারে দুদিন পর্যন্ত ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলে বিতর্ক চলতে থাকে। কাউন্সিলের অধিবেশনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞকে তাদের মতামত ব্যক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। ইরাকের উপ-প্রধানমন্ত্রী মি. সা'দুন হাম্মাদীর মত ছিল, উক্ত প্রস্তাবটির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আদালতে আপত্তি তোলা হোক। তার মতকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হয় যে, এ বিষয় আন্তর্জাতিক আদালতে সুষ্ঠু তদন্ত হবার বা ইনসাফ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ এদিকে ইঙ্গিত করেন, ১৯৮৫ সালে মার্কিনীরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে এই অভিযোগ উত্থাপন করে নিকারাগুয়া আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হয়; কিন্তু তার ফরিয়াদের প্রতি কেউ কর্ণপাত করেনি। এই মুকাদ্দামাটি শ্রবণের অধিকার যে আন্তর্জাতিক আদালতের আছে আমেরিকানরা তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়।

৬৭৮ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে ইরাককে ছয় সপ্তাহ সময় দেয়া হয় যে, ৬৬০ নং প্রস্তাব থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যে কয়টি প্রস্তাব পাস করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিকে কার্যকর করা হোক। এ ব্যাপারে ফ্রান্সের অভিমত ছিল এই যে, উপসাগরীয় সংকটের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য ইরাকের উচিত এই সময়সীমাকে খুব ভাল করে কাজে লাগানো। জাতিসংঘে নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূতের নিউইয়র্কের বাসায় ২৯শে নভেম্বর একটি নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ নৈশভোজে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'রোলেন্ড দোমাস' বলেন যে, পুরো ইউরোপিয়ান কমিউনিটিকে জাতিসংঘ সেক্রেটারির মাধ্যমে উপসাগরীয় সমস্যা নিস্পত্তির ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। সেক্রেটারি জেনারেল মি. দোমাসকে ফোন করে জানান, তার এই প্রস্তাব বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তিনি বলেন মি. বুশ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মি. তারেক আজিজ স্বয়ং হোয়াইট হাউসে

এসে আলোচনায় শরিক হোন আর মি. জেমস বেকার বাগদাদ গিয়ে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন। জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেলের একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। তার ধারণায় আমেরিকা পৃথিবীজুড়ে তার একার প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়, তাই তারা চাচ্ছে এই সমস্যা সমাধানকল্পে আর কেউ যেন মাথা না ঘামায়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের প্রতি ইরাকি প্রেসিডেন্ট আস্থাশীল ছিলেন না। বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের অনেকের ধারণা ছিল, এটা প্রেসিডেন্ট বুশের একটি চাল। সাদ্দাম মনে করতেন, বুশ যে কোন উপায় ইরাকের সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দিতে চায়। মি. কিসিঞ্জারের একটি ভাষণের দ্বারা সাদ্দামের এই ধারণা আরও মজবুত হয়। ২৮শে নভেম্বর মার্কিন সিনেটের আর্মাড সার্ভিসেস কমিটিতে ভাষণে মি. কিসিঞ্জার বলেন, উপসাগরীয় সংকট নিষ্পতির ব্যাপারে যত ধরনের প্রস্তাব দেয়া হোকনা কেন, একটি প্রস্তাবকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাধান্য দিতে হবে। তা হচ্ছে যে কোন উপায়ে ইরাকের সামরিক শক্তিকে কম করে দিতে হবে, কারণ তাদের সামরিক শক্তি প্রতিবেশী দেশগুলির ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও কিসিঞ্জার তখন মার্কিন কেবিনেটের সদস্য ছিলেন না; কিন্তু তারপরও তার ভাষণকে মার্কিন কর্মকর্তাদের চিন্তা-ভাবনার প্রতিবিম্ব মনে করা হয়। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, মি. কিসিঞ্জারের তুলনায় প্রেসিডেন্ট বুশ ও জেমস বেকারের মনোভাব ছিল আরও কঠিন।

৪ঠা ডিসেম্বর বাগদাদে আরব রাষ্ট্রপতিদের একটি ক্ষুদ্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন জর্ডানের শাহ হোসাইন, ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাত, ইয়েমেনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সালেম আল বাইদ ও স্বাগতিক দেশের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন পশ্চিমা জিম্মীদের মুক্তিদান প্রসঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে একটি যুক্ত ইশতিহার জারি করা হয়। ঐ ইশতিহারে প্রেসিডেন্ট বুশের পক্ষ থেকে আলোচনার আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে ঘোষণা দেয়া হয় যে, বড় দিনের আগেই সকল জিম্মীকে মুক্তি দেয়া হবে। এই ঘোষণাটি সম্প্রচারের পূর্বে একটি আয়াত পড়া হয়, যা মিসরের মরহুম প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ১৯৭৭ সালে তেল আবিব রওনা হওয়ার পূর্বে কায়রো বিমান বন্দরে তেলাওয়াত করেছিলেন। আয়াতের অর্থ হলো, 'তারা যদি শান্তি চায় তবে তোমরাও এরূপ করো, আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখ।' এ উদ্যোগ গ্রহণের পর ফরাসী প্রেসিডেন্টের কাছে একটি ম্যাসেজ পাঠানো হয়। উক্ত ম্যাসেজে বলা হয়, উপসাগরীয় সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে আমরা কার্যকর উদ্যোগ

হাতে নিয়েছি। ফরাসী রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে উত্তরে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট মিতরা বাগদাদ যাওয়ার উদ্দেশে কনকর্ড বিমানটি প্রস্তুত রয়েছে। উপসাগরীয় সংকটের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি ও এ পথে দ্বিতীয় যে প্রতিবন্ধকতাটি রয়েছে তা কীভাবে দূর করা যায় সে ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট বাগদাদ যেতে চান।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা বলতে এখানে কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি বুঝানো হয়েছে। ইরাকের ধারণা ছিল, এই মূহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য সমস্যাগুলিও সমাধান করা সম্ভব। তাদের ধারণায় এখন যদি কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনী হটিয়ে নেওয়া হয় তার পরও আগামীতে অন্যান্য সমস্যা নিয়ে দেন দরবার করা সম্ভব। এসময় পশ্চিমারা শাহ হোসাইনের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। অনেকের ধারনায় তিনি ইরাকের সহযোগী শক্তি হিসাবে কাজ করছেন। তবে অন্যদের ধারণায় শাহ হোসাইনই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে উপসাগরীয় সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম। অবশ্য যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে শাহের কার্যকলাপ মোটেই পছন্দনীয় ছিল না। তাদের বক্তব্য ছিল শাহকে মনে করা হয় তিনি পশ্চিমাদের আস্থাভাজন বন্ধু, অথচ বর্তমানে সাদ্দামের পক্ষে কাজ করে পশ্চিমাদের নিকট তিনি তার আস্থা হারিয়ে ফেলছেন। এসবই ছিল পশ্চিমাদের অলীক কল্পনার মনগড়া বক্তব্য। তাই তারা শাহের অবদানকে খাটো করে দেখার প্রয়াস পায়। পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে শাহের আস্থা হারানোর পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। সত্তর-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শাহের সঙ্গে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকান নেতাদের সঙ্গে ছিল নিবিড় সম্পর্ক; কিন্তু ১৯৭৩-এর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত পুরোপুরি পশ্চিমা শিবিরে আশ্রয় নেন। তখন থেকেই মূলত পশ্চিমা নেতাদের কাছে শাহের গুরুত্ব কমে যায়। আনোয়ার সাদাতের পর হোসনী মুবারক তার পূর্বসূরীর পদাংক অনুসরণ করে চলেন। ১৯৭৭ সালে কায়রো-তেল আবিব সরাসরি যোগাযোগ কায়েম হবার পর শাহের গুরুত্ব আরও কম হয়ে যায়। ইতিপূর্বে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে ইসরায়েলের যোগাযোগ ছিল। এ যোগাযোগ সর্বদা গোপন রাখা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে আনোয়ার সাদাতের জেরুসালেম ভ্রমণ আর ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর সরাসরি মিসর-ইসরায়েল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব পাশ্চাত্য নেতাদের কাছে আর শাহের গুরুত্ব রইল না।

মোটকথা, বিভিন্ন কারণে শাহের সঙ্গে পাশ্চত্যের সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত যেটুকু সম্পর্ক অবশিষ্ট ছিল তা কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার কারণে শেষ হয়ে যায়। এমনিতেই জর্ডানের অর্থনীতি ছিল দুর্বল, উপসাগরীয় সংকটের কারণে তার অর্থনীতি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষকরে ইরাকের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে তার দেশের অর্থনীতির দূর্দশা সৃষ্টি হয়। কারণ জর্ডানের পথে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ইরাকের ব্যবসায়িক লেনদেন চলতে থাকে। একারণেই সম্ভবত ইরাক-কুয়েত সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছবার লক্ষ্যে শাহ ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে আগ্রহী; কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পরিবেশ আর পরিস্থিতি, তাকে শেষ পর্যন্ত সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শাহ হোসাইন ইয়াসির আরাফাত ও অন্যান্য আরব নেতা যারা এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে আগ্রহী ছিলেন তারা একে একে নিরাশ হতে লাগলেন। ফলে, তাদের চেষ্টায়ও ভাটা পড়া শুরু হলো। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট শাজলীবিন জাদীদ শাহ ফাহাদ ও সাদ্দামের সঙ্গে একটি সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কারণ, শাহ ফাহাদ ইরাকি নেতার সঙ্গে সাক্ষাতে অনীহা প্রকাশ করেন। শাহ ফাহাদের ভাষায়, প্রস্তাবিত সাক্ষাতের জন্য পরিস্থিতি এখন আমাদের অনুকূলে নয়। একথা সত্য যে, কুয়েতের উপর হামলার পরও মিসরের সঙ্গে বরাবর ইরাকের যোগাযোগ বলবৎ ছিল। অনুমান করা হয়, এ সময় সাদ্দাম ও হোসনী মুবারকের মাঝে অন্তত ৩৮টি চিঠির আদান-প্রদান হয়। উভয় নেতার এই যোগাযোগের ফলাফল দাঁড়িয়েছে এইযে, উপসাগরীয় সংকট নিষ্পত্তি না হয়ে তা আরও ঘোলাটে হয়েছে। ১৯শে আগস্ট কায়রোয় নিযুক্ত ইরাকি রাষ্ট্রদূত নাবিল নজম আতাকরিতীর সঙ্গে হোসনী মুবারক ফোনে যোগাযোগ করেন এবং সাদ্দামকে পৌঁছানোর জন্য একটি ম্যাসেজ দেন। ম্যাসেজটি ছিল তিনটি পয়েন্টে সীমাবদ্ধ। প্রথম পয়েন্টে মি. মুবারক বলেন, আমি চাই প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম উদ্ভূত পরিস্থিতির ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করুন। দ্বিতীয় পয়েন্টটি ছিল, বর্তমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মিসরীয় নেতা যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন। তৃতীয় পয়েন্টটি ছিল এই যে, আরব জনগণের রক্তারক্তি বন্ধের জন্য হোসনী মুবারক যে কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছেন। মিসরীয় নেতার এসব ম্যাসেজের জবাবে ২৩শে আগষ্ট সাদ্দাম বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মি. মুবারকই দায়ী। আরবদের এই খুন-খারাবীর জন্য তিনিই এককভাবে দায়ী। ঐদিন মি. মুবারক নাবিল নজম আততাকরিতীর সঙ্গে

দ্বিতীয়বার যোগাযোগ করে ইরাকি নেতাকে তার পক্ষ থেকে আরেকটি ম্যাসেজ পৌঁছানোর পরিবর্তে লিখিত পয়গাম পাঠানোই অধিক শ্রেয় মনে করেন।

মি. মুবারক তার ম্যাসেজে লিখেছেন, সৌদি আরবের অনুরোধে মিসর তার বাহিনী রিয়াদ পাঠিয়েছে, কারো চাপের মুখে মিসর এ উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আমি চাই, আপনি কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিন, এর মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। উভয় নেতার এই পত্রালাপের পর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত আর কোন যোগাযোগ হয়নি। ২২শে নভেম্বর মিসরীয় নেতা পুনরায় সাদ্দামের কাছে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের লিখিত আহ্বান জানান। হোসনী মুবারক তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, সৈন্য প্রত্যাহারের পর আপনার সকল দাবি পূরণ করার চেষ্টা করা হবে। মিসরীয় নেতা তাকে সতর্ক করে বলেন, আমার মনে হয় পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে আপনি সঠিকভাবে অবহিত নন, আপনার আশপাশের আমলারা আপনাকে বিষয়টি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে দিচ্ছে না। মি. সাদ্দাম এর উত্তর দেন মৌখিকভাবে, তিনি তার সাবেক অবস্থানের উপর অবিচল থাকার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে বলেন উপসাগরীয় অঞ্চলের বর্তমান মারাত্মক পরিস্থির জন্য একমাত্র দায়ী হোসনী মুবারক।

২৬ শে নভেম্বর মিসরীয় নেতা প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইরাকি নেতাকে আরেকবার লিখিত অনুরোধ জানিয়ে বলেন, এখনও সময় আছে আপনি কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিন। কারণ মি. বুশ যে কোন অবস্থায় কুয়েত সরকারের পূনর্বহাল চান এবং কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্যের অপসারণও কামনা করেন। আমেরিকান নেতার সঙ্গে আলাপ করে আমি বুঝেছি, ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে তিনি স্থির সংকল্পবদ্ধ। মার্কিনীদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে আমি খুব ভাল করে অবগত, আমার মনে হয় পারস্পরিক কলহের ফলে ব্যাপক ধ্বংস ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। মেহেরবানী করে বাস্তববাদী হওয়ার চেষ্টা করুন, আমি আবারও আপনাকে বাস্তব অবস্থা অনুধাবনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

১৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাদ্দাম হোসেন জনাব হোসনী মুবারকের চিঠির কোন উত্তর দেননি। তারপর তার উপর আরো অনেক অপবাদ লাগিয়ে বলেন, আপনি আরব জাতিকে বলির পাঠায় পরিণত করেছেন। সুতরাং এখন যদি আমাদের সবাইকে জবাই করে দেয়া হয় তবে আপনার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

আমি জানি না আপনি কী চান, কোন স্বার্থে আপনি এসব পরিশ্রম করেছেন? বিনিময়ে কী পাবেন? কয়েকটি ডলার! এছাড়া তো আর কিছু নয়! সাদ্দাম মনে করতেন হোসনী মুবারক সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছেন।

তিনি তার উপর অন্য একটি কারণে রাগান্বিত ছিলেন। কারণটি সম্পর্কে জানা যায়, ২৪শে জুলাই বৈঠকের পর মি. মুবারক কুয়েতী ও মার্কিনীদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, সাদ্দাম তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। ইরাকি নেতার ভাষায় এমন অনাধিকার চর্চার ব্যাপারটি আমি আপনাকে কখনও প্রদান করিনি। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে, আমি প্রতারণা করছি তারপরও অন্যদের কাছে আমাকে প্রতারক হিসাবে পরিচয় দেয়াটা আপনার জন্য মোটেই উচিত হয়নি। যাইহোক, আমার ব্যাপারে আপনার এ ধারণা ভুল; আপনি ছাড়া পৃথিবীর সবাই আমাকে সত্যবাদী মনে করে। আমি বুঝেই উঠতে পারিনা আপনি আমাকে এমনটি কী করে ভাবলেন? আপনি কি বাস্তব অবস্থা বুঝতে অক্ষম ছিলেন, নাকি আমার বিরুদ্ধে কাল্পনিক ধারণা আপনাকে এ পথে পরিচালিত করেছে? শেষে তিনি লিখলেন, দয়া করে আপনি আমাকে আর কিছুই লিখবেন না, আপনার সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ রাখতে চাই না। সাদ্দামের এ উত্তরে মি. মুবারক যারপরনাই অবাক হলেন। অবাক হবারই কথা! মি. মুবারক প্রতি উত্তরে লিখলেন, আপনি যদি আমার সঙ্গে পত্র যোগাযোগ না রাখতে চান তবে সেটা আপনার মর্জি, কিন্তু আমি পূর্বের ন্যায় আপনাকে বরাবর লিখেই যাব। সাদ্দামের ধারনা ছিল, ২৪শে জুলাইয়ের সাক্ষাতের বিরূপ ইমেজ সৃষ্টি করে মিসরীয় নেতা তা থেকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টায় মেতে আছেন।

সাদ্দাম তার উপর অপবাদ দিয়ে বলেন, কায়রো সম্মেলনে আরব সমাধানের পথে আপনিই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন। মি. মুবারক এ অপবাদ অস্বীকার করে বললেন কায়রো সম্মেলনে ইরাকের পজিশন মজবুত করার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেন। মিসরীয় নেতার ভাষায়, আপনি সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে আমেরিকার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রস্তুত ছিলেন। ইরাকি নেতা হোসনী মুবারকের পত্রে এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন। সাদ্দাম মিসরীয় নেতার বিরুদ্ধে এই অপবাদ দেন যে, তিনি দ্বৈত চেহারার অধিকারী। উত্তরে মুবারক বলেন, আমি জানি আপনি খুব অসুবিধায় আছেন; কিন্তু আমি আশ্চর্য এই ভেবে যে, বাস্তব অবস্থা অস্বীকার করে আপনি কীভাবে আমার উপর অহেতুক মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। এটা নিশ্চয়ই কূটনীতির ভাষা নয়। বর্তমান সংকট থেকে মুক্ত করার জন্যই আমি আপনাকে আলোচনার টেবিলে আনতে চাই। এছাড়া আমার আর

কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোন প্রয়োজনও নেই। ১লা জানুয়ারী ১৯৯১ ইরাকি নেতা মিসরীয় নেতার বক্তব্যের জবাবে লিখলেন, আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, একজন আরব জাতীয়তাবাদী নেতা আমেরিকান ও ইসরায়েলীদের কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। এভাবে মিসর ও ইরাকের মাঝে পত্রালাপের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে জিম্মীদের মুক্তি দেওয়ার কারণে অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে কিন্তু আসল সমস্যা সমাধানের পথটি ছিল সুদূর পরাহত। কুয়েতিরা ভাবছিল, আলোচনার মাধ্যমে যদি ইরাকি সেনারা দেশে ফিরে যায় তাহলে কাজটা খুব একটা ভাল হবে না। তাদের বক্তব্য ছিল বিনা আলোচনায় এবং বিনা শর্তে ইরাকি সৈন্যদের চলে যেতে হবে। সৌদি সরকারের ইচ্ছাও ছিল তাই। কারণ নিঃশর্ত প্রত্যাহার ব্যতীত সৌদি সরকারকেও বিপাকে পড়তে হতো। তাঁরা মিঃ বুশের আলোচনার অফারকে উৎকণ্ঠার নজরে দেখেন।

প্রেসিডেন্ট বুশ যখন বলেন জেমস বেকার বাগদাদ সফর করুক আর তারেক আজিজ ওয়াশিংটন সফর করুক। তখন এটা প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিলনা, কে কার আগে সফর শুরু করবে। মিঃ বুশ ২৯ শে নভেম্বর-এর সাংবাদিক সম্মেলনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেন যে, '৯০-এর ডিসেম্বর থেকে ৯১-এর ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত যে কোন সময় বাগদাদ যাওয়ার জন্য। জেমস বেকার প্রস্তুত রয়েছেন। কূটনৈতিক নিয়মনীতি ফলো করতে গিয়ে মার্কিনীরা এসময় জেমস বেকারের বাগদাদ সফরকে কেন্দ্র করে বারবার তারিখ পরিবর্তন করতে থাকে। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের ব্যাপারে ওরা শেষ বারেরমত তারিখ নির্ধারণ করে। ইরাক যখনই কোন তারিখ প্রত্যাখ্যান করেছে আমেরিকা সাথে সাথে আরেকটা নতুন তারিখ ঘোষণা দিয়েছে। হিসাব করলে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ সময় অন্ততঃ ১৭ বার তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

জিম্মীরা মুক্ত এবং জেনেভা নাটক শুরু

তারেক আজিজের ওয়াশিংটন সফরের তারিখ নিয়ে ইরাকের তেমন কোনো শিরঃপীড়া ছিল না। কারণ, তার ধারণায় এসব সময় হয় সাধারণতঃ লৌকিকতাপূর্ণ। অপরদিকে জেমস বেকারের সফরটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর। ইরাকিদের ধারণায় জেমস বেকার বাগদাদ পৌঁছে আল্টিমেটাম ও দিতে পারেন। তাই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাঁর সফরকে ১২ই জানুয়ারী পর্যন্ত পিছয়ে দেওয়া হোক। স্মরণ করা যেতে পারে, নিরাপত্তা পরিষদ ৬৭৮ নং প্রস্তাব অনুসারে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত ডেডলাইন দিয়ে দেয়। ইরাকের কামনা ছিল জেমস বেকারের সুরে তারেক আজিজ ওয়াশিংটন ঘুরে আসবেন। মার্কিনীরা ইরাকের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেয়। ১৭ তারিখের পরিবর্তে ১২ই জানুয়ারী তারিখ ইরাক সরকার আস্থাহীনতা হিসাবে আখ্যায়িত করে। অপরদিকে আমেরিকার ধারণা ছিল, ডেডলাইনের মাত্র তিনদিন পূর্বে আলোচনার সূচনা করে ইরাক এই প্রক্রিয়াকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সে আরও ধারণ করে, যে কোন উপায়ে ইরাক আলোচনার এই ধারাকে পবিত্র মৌসুম পর্যন্ত ত্বরান্বিত করতে প্রয়াসী। এই চালে যদি ইরাক সফল হতে পারত তাহলে ইরাকের পজিশন আর ও মজবুত হয়ে যেত। মিত্র বাহিনীতে অন্তভুক্ত আরব সৈন্যরা নিশ্চয়ই পবিত্র রমযান মাসে যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তত হতো না। আর উত্তপ্ত মৌসুমে যুদ্ধ করা মার্কিন বাহিনীর জন্য হয়ে উঠত দুর্বিষহ। ৯ই জানুয়ারী এক সংবাদিক সম্মেলনে জেমস বেকার বলেন, ১২ই জানুয়ারী তারিখে আলোচনায় আগ্রহ দেখিয়ে ইরাক মুলতঃ ১৫ই জানুয়ারীর ডেডলাইনকে পিছিয়ে দিতে চায়। অতীতের তুলনায় এ সময় আমেরিকার ভাবমূর্তি অনেক অনমনীয় হয়ে ওঠে।

মার্কিনীরা চাচ্ছিল, তাদের দেওয়া কোন একটি তারিখে ইরাকিরা আলোচনায় বসতে সম্মতি প্রকাশ করুক; কিন্তু ইরাক কর্তৃক তাদের প্রত্যেকটি তারিখ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে মার্কিনীরা নতুন সুরে কথা বলতে শুরু করে। তাদের দাবি ছিল কুয়েত থেকে কেবল সন্য প্রত্যাহার করলেই উপসাগরীয় সমস্যার সমাধান হবেনা, বরং কুয়েতকে যুদ্ধের সকল ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সেই সাথে ইরাকের সামরিক শক্তি ও পল সর দিতে হবে। পশ্চিমা জিম্মীরা মুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে বর্তমানে আমেরিকান উপর তেমন কোন চাপও ছিল না। ২২১ শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট বুশ এক বিবৃতিতে বলেন জিম্মীরা মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর ইরাকের বিরুদ্ধে এখন যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ফরাসীদের এই

আশ্বাসের কারণ, জিম্মীদের মুক্ত করে দিলে স্বভাবতই আমেরিকা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু আসলে হলো হিতে বিপরীত। ফলে, ইরাকিদের আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি কেঁপে উঠল। ওরা হয়ে পড়ল সন্দিহান। ওদিকে মরক্কোর মাধ্যমে সংবাদ পাওয়া গেল, ফরাসীরাও তাদের নীতিতে পরিবর্তন আনছে। এ ধরনের আরও কিছু সংবাদ ৯১-এর শুরুতেই পাওয়া গেল।

এবারও মাধ্যম ছিল মরক্কো। এ সময় মিতাঁর সামরিক ও বেসামরিক উপদেষ্টাদের মাঝে দেখা দিল মতানৈক্য। বেসামরিক উপদেষ্টাদের রায় ছিল ফ্রান্সের উচিৎ মার্কিনীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। অপরদিকে সামরিক উপদেষ্টারা ছিলেন আমেরিকার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী শেষ পর্যন্ত মিতরা সামরিক উপদেষ্টাদের রায়কে প্রাধান্য দিলেন। এর পিছনে অবশ্য দু'টি কারণ ছিল। তাঁর মতে যুদ্ধ স্থগিত করার এখন আর কোন উপায় নেই। এই যুদ্ধে পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের সুবাদেই কেবল ফ্রান্স যুদ্ধোত্তর মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। দ্বিতীয়ত যুদ্ধ শেষে কুয়েতের বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে যারা তার পুনর্গঠনে অংশগ্রহণ করবে ফ্রান্স তাদের কাতারে শামিল হতে চায়। সেই পরিস্থিতিতে কুয়েতকে অস্ত্র সরবরাহ করে মোটা অংকের বৈদেশিক মুদ্রা কামানের আকাঙ্খটাও কম বড় কথা নয়। বৃটেন ও আমেরিকার কোম্পানীগুলি তখন থেকেই কুয়েতের প্রবাসী সরকারের কাছ থেকে বড় বড় কন্ট্রাক্ট হাসিলের জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছিল। লুটপাটের এ সূবর্ণ সুযোগের মুহূর্তে ফ্রান্স নিজেকে কেন বঞ্চিত রাখবে? সুতরাং মার্কিনীদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে সার্বিকভাবে ফ্রান্স আমেরিকার সাথে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

এসব সংবাদ পাওয়ার পর ইরাকের বিপ্লবীকমান্ড কাউন্সিলের সভা তলব করা হয়। উক্ত বৈঠকে শরীক বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের সদস্যদের কারো কারো ধারণায় জিম্মীদের মুক্ত করার জন্য মিতারা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এই ষড়যন্ত্রের পিছনে জর্ডানের শাহ হোসাইনেরও হাত আছে। এই পক্ষে রায়কে প্রত্যাখ্যান করে সাদ্দাম বলেন, শাহ হোসাইন এই ষড়যন্ত্রের সাথে মোটেই শরীক নন। জিম্মী মুক্তির ব্যাপারে যদি কোন ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে তাহলে ইরাকের ন্যায় শাহও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে যখন আমেরিকা-ইরাক ডায়লগ শুরু করার সকল আশা তিরোহিত তখন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিঃ গর্বাচেভ আগ বেড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে এই নির্দেশ দিয়ে বাগদাদ পাঠালেন যে, ইরাক ও আমেরিকান প্রতিনিধিরা যেন জেনেভায় আলোচনার জন্য সম্মত হয় । গর্বাচেভের এ উদ্যোগ ফলপ্রসূ হলো। যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদকে জেনেভায় আলোচনার অফার দিল। ইরাক সাথে সাথেই সে অফার কবুল করল।। যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা ছিল এ প্রস্তাবে আরব রাষ্ট্র প্রধানরা ক্ষেপে উঠবে। হলোও তাই। মিসরকে শান্ত করে বলা হলো, উভয় দেশের এ আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আর এ আলোচনা কোন সুফলও বয়ে আনবে না। মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যে এই আলোচনা নাটকের সমাপ্তি ঘটবে। প্রশ্ন জাগতে পারে, আমেরিকা ইরাককে এ ধরনের অফার দিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর মার্কিনীদের ভাষায় শুনুন, "এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীকে বলা যাবে উপসাগরীয় সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি।" ৯ ই জানুয়ারী তারেক আজিজ এবং জেমস বেকার জেনেভায় বৈঠকে মিলিত হলেন। উভয় নেতার সাথে পাঁচ-ছয়জন করে সহযোগীও উপস্থিত ছিলেন। বেকার তাঁর প্রতিপক্ষের হাতে একটি চিঠি সোপর্দ করলেন। চিঠিটি মিঃ বুশ প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের উদ্দেশে লিখেছিলেন। তারেক আজিজ বেকারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি মিঃ বুশের চিঠিটি পড়েতে পারি? বেকারঃ অবশ্যই! তারেক চিঠি পড়া শুরু করলেন।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট,

> আমরা আজ যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়ায়। একদিকে ইরাক আর একদিকে সারাবিশ্ব। কুয়েতের উপর আপনার আগ্রাসনের কারণেই এ যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ এখনও সময় আছে। যুদ্ধ বন্ধ করার এখনও উপায় আছে। আর তা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব নং ৬৭৮ পুরোপুরিভাবে আপনাকে মেনে নিতে হবে। ঐ চিঠিতে আরও বলা হয়, ইরাক যদি নিরাপত্তা পরিষদের উপরোক্ত প্রস্তাবটি কার্যকর করে তাহলে সে আবার পুনরায় বিশ ।দরবারে তার মর্যাদা ফিরে পেতে পারে এবং তার সামরিক শক্তিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। মিঃ বুশ তাঁর চিঠিতে আরও লেখেন, আপনি যদি নিঃশর্তভাবে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যহার না করেন তাহলে মনে রাখবেন কুয়েতের তুলনায়

> ইরাকের ক্ষতি হবে অনেক বেশি। কুয়েতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কারো তেমন একটা শিরঃপীড়া নেই। কারণ, কুয়েত অবশ্যই আগ্রাসন মুক্ত হবে। তার সরকারও পুনর্বহাল হবে। আসল সমস্যা হলো ইরাকের ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকি নেতাকে স্মরণ করিয়ে দেন, তাঁর দেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে সর্বমোট ১২টি প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়েছে। একশ'র ও বেশি দেশ জাতিসংঘে ইরাকের বিরুদ্ধে আরোপিত অবরোধ সমর্থন করেছে। এসব তথ্য দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, এটা হবে গোটা বিশ্বের সাথে ইরাকের যুদ্ধ। ঐ চিঠির শেষ প্যারাগ্রাফে বলা হয় এ চিঠির উদ্দেশ্য আপনাকে ধমকানো নয়, বরং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা। মিঃ বুশের বক্তব্য ছিল, ইরাকি জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণের কোন আক্রোশ নেই। কোন শত্রুতা নেই। ১৫ই জানুয়ারীর পূর্বে যদি ইরাক জাতিসংঘের দাবি মেনে নেয় তাহলে যুদ্ধের কালো ছায়া দূরীভূত হওয়া সম্ভব। উক্ত চিঠিতে এই আশাবাদ ও ব্যক্ত করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বুদ্ধিমত্তার সাথে সিদ্ধান্তগ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। সব শেষে ছিল মিঃ বুশের দস্তখত।

তারেক আজীজ খুব সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে চিঠির বিষয়বস্তু পাঠ করলেন। তারপর খামের ভিতর ভরে টেবিলের উপর রেখে দিলেন। বললেন, এ ধরণের কোন চিঠি আমি আমার রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারব না। কারণ, এ চিঠিতে একজন রাষ্ট্রনায়কের পদমর্যাদার পরিপন্থী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথা শুনে মিঃ জেমস বেকার বলেন, চিঠির কয়েকটি পয়েন্ট সম্পর্কে আমি আপনাকে ব্যাখ্যা দিতে চাই। অবশ্য আমি আগেই বলে রাখছি, নিরাপত্তা পরিষদে মঞ্জুরকৃত প্রস্তাবগুলির উপর তর্ক করার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হইনি। এটা আমার জন্য হবে অনধিকার চর্চা। এ চিঠির ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য থাকলে বলতে পারেন আমি শোনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। উত্তরে তারেক বলেন, না বরং আপনিই বলুন আমি শুনছি। আপনার যা ইচ্ছা বলুন আমার কোন আপত্তি নেই। জেমস বেকার বলা শুরু করলেন, ৩০শে নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয় আপনার প্রেসিডেন্ট তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা এতে যার পর নাই অবাক হই। কারণ, আমরা ভাবতে বাধ্য হই যে, ১৭ টি তারিখের মধ্যে কোন একটি তারিখ ইরাকি প্রেসিডেন্টের মনঃপূত হলো না? কোনভাবেই ইরাকি

প্রেসিডেন্ট মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতে রাজি হলেন না তিনি আরো বলেন, আরব ও অনারব বিশ্বের একটি বড় জোট ইরাকের বিরোধী। আবেগপ্রবণ না হয়ে ধীর স্থিরভাবে বিষয়টি এখনও ইরাকের ভেবে দেখা উচিত। জেমস বেকারের কথা কেটে দিয়ে মিঃ তারেক আজিজ বলে ওঠেন, আরব। ঐক্যের প্রসঙ্গ বাদ দিন। আপনি খুব ভাল করে জানেন কীভাবে বর্তমান। আরব ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেকার বলেন, যদি আপনি আরবদেরকে নিজে ভাই বলেন তাহলে আমি বলব ইরাক নিজেই তার আরব ভাইদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতরণ। করেছে। মিঃ বেকারের মতে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে বর্তমান বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করাতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, ইরাক কল্পনাও করতে পারছে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে কী ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হবে। আমরা জানি ইরাকের কাছে রাসায়নিক ক্ষেপণাস্ত্রের বিরাট স্টক মওজুদ আছে। তবে আমার মনে হয় আপনারা এসব অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পাবেন না। আর যদি আমরা টের পাই যে, আপনারা এসব অস্ত্র ব্যবহার করতে যাচ্ছেন তাহলে মনে রাখবেন জবাবি হামলার কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। মিঃ তারেক আজিজ ভাবছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ তাকে ইরাকের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিচ্ছে। তাই তিনি বলেন আমরা নিশ্চয়ই এখানে কেউ কাউকে ধমকি দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়নি? তার কথাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে বেকার বলে চললেন আমি দুঃখের সাথে বলতে চাই যদি সত্য সত্যই যুদ্ধ হয় তাহলে আপনার সরকারের পরিবর্তে অন্যকোন সরকার ইরাকের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। ইরাকি প্রতিনিধিদের ধারণা ছিল মিঃ বেকারের কথা শুনে তারেক আজিজ ওয়াক আউট করবেন; কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি তাঁর কথা জারি রেখে বললেন, বাস্তবতার যে চিত্র আপনি তুলে ধরলেন আমাদের জন্য তা। নতুন নয়। আমরাও পরস্পরের শক্তি সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তারপরও আমি পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করে বলব, কুয়েত শুরু থেকেই ইরাকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বেকারের দ্বিতীয় হুঁশিয়ারীর উত্তরে তারেক আজিজ বললেন, যুদ্ধের পর বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারই ইরাকের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। তবে হ্যাঁ, আমাকে বলতে অনুমতি দিন, যুদ্ধের পর আপনাদের বন্ধু আরবদেশগুলির ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার। আরব জনগণই তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে। মিঃ বেকার বলেন, ইরাকের প্রাক্তন বন্ধুদেশগুলির বক্তব্য হচ্ছে সাদ্দাম তাদের সাথে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারকের বক্তব্য হচ্ছে ২৪শে জুলাই ১৯৯০ -এর সাক্ষাতে সাদ্দাম তাকে বলেছিলেন,

কুয়েত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের অর্থ কুয়েতের উপর হামলা করা নয়। অথচ ২রা আগস্ট সে কুয়েতের উপর হামলা করে বসে। এসময় তারেক আজিজ বাধা দিয়ে বলেন, ইরাকি নেতা যুদ্ধের পথে না গিয়ে বিভিন্ন। উপায়ে ইরাক -কুয়েত সংকট নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১লা আগস্টের জেদ্দা আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর ইরাক বাধ্য হয়ে কুয়েতের উপর হামলা করে বসে। তিনি বলেন, আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি এবং রাজনৈতিক বিজয়ও অর্জন করতে পারি। মিঃ বেকার আশা করি, আপনি আমাদেরকে যুদ্ধের ভয়ে ভীত করার চেষ্টা করবেন না। একটি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য আমরা আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করেছি। আমরা আমাদের প্রিন্সিপালিটি কখনও বিসর্জন দেইনি। একথার উত্তরে মিঃ বেকার বলেন, মেনে নিলাম আপনারা আপনাদের প্রিন্সিপালিটি বিসর্জন দেননি; কিন্তু তাই বলে কি অন্যদেরকে ভয় দেখানোর অধিকারও আপনাদের রয়েছে? এসময় মিঃ বেকার সাদ্দামের ঐ বিবৃতি তুলে ধরেন, যে বিবৃতিতে তিনি অর্ধেক ইসরায়েল রাসায়নিক অস্ত্র দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। তারেক আজিজ উক্ত বিবৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ইরাকের প্রতিরক্ষার বিষয়টি সামনে রেখেই এই বিবৃতি প্রদান করা হয়। না আমার মনে হয় এ ব্যাখ্যা ঠিক হলো না। জেমস বেকারের কথায় তারেক আজিজ খুবই অবাক হন। ভাবেন, সাদ্দাম হোসেনের বিবৃতির কি বিকৃত অর্থই না তিনি করেছেন। অথচ সাদ্দাম বলেছিলেন, ইরাককে যদি পারমাণবিক অস্ত্রের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়, তাহলে সে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করবে। তারেক আজিজ স্মরণ করিয়ে দেন, যে সাদ্দামের বিবৃতির এমন বিকৃত অর্থ করা হচ্ছে তিনিই এক সময় মধ্য প্রাচ্যকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তাব। দিয়েছিলেন। ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ তারেক আজিজ ও আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জেমস বেকারের মাঝে দিনভর এরূপ আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। কেবল উদাহরণস্বরূপ আমরা কয়েকটি বাক্য উপরে তুলে ধরলাম। আলোচনা চলাকালীন সময় মিঃ বেকার তিনবার মিঃ বুশের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। জেনেভার হোটেল ইন্টারকন্টেনিন্টাল সূত্রে বলা হয়, মিঃ তারেক আজিজ আলোচনার সময় একবারও বহির্বিশ্বের জন্য কোন কল বুক করাননি। অন্যান্য সূত্রও এই তথ্যের সত্যায়ন করেছে।

ইরাকের বক্তব্য ছিল, কোন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। অতএব ইরাকি নেতার সাথে তারেক আজিজের যোগাযোগের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। তাদের মতে জেনেভা আলোচনা ছিল একটি সাজান নাটক মাত্র। বিশ্ব বিবেককে প্রতারিত

করার জন্যই মার্কিনীরা এ নাটকটি মঞ্চায়িত করে। যাতে বিশ্ববাসী একথা বুঝতে সক্ষম হয় যে, উপসাগরীয় সংকটের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী মার্কিন ঘাঁটি স্থাপনের পাঁয়তারা যেহেতু পুরোদিন জেনেভায় তারেক আজিজ এবং জেমস বেকারের মাঝে আলোচনা চলতে থাকে তাই পশ্চিমা বিশ্বে ধারণা করা হয়, হয়তবা উভয়পক্ষ কোন মীমাংসার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অপরদিকে আরববিশ্বে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঘোষণা দেওয়া হয়, ঐ দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় উভয় দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি সম্মিলিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেবেন; কিন্তু ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সাংবাদিক সম্মেলনটি হোটেলের কামরায় বসে সিএনএন-এর সাহায্যে দেখেন।

মিঃ বেকার তার সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করলেন এভাবে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তার এ কথার দ্বারা সবাই বুঝল আলোচনা নিষ্ফল হয়েছে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, ইরাকের মনোভাবে কোন পরিবর্তন আসেনি। সে যদি কুয়েত খালি করে তাহলে তাকে এর কড়া মাসুল দিতে হবে এবং ধ্বংসাত্মক পরিণতির জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। জেম্‌স বেকারের পর তারেক আজিজও একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির জন্য আমেরিকা যদি কোন ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে তার সাথে ইরাকও শামিল হতে প্রস্তুত রয়েছে। সাদ্দামের নামে প্রেরিত মিঃ বুশের চিঠিটি গ্রহণ না করার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে মিঃ তারেক আজিজ বলেন, ঐ চিঠিতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা কূটনৈতিক রীতি-নীতি বিরুদ্ধ বিধায় আমার পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। যদি যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে ইরাক কি ইসরায়েলের উপর হামলা করে বসবে? এ প্রশ্নের জবাবে তারেক আজিজ বলেন, অবশ্যই ইসরায়েলের উপর হামলা করা হবে। যদিও তার জেনেভায় একরাত থাকার কথা ছিল; কিন্তু তিনি তড়িঘড়ি করে তখনই বাগদাদের উদ্দেশে রওনা দিলেন। যাতে কালবিলম্ব না করে ইরাকি রাষ্ট্রপতিকে আলোচনার রিপোর্ট পেশ করা যায়। বাগদাদ পৌঁছে তিনি সংবাদ পেলেন, রাষ্ট্রপতি স্বয়ং বর্তমানে রণাঙ্গনে রয়েছেন। পরদিন সাদ্দাম জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কাওয়াজা এর সাথে। আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত রইলেন। তিনি হলেন সাদ্দামের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং পরের দিনও তারেক আজিজের পক্ষে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হলো না। এরপর এক সময় আদ্যপান্ত রিপোর্ট শোনার পর অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সাদ্দাম বললেন, অবাক হওয়ার কিছু নেই, যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। ১২ই জানুয়ারী মার্কিন

প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেলকে ইরাকে ঝটিকা সফরে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন।

মিঃ প্যারেজডি কুয়ার এর জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, তাঁর মতে অনেক দেরি হয়ে গেছে; কিন্তু মিঃ বুশের বারবার অনুরোধে তিনি বাগদাদ যেতে রাজি হলেন। পরের দিন তিনি বাগদাদ পৌঁছে ইরাকি নেতার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। ইরাকি নেতার সাথে সাক্ষাতের পর তিনি বললেন, ইরাকি প্রেসিডেন্টের জন্য আমি কোন নতুন ম্যাসেজ নিয়ে আসিনি। আর কারো বিশেষত হিসাবেও আমি বাগদাদ সফর করিনি। বাগদাদ সফরের পর তিনি জাতিসংঘে না গিয়ে ইউরোপের উদ্দেশে রওনা হন। ইউরোপের উদ্দেশে রওনা হওয়ার পূর্বে তিনি বলেন, বাগদাদ এসে আমি জানতে চেয়েছিলাম যুদ্ধ ঠেকানোর কোন পথ বের করা যায় কিনা। জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেলের বাগদাদ সফরের পর ইরাক যে বিবৃতি প্রদান করে তাতে বলা হয়, ফিলিস্তিন সমস্যাকে আন্তর্জাতিক এজেন্ডায় নিয়ে আসার ব্যাপারে ইরাকি নেতার প্রচেষ্টাকে মিঃ পেরেজ ডি কুয়ার শ্রদ্ধার নজরে দেখেন, তিনি বলেন, মিঃ বুশ এই সমস্যার আশু নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইরাকি নেতা তাঁর ১২ই আগস্টের দেওয়া প্রস্তাবের ব্যাপারে বলেন, আমি জানতাম এই প্রস্তাবকে পুরোপুরিভাবে মেনে নেওয়া হবেনা; কিন্তু সেই সাথে একথাও কখনও কল্পনা করিনি যে, না দেখে না শুনেই আমাদের দেওয়া প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া হবে। মাত্র দু'ঘণ্টা পর মিঃ বুশ সাদ্দামের দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন, সাদ্দাম তার প্রস্তাবের সাথে একটি নকশা পেশ করেন। ঐ নকশায় দেখান হয় কুয়েত ইরাকি এলাকা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। ইরাকি নেতা দাবী করে বলেন, আমাদের কাছে এমন সব দলিল-প্রমাণ আছে যা প্রমাণ করে যে, কুয়েত ইরাকেরই অংশ। অতএব যখন আমাদেরকে কুয়েত খালি করার কথা বলা হয় তখন মনে প্রশ্ন জাগে কুয়েতের কোন অংশ খালি করব? কারণ, পুরো কুয়েতটাইত ইরাকের অংশ। একথার জবাবে মিঃ প্যারেজ ডি কুয়ার বলেন, আপনার বক্তব্য যদি এতোই যুক্তিযুক্ত হয় তাহলে আপনারা কেন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস- এ গিয়ে মুকাদ্দামা দায়ের করেন না? তিনি আরও বলেন, কুয়েতের উপর ইরাকি হামলার পর এ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদে যতগুলি প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না। কারণ, এগুলো নিরাপত্তা পরিষদ মঞ্জুর করেছে। একথা শুনে সাদ্দাম বলেন, আমি জানি এসব ছিল আমেরিকার মঞ্জুর করা প্রস্তাব। কারণ, যুগটাইত আমেরিকার। আলোচনার শেষ পর্যায়ে মিঃ ডি কুয়ার ইরাকি নেতাকে

বলেন, শান্তিপ্রক্রিয়ায় সার্বিক উন্নতির জন্য তার কাছে। কিছু গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব থাকা আবশ্যক। উত্তরে সাদ্দাম বলেন, প্রত্যেকটি পয়েন্টের উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমার মনে হয় আলোচনার জন্য আপনার কাছে অনেক কিছু আছে। উত্তরে ডি কুয়ার বলেন, আমার ভয় হয় আমি যদি কোন গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব পেশ না করতে পারি তাহলে তার কোন মূল্যায়নই হবে না। এরপর জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল বিফল আলোচনা শেষে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করেন আর তার পরপরই বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। কোন বিস্ফোরণ ছাড়াই ১৫ই জানুয়ারীর ডেডলাইন পার হয়ে গেল। ১৬ এবং ১৭ই জানুয়ারীর মধ্যবর্তী রাতে মিঃ বুশ শাহ ফাহাদকে রাত ১টা ২০মিনিটে টেলিফোনে সংবাদ দিলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। রাত ২টা ৩০ মিনিটের সময় এই একই ম্যাসেজ মিসরের হোসনী মুবারককে দেওয়া হলো। ওদিকে জেমস বেকার তার সোভিয়েত প্রতিপক্ষকে সময় মত এ সংবাদ পৌছে দিলেন আর তিনি দূরালাপনির সাহায্যে তার রাষ্ট্রপতি গর্বাচেভকে রাত ৩ টার সময় এ সংবাদ জানিয়ে দিলেন।

এ সংবাদ শুনে মিঃ গর্বাচেভ ক্রেমলীনে তার সহযোগীদের নিয়ে একটি তাৎক্ষণিক বৈঠক তলব করলেন। গর্বাচেভ বলেন, মিঃ বুশকে অনুরোধ জানান হোক তিনি যেন এই মুহূর্তে হামলা না করেন। সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জেমস বেকারকে গর্বাচেভের এ ম্যাসেজ ফোনের মাধ্যমে পৌছে দিলেন; কিন্তু না, অনেক দেরী হয়ে গেছে। ততক্ষণে ওদিকে হামলা শুরু হয়ে গেছে। ইরাক তার নিজের ধারণায় মিত্রবাহিনীর বিমান হামলার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তার কাছে ছিল যুদ্ধবিমানের একটি বিরাট বহর। মাটি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য অসংখ্য ক্ষেপণাস্ত্র। আর দশ হাজারের অধিক বিমান বিধ্বংসী তোপ। এতো সব অস্ত্রশস্ত্র থাকা সত্বেও অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম-এর শুরুতেই ইরাক মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মিত্র জোটের প্রধান লক্ষ্যস্থলসমূহের মধ্যে প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল ইরাকি বিমান বাহিনীর হেড কোয়ার্টার; যা ছিল বাগদাদ থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে। আমেরিকার অত্যাধুনিক স্টীলথ ফাইটার বিমানগুলি লিজার গাইডেড বোম ফেলে ফেলে ওর বারোটা বাজিয়ে দেয়। ১৬ এবং ১৭ই জানুয়ারীর মাঝরাতে এফ -১৫ এফ-১১, এফ-৬, এফ-৪বি এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক বিমান ইরাকের উপর মারাত্মক হামলা চালায়। একটি সাধারণ হিসাব অনুযায়ী ধারণা করা হয়, মাত্র ৪৩ দিনে মিত্রবাহিনী ইরাকের উপর সর্বমোট ৮৮ হাজার টন ওজনের বোমা নিক্ষেপ করে। এই কারণে ইরাকের

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পঙ্গুদশা সৃষ্টি হয়। মিত্র জোটের কামনা ছিল ইরাকের এস্কাড মিসাইল লাঞ্চ ও বিমান বাহিনীকে খতম করে দেওয়া। এক কথায় ইরাকের প্রতিরক্ষা শক্তিকে শেষ করে দেওয়াই ছিল মিত্র জোটের আসল উদ্দেশ্য।

শুরুতে এসব লক্ষ্যবস্তুর উপরই কেবল হামলা করা হয়। পরে অবশ্য ওদের লক্ষবস্তুসমূহ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আমেরিকানদের ইচ্ছা ছিল ইরাকের সামরিক শক্তিকে পংগু করে দেওয়ার সাথে সাথে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও শিল্প কেন্দ্রগুলিও ধ্বংস করে দেওয়া। যুদ্ধ শেষে ইরাকের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সা'দুন হাম্মাদী বলেন, মিত্র জোটের হামলায় বাগদাদে ২২ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। মিত্র জোটের উদ্দেশ্যসমূহের উপর একবার নজর বুলিয়ে দেখুন, সহজে প্রতীয়মান হবে যে, ওরা ইরাকের বিদ্যুৎ, পানি এবং টেলিফোন নেটওয়ার্ক ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। এমনকি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ সড়ক, পুলসমূহ উড়িয়ে দেওয়াও তাদের লিস্টে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমেরিকান কর্মকর্তাদের এসব সামাজিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ধ্বংস করে দেওয়ার পর ইরাকের বিরুদ্ধে আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ আরো বেশি কার্যকর করা সম্ভব হবে। তবে অধিকাংশ আরব নেতাদের ধারণায় ইরাকের ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ধ্বংস করে দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের পর ইরাক আগামী কয়েক বৎসর যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। যুদ্ধের পূর্বে ইরাক আধুনিক শিল্পোন্নত দেশগুলির কাতারে শামিল হয়ে পড়েছিল; কিন্তু মাত্র দু'মাস পর অর্থাৎ যুদ্ধের পর ইরাক পুনরায় তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির কাতারে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের কারণে সামরিক শক্তির সাথে সাথে ইরাকের বিদ্যুৎ, পানি, তেল ও টেলিফোন ব্যবস্থায় অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন হয়। যুদ্ধোত্তর ইরাকি জনগণের জন্য এসব সুবিধা পূর্বের তুলনায় এক চতুর্থাংশে এসে দাঁড়ায়। ইরাকের লাখ লাখ জনগণ এসব নাগরিক সুবিধাদি থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মারাত্মক ক্ষতির কারণে রাস্তাঘাট আবর্জনা আর দুর্গন্ধময় পানির সমুদ্রে পরিণত হয়। যার ফলে আমাশয় ও টাইফয়েড-এর মত রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়।

যুদ্ধের পূর্বে ইরাক তার প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৭০ ভাগসহ ৩৬০ মিলিয়ন ডলারের ওষুধ প্রতি বৎসর আমদানী করত; কিন্তু জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর বহির্বিশ্ব থেকে কোন জিনিস আমদানী করা তার জন্য আর সম্ভব রইল না। অর্থাৎ ইরাকি জনগণের স্বাস্থ্য হলো মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আশঙ্কা করা হয় দুর্ভিক্ষের কারণে হাজার হাজার ইরাকি মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে। এক রিপোর্টে

বলা হয় আগামী ১২ মাসে এক লাখ ৭০ হাজার শিশু মহামারী ও খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারে। মোটকথা মিত্র জোটের বিমান হামলার কারণে ইরাক অবর্ণনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পশ্চিমা জগৎ ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কার্যকর বিমান হামলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েওঠে। মিত্র জোটে শামিল আরব দেশগুলিও ছিল এর পক্ষে; কিন্তু আরব জনগণ ছিল এর বিপক্ষে। কারণ, তাদের ধারণায় তেল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই মার্কিনীদের পক্ষ থেকে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কুয়েতের কল্যাণার্থে এসব পদক্ষেপ আদৌ গ্রহণ করা হয়নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার। করলে দেখা যায় আরব জনগণের এ ধারণা মোটেও সমান নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার যষ্ঠ নৌবহর স্থায়ীভাবে লোহিত সাগরে এনে রাখা হয়। একথা প্রমাণের জন্য এটাই হয়ত যথেষ্ট যে, নিজের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিলে মধ্যপ্রাচের যে কোন ব্যাপারে নাক গলাতে আমেরিকানরা মোটেও দ্বিধাবোধ করবে না। এই নৌবহরে ছিল ২৭ হাজার সৈন্য, বিমানবাহী জাহাজ, দুইটি পারমাণবিক সাবমেরিন, ১২টি বড় ধরনের যুদ্ধ জাহাজ ও ১১টি সহযোগী জাহাজ। তুরস্কে স্থাপিত যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি সামরিক ঘাঁটিও আরবদের উক্ত ধারণাকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকানদের তত্ত্বাবধানে সৌদি আরবের দাহরানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন একথাই প্রমাণ করে যে, যে কোন অবস্থায় পরাশক্তি আমেরিকা তার স্বার্থরক্ষায় বদ্ধপরিকর। এটা ঠিক যে, এসব ঘাটিগুলি সৌদিরা নিয়ন্ত্রণ করত; কিন্তু সেই সাথে একথাও ঠিক যে, প্রয়োজনের সময় যেন আমেরিকানরা এসব ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারে এ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই এসব সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। আরব অঞ্চলে মার্কিনীদের সামরিক ঘাঁটির প্রয়োজনীয়তা ১৯৭৯ সালে দারুণভাবে অনুভূত হয়। এ সময় তেহরানে অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাসের কর্মচারীদেরকে জিম্মী বানান হয়। তখন তুরস্ক ও সৌদি আরবে স্থাপিত আমেরিকান ঘাঁটিগুলি থেকে সামরিক হামলার সাহায্যে জিম্মী মুক্তির ব্যাপার।

মার্কিনীরা যথেষ্ট চেষ্টা করে; কিন্তু উভয় দেশ একটি ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশের উপর আক্রমণের জন্য নিজ নিজ ভূখন্ড ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। মিসরের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ১৯৮০ সালে আমেরিকা সফর করেন। সে সময় ইরানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে মার্কিনীরা চিন্তা ভাবনায় লিপ্ত ছিল। জনাব সাদাত ইরানের বিরুদ্ধে। আক্রমণের জন্য মিসরের একটি সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। যদিও এই

ঘাটি তেমন কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম ছিল না; কিন্তু আমেরিকানদের জন্য এছাড়া আর কোন গতি ছিলনা, তবে শেষ পর্যন্ত মাকিনীদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ওদের প্রচুর পরিমাণ জনমালের ক্ষতি হয়। এই ক্ষতির কারণ এটাও ছিল যে, মাকিনীরা ইরানের নিকটবর্তী কোন সামরিক ঘাঁটি লাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৯ সালে মার্কিনীরা আশা করেছিল সম্ভাব্য ইরানী হামলাকে সামনে রেখে উপসাগরীয় দেশগুলি স্থায়ীভাবে তাদের অঞ্চলে আমেরিকান সেনা উপস্থিতিকে অনুমোদন করবে; কিন্তু শেষ অবধি তাদের এ আশা নিরাশায় পরিণত হয়। তবে হ্যাঁ ১৯৮৭ সালে মার্কিনীরা ওমান, বাহরাইন ও সৌদি আরবের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে সক্ষম হয়। চুক্তিটির সারকথা ছিল এই যে, প্রয়োজনের সময় এতদঞ্চলে স্বল্প সংখ্যায় মার্কিন সৈন্য মোতায়েন করা যাবে।

১৯৮০'র শেষ নাগাদ সৌদি আরবের বড় বড় সেনা ছাউনিগুলোকে সামরিক সাজ-সরঞ্জামে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে তোলা হয় যা মার্কিন বাহিনীর জন্য যে কোন ইমার্জেন্সী অবস্থায়প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ওমানও মার্কিন বন্ধুদের জন্য স্বল্প আকারে হলেও সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করে। তবে সৌদিদের ন্যায় তারাও মার্কিন সেনাদের স্থায়ী উপস্থিতি কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়। একথা ঠিক যে, সে সময় মিসরের সীনা নামক মরুভূমিতে আন্তর্জাতিক বাহিনী অবশ্যই মওজুদ ছিল। এ ছাড়া স্বল্পসংখ্যক মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতিকেও মিসর মেনে নেয়। তখন মিসরে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষজ্ঞদল। যারা এফ ১৫ ও এওয়াক্স বিমানের যৌথ মহড়ায়। সহায়তা করে। এতসব ব্যবস্থা নেওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় এসব আয়োজন যৎসামান্য। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের। ধারণায় যে কোন সংকটপূর্ণ অবস্থায় এসব সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। তাই প্রয়োজনের সময় ভারত মহাসাগরের দ্বীপ ডিয়াগোগার্সিয়ার সামরিক ঘাঁটির উপর ভরসা করতে হয়। অথবা জিবুতি থেকে ব্যবস্থা নিতে হয়; কিন্তু মার্কিনীদের জন্য শিরপীড়ার আসল কারণ। হলো ডিয়াগোগার্সিয়া অথবা জিবুতি অনেক দূরে অবস্থিত। মার্কিনীদের আশা কেবল তখনই পুরো হওয়া সম্ভব যখন কোন আরবদেশ তাকে স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি তৈরীর অনুমতি প্রদান করবে। অপারেশন ডিজার্টস্টমস -এর মাধ্যমে তাদের আশা আকাঙ্খার সফল বাস্তবায়ন ঘটে। যুদ্ধের সময় ইরাকের কাছে ছিল ১ হাজার ১০০ যুদ্ধ বিমান। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে একটা বড় ধরণের বিমানবহর বলা চলে। এই এগারশ' বিমানের মধ্যে কেবলমাত্র ৪ স্কোয়াড্রন ছিল মিগ-২৯। যাকে আধুনিক যুদ্ধ বিমান হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। আর বাকি যা ছিল তা সব ১৫/২০ বছরের পুরাতন । অপর

দিকে মিত্রজোটের কাছে ছিল অত্যাধুনিক বিমানবহর। পেশাগত যোগ্যতার দিক থেকেও ইরাকি পাইলটরা ছিল আমেরিকানদের তুলনায় অনেক নিম্নমানের। রাতের আঁধারে বিমান হামলায় আমেরিকান পাইলটরা ছিল পারদর্শী; কিন্তু ইরাকি পাইলটদের এ ধরনের কোন ট্রেনিংই ছিল না। এসব সামঞ্জস্যহীনতার কারণে মিত্রজোটের বিমান বাহিনীর মুকাবিলা করা। ইরাকি বিমানবাহিনীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাস্তব ঘটনা ছিল এই যে, ইরাকি বিমানবাহিনীকে হাওয়াই আক্রমণের পরিবর্তে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণের জন্যই বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছিল। ইরানের সাথে দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করার পরও ইরাকের এ শুভ বুদ্ধির উদয় হয়নি যে, বিমানবাহিনীকে কেবলমাত্র প্রতিপক্ষের বিমান হামলা প্রতিহত করার জন্য তৈরী রাখলে কোন যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

ইরাকি বিমানবাহিনী পর্যুদস্ত : এস্কাড ও প্যাট্রিয়ট আতংক

ইরাকি বিমানবাহিনীকে যদিও অফেনসিভ হামলার কাজে ব্যবহার করা হয়নি; কিন্তু তার আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার করণে বহুজাতিক জোটের বিমানবাহিনীকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ফলে, আমেরিকান বিমানবাহিনীর ১৪ টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়। অপর দিকে বিমানবাহী জাহাজের ১৫টি বিমান ইরাকিদের হামলার শিকারে পরিণত হয়। মিত্রজোটের অন্যদের ৮টি বিমান উপসাগরীয় যুদ্ধে ধ্বংস হয়। স্মরণ রাখতে হবে, উপরে দেওয়া এ পরিসংখ্যান যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহের। এখানে উল্লেখ্য, মিত্রজোটের বিমান হামলার শতকরা ৫৯ ভাগ বিমান হামলায় মার্কিনীরা অংশ নেয়। বাঁকি ২৫ ভাগ বিমান হামলা পরিচালনা করে আমেরিকান নৌবাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত যুদ্ধবিমান ও মেরিন বাহিনীর বিমানগুলি। তাহলে গড়ে দেখা যাচ্ছে, ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিমান হামলার শতকরা ৮৪ ভাগ পরিচালিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হতে। বাঁকি ১৬ ভাগ বিমান হামলায় অন্যরা অংশ নেয়। আমেরিকান নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী কেবল সংখ্যার দিক থেকেই নয় হামলা পরিচালনার ক্ষেত্রেও তারা ছিল অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক দিনের ভিতর একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইরাকি বিমান বাহিনী মিত্রজোটের বিমান হামলা মুকাবিলা করতে অক্ষম। মিত্রজোটের বিমান হামলার কারণে ইরাকি এয়ারপোর্টগুলি আর ব্যবহারের উপযোগী থাকেনি। ফলে, ইরাকি বিমানবাহিনীর একটি বড় অংশ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে বেকার হয়ে পড়ে। তখন মিত্রজোট মনে করে ইরাকি পাইলটরা হয়ত নিরাশ হয়ে গেছে তাই তাদেরকে বিমানবাহিনী থেকে অপসারণ করা হয়েছে। আসলে বাস্তব চিত্র এমন ছিল না যেমনটি মিত্রজোট মনে করে। আসল ব্যাপার ছিল এই যে, প্রতিদিন গড়ে ইরাকের ৭/৮ টি বিমান ধ্বংস হচ্ছিল অপরদিকে ইরাক তার এই ধ্বংস কম করার কোন পথ খুজেঁ পাচ্ছিল না। কারণ, মিত্রজোটের বিমানগুলি ছিল অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত। তাই বাধ্য হয়ে বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের নির্দেশে ইরাকি বিমানবাহিনী আক্রমণাত্মক বিমান হামলা বন্ধ করে দেয়।

ইরাকিরা মার্কিন ও মিত্র শক্তির শক্তিশালী বিমানবাহিনীর কথা আগে থেকে জানত। তাই তারা তাদের সকল যাত্রীবাহী ও বড় বড় কারগো বিমান জর্ডান, সুদান এবং ইয়েমেনে পৌঁছে দেয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় কেবল মাত্র

যুদ্ধবিমানগুলিই ইরাকের কাছে অবশিষ্ট ছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইরাকি যুদ্ধবিমানগুলিও জর্ডানে পাঠিয়ে দেওয়া নিরাপদ মনে করা হয়; কিন্তু জর্ডান পাঠান হলে অনেকে মনে করতে পারত এই যুদ্ধে জর্ডান হয়ত ইরাকের সহযোগী। তাই জর্ডান এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। ইরাকের প্রতিবেশি আর একটি দেশ ছিল, যে কোন পক্ষে যায়নি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে ছিল নিরপেক্ষ। সেই দেশটির নাম হলো ইরান। যুদ্ধ শুরুর এক সপ্তাহ পর তাই ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যুদ্ধ জাহাজগুলি ইরানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ইরাকি পাইলটদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তারা যেন ইরানে প্রবেশের চেষ্টা করে। ইরাকি পাইলটদের ইরানে পৌঁছা এত সহজ সাধ্য ছিল না। বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনার উপর বহুজাতিক বাহিনীর বার বার হাওয়াই হামলার কারণে ইরাকি বিমানবন্দরগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। দক্ষিণ ইরাকে বিমানবন্দরগুলি মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় ছিল। ফলে, ইরাকি বিমানবাহিনীর একটি বিরাট অংশ ইরান পৌঁছতে সক্ষম হয়। কিছুসংখ্যক বিমানকে ইরান প্রবেশের পূর্বে গুলি করে ভূপাতিত করা হয়। ইরাকিদের ভাষ্য অনুযায়ী ১৩৫টি বিমান ইরান পৌঁছতে সক্ষম হয়। ইরাক সরকার একদিকে ইরাকি পাইলটদেরকে ইরান প্রবেশের নির্দেশ দেয়। অপর দিকে সে ইরান সরকারকে অনুরোধ জানায় যে, তার বিমানগুলোকে যেন ইরানের অভ্যন্তরে বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইরান-ইরাকের মাঝে যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য শুরু হয়। ইরাকিরা দাবী করে যে তাদের ১৩৫টি বিমান ইরান পৌঁছেতে সক্ষম হয়। অপরদিকে ইরানের ভাষ্য ছিল, ইরাকের মাত্র ২৩ টি বিমান তার দেশে পৌঁছেছে। ইরাকি বিমানবাহিনী ময়দান ছেড়ে পালাবার পর মিত্রজোটের বিমানগুলি ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া শুরু করে। তখন কেবল তাদের একটাই ভয় ছিল তা হলো ইরাকে বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষতঃ স্যাম ক্ষেপণাস্ত্র। ওগুলো ছিল খুবই মারাত্মক, বৃটেনের একটি টর্নেডো বিমানে লেগেছিল ঐ ক্ষেপণাস্ত্র আর সাথে সাথেই তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তবে আস্তে আস্তে বিমান বিধ্বংসী প্রতিরক্ষামূলক এই ব্যবস্থারও মাজা ভেঙে যায়। কারণ, আমেরিকানরা আকাশ থেকে মাটিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে ইরাকের অধিকাংশ রাডার স্টেশন ধ্বংস করে দেয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার দিনগুলিতে মিত্রজোটের যুদ্ধবিমানগুলি ২৫ হাজার ফিটের নীচে আসেনি; কিন্তু স্যাম ক্ষেপণাস্ত্রের ভয় দূরীভূত হওয়ার পর মিত্রজোটের বিমানগুলি মাত্র ১০ হাজার ফিট উপর থেকে বোম্বিং শুরু করে। তখন এর নীচে আসা তাদের পক্ষে

সম্ভব ছিল না। কারণ, বিমান বিধ্বংসী তোপগুলো ১০ হাজার ফিটের কম উচুঁ দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমানকে সহজে ভূপাতিত করতে পারে।

মিত্রজোটের বিমানগুলি ইরাকের কি পরিমাণ ক্ষতি করেছে তা ফাউন্ডেশন অব ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এর এয়ার ভাইস মার্শাল আর, এ, মিসনের রিপোর্ট দ্বারা অনুমান করা যায়। এই রিপোর্টটি তিনি উপসাগরীয় যুদ্ধের পরপর তৈরী করেন। মিঃ আর, এ মিসনের মতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র ১০ দিনের ভিতর ইরাকের ৪২টি পুল এবং ৭০ টি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ইরাকের এক তৃতীয়াংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে (ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত) কুয়েতে অবস্থানরত ইরাকি বাহিনীর জন্য খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহ ৯০ ভাগ কম হয়ে যায়। এসময় ইরাকের বড় বড় তেলের ডিপো এবং অস্ত্রশস্ত্রের বড় বড় গুদামও ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

ইরাকি বাহিনী রাতের আঁধারে নৌযানের সাহায্যে ব্রিজ বানাবার চেষ্টা করে; কিন্তু মিত্রজোটের রাতের আঁধারে হামলা করতে সক্ষম বিমানগুলি ইরাকিদের এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করে দেয়। মোটকথা প্রতিদিন ইরাকের প্রতিরক্ষা শক্তি দুর্বল হতে থাকে। ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, মিত্রজোটের হামলায়প্রতিদিন গড়ে ইরাকের ১০০ ট্যাংক ধ্বংস হতে থাকে। ফলে, ইরাকের স্থল প্রতিরক্ষাও দুর্বল হয়ে পড়ে। আর, এ, মিসন তার রিপোর্টের শেষ প্রান্তে লেখেন। পরিসংখ্যানের সাহায্যে মিত্রজোটের সফলতা প্রমাণ করা যায়। বহুজাতিক বিমানবাহিনীর বিমানগুলি এক সাথে তিন হাজার হামলা চালায়; কিন্তু তাদের ধ্বংস হয় মাত্র ৬০টি বিমান। অপর দিকে ইরাকের ধ্বংস হয়। ১৪১টি বিমান। মিত্রজোটের বিমান হামলার সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নৌবাহিনী মিলে ইরাকের গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্রবাহী জাহাজগুলি ধ্বংস করে দেয়। এসব জাহাজ ধ্বংস করা ওদের জন্য ছিল সহজ। কারণ, উপর আকাশ থেকে ভূমিতে ফায়ার করার মত কোন ক্ষেপণাস্ত্র ইরাকের কাছে ছিল না। ইরাকের যেসব জাহাজ বারুদবোম বিছানোর প্রচেষ্টা চালায় তাদেরকে সহজেই ঘায়েল করা হয়। কুয়েতের বুবিয়ান ও অরবা নামক দ্বীপদ্বয়ের আশপাশে গভীর পানিতে যে বারুদবোম বিছানো হয় মিত্রজোটের সমুদ্র জাহাজ ওগুলো ওখান থেকে সরিয়ে ফেলে। এই যুদ্ধে আমেরিকান নৌবাহিনীর কেবল মাত্র তিনটি জাহাজের ক্ষতি সাধন হয়।

যে কোন যুদ্ধে বিমান বাহিনী যে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা জেনারেল কোলান পাওল-এর একটি বক্তব্য দ্বারাই সহজে অনুমান করা যায়। ইরাকের বিরুদ্ধে স্থল হামলার পূর্বে মিঃ পাওল মার্কিন সিনেটের আর্ম সার্ভিসেস কমিটিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, বিমানবাহিনীই যুদ্ধে সব থেকে বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আমি মনে করি আগামী দিনগুলিতে বিমানবাহিনী আরও কার্যকর ভুমিকা পালন করবে।

মিত্রজোটের বিমান হামলার পূর্বে সাধারণভাবে মনে করা হয় ইরাকের এস্কাড মিসাইলগুলো মিত্রজোটের বিমান হামলার দাঁত ভাঙা জবাব দেবে। এই ধারণার পিছনে অবশ্য যুক্তি সঙ্গত কারণও ছিল। তাহলো এস্কাড মিসাইল রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার শক্তি রাখে। ইরাকের পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস ছিল, ইসরাইলের উপর এস্কাড মিসাইল ছুঁড়লে যুদ্ধের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হতে বাধ্য। কুয়েত দখল করার কারণে ইরাক সারাবিশ্বে ধিকৃত হয়। তার ধারণায় ইসরাইলের উপর এস্কাড হামলার সুবাদে সে তার হৃত মর্যাদা পুনরায় ফিরে পেতে পারে। সেই সাথে কোটি কোটি আরব জনগণের সমর্থন ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়েওঠে। ১৮ই জানুয়ারী ইরাক ইসরাইলের উপর প্রথম এস্কড মিসাইল নিক্ষেপ করে। ফলে, আরব জনগণের মাঝে খুশীর বন্যা বয়ে যায়। এমনকি যেসব আরব দেশ মিত্রজোটে অন্তর্ভুক্ত ছিল সেসব দেশের জনসাধারণও খুশীতে আত্মহারা হয়েওঠে।

আরব ইসরাঈল বিরোধ কোন নতুন ঘটনা নয়। গত ৪০ বছর ধরে এই বিরোধ চলছে; কিন্তু ইসরাইলের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ এই ধরনের হামলা করতে পারেনি। ইরাকই একমাত্র দেশ যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে এস্কাড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়। ইরাক তো পূর্ব হতেই আশাবাদী ছিল যে, ইসরাইলের বিরুদ্ধে এস্কাড নিক্ষেপ করলে মিত্রজোটে শামিল আরব দেশগুলির ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠবে। আর বাস্তবেও হলো তাই। ফলে, মিশরীয় প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক আর সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ দীর্ঘ শলাপরামর্শের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ইসরাইল যদি এই মুহূর্তে প্রতিশোধমূলক হামলা চালায় তাহলে অবস্থা আমাদের জন্য বড় বেগতিক হয়ে পড়বে। সবার একটা সাধারণ ধারণা ছিল, ইসরাইল অবশ্যই ইরাকের উপর হামলা করে বসবে। ইসরাইলের উপর ইরাকি হামলার কয়েকদিন পর পর্যন্ত আরব রাষ্ট্রপতিদেরকে তাদের জনগণের আবেগ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়। আরব জনগণের দাবী ছিল

এই নাজুক পরিস্থিতিতে ইরাককে সমর্থন দেওয়া হোক। ২৪শে জানুয়ারী পর্যন্ত ইরাক ইসরাইলের উপর তিনটি এস্কাড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ওই তারিখে হোসনী মুবারক একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ঐ বিবৃতিতে বলা হয়, ইরাকি হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত প্রতিটি দেশ তার প্রতিরক্ষার অধিকার রাখে। আরব বিশ্ব তার এই বিবৃতি মোটেও সুনজরে দেখেনি। সিরিয়া যদিও এ ধরনের কোন বিবৃতি প্রদান করেনি; কিন্তু সিরিয়া থেকে উক্ত বিবৃতিকে বার বার প্রচার করা হয়। এর দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, সেও মিসরের সাথে একমত। এ সময় ইসরাইল সরকার অভ্যন্তরীণভাবে দারুণ চাপের সম্মুখীন হয়। সকলের একই দাবী ইরাকি হামলার দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হোক।

১৯৭৩- এর আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সুবাদে অধিকাংশ ইসরাইলী জনগণের হিরো উগ্রবাদী নেতা এরিল শোরান ইরাকের উপর জবাবী হামলার জন্য বিশেষভাবে সরকারের উপর বার বার চাপ প্রয়োগ করছিলেন। ইসরাইল সরকার এই চাপ কম করার জন্য একটি বিবৃতি প্রদান করে। তাতে বলা হয়, ইসরাইল ইরাকি হামলার সমুচিত জবাব দেবে। তবে কবে? এ সিদ্ধান্ত একান্তভাবে ইসরাইল সরকারকেই নিতে হবে। আসল ঘটনা হলো ১১ই ডিসেম্বরের ওয়াশিংটন বৈঠকে বুশ- শামির এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইরাক যদি ইসরাইলের উপর হামলা করে তাহলে আমেরিকার অনুমতি ছাড়া ইরাকের বিরুদ্ধে সে কোন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। মিঃ বুশ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে- বলেন, এর বিনিময়ে আমেরিকা ইসরাইলের পরোপুরি হেফাজত করবে। আর সে ইরাককে শায়েস্তা করতে গিয়ে ইসরাইলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে দেবে না।

ইসরাইল আশাবাদী ছিল যে, যুদ্ধের পর ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমেরিকা তার উপর আগের মত প্রেসার দিবে না। এসকল আশ্বাস আর আশা-ভরসার পরও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইরাক যদি ইসরাইলের উপর রাসায়নিক অস্ত্রসজ্জিত এস্কাড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করত তাহলে প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে কৃত চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসরাইলের জন্য সম্ভব হয়ে উঠত না। ২৫শে জানুয়ারী ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের নিকট প্রস্তাব দেয় যে, ইসরাইলের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্রসজ্জিত এস্কাড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হোক; কিন্তু সাদ্দাম কাউন্সিলের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন। এর কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, ১০ই জানুয়ারী জেনেভা বৈঠকে জেমস বেকার তারেক আজিজকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, ইরাক যদি রাসায়নিক অস্ত্র

ব্যবহার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হবে। পরে ইরাক জাতিসংঘের কাছে স্বীকার করে যে, ৩৫৭টি ওয়ারহেডকে সে রাসায়নিক অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার না করা অথবা এস্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের গুরুত্ব কমে যাওয়ার পিছনে কারণ হিসাবে শামির-বুশ এবং আজিজ-বেকার বৈঠককে উল্লেখ করা হয়। ইরাকের রাসায়নিক ও এস্কাড ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়াও উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকান প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ক্ষেপনাস্ত্রটি ইরাক থেকে নিক্ষিপ্ত অধিকাংশ এক ক্ষেপণাস্ত্রকে মাঝপথেই ধ্বংস করে দেয়।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ রিগানের স্টার ওয়ার হেমকে সামনে রেখেই এই ক্ষেপণাস্ত্রটি তৈরী করা হয়। যাতে ইউরোপে মোতাযেন ন্যাটো বাহিনীপ্রয়োজনে এগুলো ব্যবহার করতে পারে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পুর্বে ডিসেম্বর মাসে ইসরাইলকে দু'টি প্যাট্রিয়ট ব্যাটারী সরবরাহ করা হয়। ১৮ই জানুয়ারী ইসরাইলের উপর এক হামলার পর আমেরিকানরা জার্মানী থেকে আরও দুটি প্যাট্রিয়ট ব্যাটারী ইসরাইলে পৌঁছে দেয়। এ ছাড়া ৬০টি প্যাট্রিয়ট লাঞ্চার সৌদি আরবে স্থাপন করা হয়। যুদ্ধের সমঝ ৩৯ এস্কাড ক্ষেপণাস্ত্র ইরাক ইসরাইলের উপর নিক্ষেপ করে। এ ধরণের ৩৬টি ক্ষেপনাস্ত্র সৌদি আরবের উপর ও নিক্ষেপ করা হয়। এসব এস্কাডের মধ্যে ৪৫টিকে প্যাট্রিয়ট মাঝপথে ধ্বংস করে দেয়। অধিকাংশ এস্কাড তার লক্ষ্যবস্তুর সামান্য উপরে অর্থাৎ জনবসতিপূর্ণ শহরের উপর ধ্বংস করা হয়। ফলে প্যাট্রিয়ট ও এস্কাডের ধ্বংসাবশেষ শহরের উপর পড়ার কারণে শহরবাসীর মারাত্মক ক্ষতি হয়।

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় রিয়াল ও দাহরানে নিক্ষিপ্ত এস্কাডগুলি প্যাট্রিয়টের সাহায্যে ধ্বংস হতে দেখে। এসব দৃশ্য মনবস্তুগত ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। তবে জেনারেল শেরাজকোভের ভাষায় সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরণের দৃশ্য টিভির পর্দায় দেখান ঠিক নয়। তাঁর মতে এস্কাড মিসাইলের সাহায্যে যদি রাসায়নিক অস্ত্র ও ব্যবহার করা হতো তারপরও মৃতের সংখ্যা হতো অনেক কম। কারণ, টেকনিক্যাল দুর্বলতার কারণে এসব ক্ষেপণাস্ত্র মূল টার্গেট পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বেই মাঝপথে বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

জেনারেল শোরাজকোভের অভিমত কতটুকু বাস্তবসম্মত সে বিতর্কে না গিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এস্কাড মিসাইলের ধ্বংস ক্ষমতা সম্পর্কে

আমেরিকানদের ধারণা মোটেই নির্ভুল ছিল না। যুদ্ধের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা ছিল, ইরাকের কাছে বেশির বেশি ১৬ থেকে ১৮টি এস্কাড আছে।

এস্কাড ধ্বংস হবার পর শোরাজকোভ হাল ছেড়ে বাঁচলেন। যাক এস্কাড যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল। আসলে কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল অন্যরূপ। যুদ্ধ শেষ হবার পর জানা গেছে ইরাকের পনেরটি ব্যাটালিয়ান এমন ছিল যাদের প্রত্যেকের কাছে ১০টি করে এস্কাড লাঞ্চার ছিল। এদের প্রত্যেকটি ব্যাটলিয়ান রণক্ষেত্র থেকে দূরে মোতায়েন ছিল। পশ্চিম ইরাকে বড় বড় ট্রলারের উপর এস্কাড লাঞ্চার স্থাপন করা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা এজন্য নেওয়া হয়েছিল যে, যে কোন বিপদ মূহুর্তে তাদেরকে যেন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। সৌদি আরব ও ইসরাইলে নিক্ষিপ্ত যেসব এস্কাডকে প্যাট্রিয়ট ঘায়েল করতে পারেনি তার কয়েকটি বসত এলাকা থেকে দূরে বিস্ফারিত হয়। যার ফলে তেমন একটা জান মালের ক্ষতি হয়নি; কিন্তু কিছু কিছু এস্কাড জান-মালের দারুণ ক্ষতি করেছে। ২৬ শে ফেব্রুয়ারীতে সৌদি আরবের উপর যে এস্কাডটি নিক্ষেপ করা হয় তা দাহরানে ফৌজি ব্যারাকের উপর বিস্ফারিত হয়। ফলে, ২৭ জন আমেরিকান নিহত হয়। আর আহত হয় ৯৮ জন। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েওঠে যে, মাত্র দু'এক সপ্তাহের ভিতর স্থল হামলা শুরু হয়ে যাবে। এ সময় মিঃ গর্বাচেভের বিশেষ দূত মিঃ প্রেমাকোভকে তৃতীয় বারের মত বাগদাদ প্রেরণ করা হয়। তিনি সাদ্দামকে নিঃশর্তে কুয়েত খালি করে দেওয়ার অনুরোধ জানান। প্রেমাকোভ বাগদাদের কেন্দ্রে অবস্থিত রাষ্ট্রিয় অতিথি ভবনে ইরাকি নেতৃবৃন্দের সাথে এক সাক্ষাতে মিলিত হন। ইরাকি নেতৃবৃন্দকে তিনি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ইরাকের যথা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে কুয়েত থেকে নিঃশর্তে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া উচিত। কাফেরদের হাতে মুসলিম সৈন্যদের জীবন্ত সমাধি ইরাকি নেতা এ বিষয়ে তার সাথীদের সাথে দীর্ঘ শলাপরামর্শের পরও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ব্যর্থ হন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারেক আজিজ গেলেন মস্কো। সোভিয়েত নেতাদেরকে তিনি জানালেন, তাদের দেওয়া প্রস্তাবটি ইরাকিরা গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখেছে। তাদের বিবেচনার ফলাফল সম্পর্কে অতিসত্তর সোভিয়েত নেতৃবৃন্দকে অবহিত করা হবে। ১৫ই

ফেব্রুয়ারী ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল ঘোষণা দেয় যে, নিরাপত্তা পরিষদের মঞ্জুরীকৃত ৬৬০ নং প্রস্তাবটি কার্যকর করতে ইরাক প্রস্তুত রয়েছে। এই ঘোষণায় ইরাক অনেকগুলি শর্ত আরোপ করে। মিঃ গর্বাচেভ ১৮ই ফ্রেব্রুয়ারী তারেক

আজিজের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, কুয়েতের নাম উল্লেখ করে। সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে হবে। উল্লেখ্য, ইরাকের আগের ঘোষণায়। কুয়েতের নাম উল্লেখ ছিল না। তিনি আরও বলেন, কবে নাগাদ ইরাক সৈন্য প্রত্যাহার করতে চায়, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট দিন তারিখেরও ঘোষণা দিতে হবে। পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাককে এই জামানত দিতে প্রস্তুত রেয়েছে যে, কুয়েত থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ইরাকি সৈন্যদের উপর হামলা করা হবে না। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, নিঃশর্ত ও পরিপূর্ণ সৈন্য প্রত্যাহার ব্যতীত অন্য কিছুই আমেরিকার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। ২০ শে ফেব্রুয়ারী মিঃ তারেক আজিজ যখন দ্বিতীয়বার গর্বাচেভের সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন সবার কাছে এ বিষয়টি পরিষ্কার ছিল যে, তারেক আজীজের হাতে আর বেশি সময় নেই। তাঁকে খুব তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ প্রতিপক্ষ মিত্রজোট স্থল হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছে। ২১ শে ফেব্রুয়ারী বেলা তিনটা। গর্বাচেভের মুখপাত্র ঘোষণা দিলেন, ইরাকের সাথে কয়েকটি বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি। যেমন, ইরাক নিরাপত্তা পরিষদের ৬৬০ নং প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মতি জানিয়েছে এবং কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারেও সে রাজি আছে। কিন্তু কবে নাগাদ ইরাক কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে সে বিষয় গর্বাচেভের মুখপাত্রের ঘোষণায় কিছুই বলা হয়নি। সোভিয়েত নেতা টেলিফোনের সাহায্যে এই সংবাদ বুশকে অবহিত করলে মিঃ বুশ তার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তবে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, আমেরিকা তার নীতিতে সম্পূর্ণ অবিচল। সে তার নীতিতে সামান্যতম পরিবর্তন আনতে অপারগ। এ জন্য আমরা দুঃখিত। ঐদিন মিঃ বুশের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা দেওয়া হয়। ঐ ঘোষণায় ইরাককে আগামী ৪৮ ঘণ্টার ভিতর কুয়েত খালি করে দিতে বলা হয়। এই ডেডলাইনটি নিউইয়র্কের সময় অনুসারে দেওয়া হয়।

২২ শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম তার ভাষণে বলেন, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে জানিয়েছেন, যদি ইরাক সৈন্য প্রত্যাহারে রাজি হয় তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং নতুন করে আলাপ-আলোচনা শুরু করা হবে। আমরা কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে প্রস্তুত; কিন্তু মিঃ বুশের বক্তব্যে আমরা দুঃখিত। কারণ, তিনি বলেছেন, ইরাকের যুদ্ধ বন্ধ প্রস্তাব একটি কূটনৈতিক চাল ছাড়া আর কিছুই নয়। যুদ্ধ যেমন চলছে তেমন চলতে থাকবে; কিন্তু আফসোস! আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করতেও আমেরিকানরা প্রস্তুত নয়। গর্বাচেভ বারবার তারেক আজিজের উপর চাপ দিতে থাকেন, ইরাককে

আরও নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং তারেক আজিজ পুনরায় বাগদাদের সাথে যোগাযোগ করে ইরাকি নেতৃবৃন্দকে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের মতামত সম্পর্কে অবহিত করেন। ২২ শে ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কের সময় অনুযায়ী সন্ধ্যা ছয়টা আর মস্কোর সময় অনুযায়ী ২০ শে ফেব্রুয়ারী সকাল। ২টায় ইরাকের পক্ষ থেকে গর্ভাচেভের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেওয়া হয়। যুদ্ধোত্তর তারিক আজিজ জানিয়েছেন, নিঃশর্ত ও কালবিলম্ব না করে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে ইরাক রাজি ছিল; কিন্তু তার ছিল একটি দাবী। আর তাহচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদে ইরাকের বিরুদ্ধে যতগুলি প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয়েছে সেগুলি সব রহিত ঘোষণা করতে হবে। সোভিয়েত নেতারা মনে করেন, আমেরিকা ইরাকের এই দাবিকে শর্ত হিসাবে ধরে নেবে। তারপরও সোভিয়েত নেতা প্রেসিডেন্ট বুশকে ফোন করে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে আহ্বান করেন; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সোভিয়েতপ্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে তারা তাদের পুরাতন অবস্থানের উপর অবিচল থাকেন। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর ইরাক যদি কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার না করে তাহলে অনতিবিলম্বে তার উপর স্থলপথে আক্রমণ শুরু করে দেওয়া হবে। জেনারেল শোরাজকোভ ১০ই নভেম্বরের ভিতর স্থলপথে আক্রমণের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেন। স্থলপথে আক্রমণের যে নীল নকশা তৈরী করা হয় তার গোপন নাম দেওয়া হয় "হীলমেরী"। মিত্রজোট মনে করে ইরাকি বাহিনী কুয়েতে অবস্থান নেওয়ার

কারণে সৌদি আরব সংলগ্ন ইরাক সীমান্ত সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। মিত্রজোট প্রথমে আকাশপথে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা করে। এই কারণে দীর্ঘ একমাস যাবৎ তারা ইরাকের উপর বিমান হামলা চালায়। তারপর তারা স্থলপথে আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী দীর্ঘপথ অতিক্রম করে কুয়েতে মওজুদ ইরাকি বাহিনীর উপর পিছন দিক থেকে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া হয়। মিত্রবাহিনীতে যোগদানকারী অনেক জেনারেল মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে থাকেন সৌদি আরব সংলগ্ন ইরাকি সীমান্ত এভাবে অরক্ষিত রাখাটাও হয়ত ইরাকের একটা কূটচাল বা ষড়যন্ত্র । এই ষড়যন্ত্রের জালে আটকে ফেলে ইরাক হয়ত তাদেরকে নাস্তানাবুদ করতে চায়। অথচ বাস্তব অবস্থা ছিল অনড়রুপ। ইরাকিদের ধারণা ছিল তাদের বিরুদ্ধে এপথে পরিচালিত কোন আক্রমণই কার্যকর হবে না। জনৈক ইরাকি অফিসার যুদ্ধশেষে মিত্রজোটের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর স্বীকার করেন যে, ইরাকিরা মনে করে সম্পূর্ণ বালুকাময় মরুভূমি পথে আক্রমণ পরিচালনার মত সৎসাহস মিত্রজোটের নেই। কারণ, এ পথে অগ্রসর হলে তারা

নির্ধারিত পথ হারিয়ে বিপাকে পড়বে। আসলে ইরাকিরা জানত না যে, মিত্রজোটের কাছে এমন অত্যাধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে, যার সাহায্যে তারা যে কোন অভিযানে সঠিক দিক নির্দিষ্ট করার সামর্থ্য রাখে। এ ছাড়া তারা স্যাটেলাইট শক্তিতেও ছিল বলীয়ান। স্থলপথে আক্রমণ শুরু করার পূর্বে দুইমাস পর্যন্ত জেনারেল শোরাজকোভ এই দুশ্চিন্তায় ছিলেন অস্থির যে, যেকোন মুহূর্তে ইরাক তার প্রতিরক্ষা শূন্যতা পূরণ করতে পারে। জেনারেল শোরাজকোভের সৌভাগ্য বলতে হবে, ইরাকিরা এ শূন্যতা কখনও পূরণ করার চেষ্টা করেনি; বরং তারা সর্বদা তাদের কুয়েতী মোর্চাগুলি শক্তিশালী করার কাজেই নিয়োজিত থাকে। তাদের সর্বদা ধারণা ছিল মিত্রজোট সম্মুখ দিক থেকে তাদের উপর হামলা করবে। মিত্রজোটও তাদেরকে সর্বদা এই ভুল ধারণায় লিপ্ত রাখে। কারণ, তাদের সকল আনাগোনাই ছিল কুয়েত সীমন্তের দিকে।

২৩ শে জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল কোলান পাওল বলেন, ইরাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের স্ট্রাটেজি খুবই সাদাসিধা ধরণের। আমরা

তাদেরকে প্রথমে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করব তারপর তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় মিত্রজোট তাদের উদ্দেশ্যে সফল ছিল। ৩০ শে জানুয়ারী ইরাকি সৈন্যরা সৌদি সীমান্ত অতিক্রম করে খাফজী দখল করে নেয়। খাফজী একটি মহকুমা শহর সৌদিরা আগে ভাগেই ঐ শহরটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এ বিজয়ের ফলে সাদ্দাম মনে করেন, স্থলযুদ্ধে ইরাকি বাহিনীই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে।

ইরাকিদের আন্তরিক কামনা ছিল আমেরিকানদের মৃতের সংখ্যা অধিক থেকে অধিকতর করা। তাদের ধারণায় এই যুদ্ধ যদি একমাস যাবৎ চলতে থাকে আর যদি এক হাজার সৈন্যের লাশ আমেরিকায় পাঠান হয় তাহলে আমেরিকার জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে। এই ধারণার ভিত্তি ছিল ১৯৮৩ সালের দুটি ঘটনা। ১৮ই এপ্রিল ১৯৮৩ লেবাননের বৈরুতে অবস্থিত আমেরিকান দুতাবাসে এক বোমা হামলায় ৬৭ জন আমেরিকান দূতাবাস কর্মচারী মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ২৩শে অক্টোবর ১৯৮৩ তে। ঐদিন আমেরিকান সেনাবাহিনীর একটি ব্যারাকে একটি কারবোম হামলায় ২৪১ জন মেরিন নিহত হয়। এই দুইটি ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট রিগান বাধ্য হয়ে আমেরিকান সৈন্য

আমেরিকায় ফিরিয়ে নেন। খাফজী আক্রমণকালে মাত্র ১৩ জন সৈন্য নিহত হয়। পূর্বের দুটো ঘটনার তুলনায় এই সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য।

মার্কিন বাহিনীর নিগ্রো সিপাহীদের উপরও ইরাকের একটা আশা-ভরসা ছিল। মার্কিন সেনাবাহিনীর শতকরা ৩০ ভাগ নিগ্রো। ইরাকের পক্ষ থেকে নিগ্রোদের মাঝে এ ধারণা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করা হয় যে, তাদেরকে মারার জন্যই মার্কিন শ্বেতাঙ্গরা আরবের মরু এলাকায় ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাঠিয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ সেনাদেরকে যুক্তরাষ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ বেতার থেকে রীতিমত একটি অনুষ্ঠানও সম্প্রচার করা হয়। অপরদিকে ইরাকি জনগণকে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়েতোলার উদ্দেশ্যে ভয়েস অব আমেরিকা, তেল আবীব ও তুর্কী বেতারগুলো থেকে এক যোগে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। ভয়েস অব আমেরিকা, রেডিওমন্টিকারলো ও বি বি সি -এর আরব অনুষ্ঠান প্রতিদিন ইরাকসহ অন্যান্য আরবদেশে ১০ ঘণ্টা করে শোনার ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে সি, এন, এন- এর প্রোগ্রামগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ, সি এন এন-এর প্রোগ্রাম অধিকাংশ আরব দেশে দেখা হয়। বাগদাদের উপর বহুজাতিক বিমানবাহিনীর বোম্বিংয়ের ক্ষয়ক্ষতি সরাসরি টিভি স্ক্রীনে দেখান হয়। সি এন, এন একবার এ দৃশ্য প্রচার করে যার ফলে আরব বিশ্বে মারাত্মক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফেব্রুয়ারী মার্কিন বোমারু বিমানের বোম্বিংয়ের কারণে ট্রেন্সে আশ্রয়গ্রহণকারী ইরাকের কয়েক ডজন নিরাপরাধ নারী-পুরুষ মৃত্যুবরণ করে। এই দৃশ্য দেখার পর আরবরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তবে তাদের এই প্রতিক্রিয়া ছিল সাময়িক। ওদিকে সি,এন,এন পুরো দস্তুরমত মিত্রজোটের সফলতার দৃশ্য দেখিয়ে চলেছে। এসব দৃশ্য দেখে সাধারণ মানুষের মাঝে এমন বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা ইরাকের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এসময় সি, এন, এন ইরাকের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ও বড় বড় ব্রিজ ধ্বংসের দৃশ্য দেখায়। যেগুলো সাধারণ অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে ধ্বংস করা মোটেই সম্ভব নয়। মিত্রজোটের বিমান হামলার পর স্থলপথে হামলার কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত মিত্রজোটে অন্তর্ভুক্ত জেনারেলরা নিশ্চিতভাবে জানতেন না এই হামলায় ইরাকের সমরশক্তির কি পরিমাণ ধ্বংস সাধন হয়েছে।

ইরাকি জনগণ ও ইরাকি ইনফ্রাসট্রাকচারের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে মোটামুটি সবাই ছিল ওয়াকিফহাল। তবে কুয়েতে মওজুদ পাঁচলাখ ইরাকি সৈন্যের

সমরশক্তি কি পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কোন কিছু মন্তব্য করা ছিল সকলের জন্য মুশকিল। যারা মিত্রবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয় তাদের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, প্রতিদিন তাদেরকে খাওয়ার জন্য। একমুঠো ভাত আর এক টুকরা রুটি দেওয়া হতো। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ইরাকি সেনাদের অবস্থা বর্ণনাতীত করুণ হয়ে পড়েছিল; কিন্তু এর পরও তাদের সম্পকে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান তখনও সম্ভব ছিল না। এয়ার ভাইস মার্শাল মেসান-এর মতে স্থল হামলা শুরু হওয়ার সময় জেনারেল শোরাজকোভের পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল মিত্রজোটের বিমান হামলার কারণে ইরাকের সমরশক্তি ২৫ ভাগ থেকে ৭৫ ভাগ ধ্বংস হয়েছে, তবে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ পাকিস্তানী ও ভারতীয় কূটনীতিকদের ধারণা ছিল, বিমান হামলার কারণ হলো ইরাকের ২০ থেকে ২৫ ভাগ সমরশক্ত ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধের পর একথা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে উঠে যে, বহুজাতিক বিমান হামলার কারণে ইরাকি রিপানলিকান গার্ডের তেমন একটা ক্ষতি হয়নি।

বিমান হামলারকারণে ইরাকেযদিও খুববেশি লোক মরেনি। কিন্তু এই হামলার কারণে ইরাকেরযোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায়। ফলে, বাগদাদ ও রণক্ষেত্রের মাঝে যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইরাকের কাছে ছিল যোগাযোগের তিনটি মাধ্যম, যার দু'টি জার্মানে তৈরী যা উপসাগরীয় যুদ্ধের শুরুতে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আর তৃতীয় যে মাধ্যমটি ছিল তার নাম টেলিফোন ব্যবস্থা। স্থল হামলা শুরুর আগ পর্যন্ত এই সিষ্টেম ছিল কার্যকর। কিন্তু তার পর এই সিষ্টেমও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এসময় ইরাকি সমর বিশারদরাহতাশ হয়ে পড়েন। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, এ যুদ্ধের শেষ পরিণতি নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং কুয়েতে অবস্থিত ইরাকি সৈন্যের কাছে পয়গাম পাঠানো হয়, তারা যেন কুয়েত থেকে ইরাকে প্রত্যাবর্তন করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যাওয়ার কারণে বার্তাবাহকদের সাহায্যে পুরো কুয়েত জুড়েছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা থাকা ইরাকি সৈন্যের মাঝে ইরাক প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ পৌঁছানোর পূর্বেই মিত্রশক্তি তাদের উপর হামলা করে বসে। ফলে, ইরাকি সৈন্যদের মাঝে দারুণ বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।

২৫ শে ফেব্রয়ারী রোববার সকালে ইরাকের অরক্ষিত মরুপথ ধরে মিত্রবাহিনী খুব এত দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হয়। তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইরাকের রিফিউলিং কেন্দ্রের কাছাকাছি পৌছে যায়। মিত্রবাহিনী প্রথমে বিমান হামলার

সাহায্যে ঐ কেন্দ্রটি বধংস করে দেয়। তারপর স্থলবাহিনী ঐ কেন্দ্রেটি দখল করে নেয়। ইত্যবসরে পুরো এলাকাটিকে মিত্রজোটের ট্যাংক বহর ঘিরে ফেলে, অতঃপর বিমান ও তোপ হামলার ধোপে টিকতে না পেরে পলায়নরত ইরাকি বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জনৈক আমেরিকান সেনা কমান্ডার রেডিও কলের মাধ্যমে জেনারেল শোরাজকোভকে জানান যে, তিনি ৩ হাজার ২০০ ইরাকি ফী আটক করেছেন এই ৩ হাজার ২০০ ইরাকি সেনা আটক করার সময়গোলাগুলিতে

কাল্পনিক বিজয়

মাত্র ১জন মিত্রবাহিনী সদস্য আহত হয়। আগামী দুইদিন পর্যন্ত ইরাকের। মরু অঞ্চলে মিত্রবাহিনীর হাতে আটক হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী দেখা যায় । এদেরকে মিত্র বাহিনীর সামান্যসংখ্যক জোয়ানরা সৌদি সীমান্তরে দিকে আশ্চর্যজনক অবস্থায় হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। এই সহজ বিজয় ও দ্রুত অগ্রসরতার কারণ হিসাবে মিত্রবাহিনী মনে করে তাদের অপ্রতিরোধ্য বিমান হামলার কারণে হয়ত ইরাকি বাহিনী নিরাশ হয়ে ময়দান থেকে পিছুটান দিয়েছে। তবে আরব বিশ্বের অধিকাংশ পর্যবেক্ষক ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের ধারণা ইরাকি সেনারা পূর্বেই সিদ্ধান্তগ্রহণ করে- এটা এমন একটা যুদ্ধ যে, এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করার শতকরা ১ ভাগও সম্ভাবনা নেই। অতএব অকালে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কোন অর্থ নেই। কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে কুয়েড়তে অবস্থানরত ইরাকি বাহিনীর একটি বিরাট দল বাগদাদের দিকে প্রত্যাবর্তন শুরু করে; কিন্তু মিত্রবাহিনীর বিমান হামলার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তা ব্রীজ দিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েড়ছে যে, যাতায়াত ব্যবস্থা স্বাভাবিক না থাকার কারণে অনেক ইউনিট প্রত্যাবর্তনের নির্দেশই পায়নি। অনেকের কাছে এই সংবাদ দেরীতে পৌঁছেছে। এদের অধিকাংশ অপারেশন মেরীহীলের শিকার হয়। ফলে, অনেকে মাঝ পথে প্রত্যাবর্তনের সময় অকাল মৃত্যুতে পতিত হয়। অনেকে মিত্রবাহিনীর হাতে বন্দী হয়। ইরাক প্রত্যাবর্তনের সময় ইরাকি ট্যাংক বহরের বিরাট অংশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ট্যাংক বহরের সাহায্যে ছিল ওদের ট্যাংক বিধ্বংসী হেলিকপ্টার। ফলে, ইরাকি ট্যাংক বহরের বিরুদ্ধে মিত্রজোটের ট্যাংক হামলা ছিল খুবই কার্যকর। যুদ্ধ শেষে মরুভূমির চতুর্দিকে সোভিয়েড়ত রাশিয়ার তৈরী ধ্বংসপ্রাপ্ত ইরাকি ট্যাংকগুলি যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এ যুদ্ধে অসংখ্য ইরাকি সৈন্য প্রাণ হারায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয়মাস পর জানা যায় যে, মার্কিন সেনারা হাজার হাজার। ইরাকি সৈন্যকে মাটির নীচে জীবন্ত দাফন করে দেয়। রাস্তা ঘাটের দুরবস্থা ও পরিবহন সংকটের কারণে যুদ্ধবন্দী এই হাজার হাজার সৈন্যকে অন্যত্র সরিয়েড় নেওয়া ওদের পক্ষে ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। ইরাকি তোপগুলিই ছিল ইরাক বাহিনীর সব থেকে কার্যকর হাতিয়ার।

আমেরিকার তুলনায় ইরাকের দূরপাল্লার তোপগুলি ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। ইরাকি তোপ ছিল রাসায়নিক বারুদ ভর্তি। গোলা নিক্ষেপে সমর্থ ইরাক তার তোপের বহর কুয়েত ও সৌদি আরব সীমান্তের অনেক অভ্যন্তরে এক বিরাট রংধনুর আকৃতিতে মোতায়েন করে রেখেছিল। ফলে, মিত্রজোটের তোপগুলি ছিল তাদের আয়ত্তের ভিতর। তাই যখন-তখন ইরাকি তোপগুলি মিত্রজোটের তোপগুলোকে নিজেদের শিকারে পরিণত করতে পারত। অপর দিকে ইরাকি তোপগুলিকে নিজেদের শিকারে পরিণত করা মিত্রবাহিনীর জন্য ছিল অসম্ভব; কিন্তু স্থলপথে হামলা শুরু হওয়ার পর অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করে। কারণ, ইরাকের বিমানবাহিনী আগেই পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। যার ফলে তার জন্য স্থল বাহিনীর কোনরূপ সাহায্য করা ছিল অসম্ভব। অন্যদিকে মিত্রজোটের শক্তিশালী বিমানবাহিনী তাদের স্থলবাহিনীকে নিষ্কন্টক পথে এগিয়ে নিয়ে চলছিল। সেই সাথে ইরাকি লক্ষ্যবস্তুর উপর নির্বিঘ্নেবোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ ছাড়া ইরাকি তোপ বহরের অবস্থানের দিকে মিত্রবাহিনীর বিমানগুলি সঠিক দিকনির্দেশনা দান করছিল। ফলে, অতিদ্রুত ইরাকি তোপগুলি মিত্রশক্তির তোপের শিকারে পরিণত হয়। ইরাকি তোপগুলির সাথে তাদের রাডার সিস্টেমও কাজ করছিল; কিন্তু ওদের রাডারের সকল সংকেত আমেরিকান মেশিনে ধরা পড়ছিল। তাই ইরাকি অবস্থানের সঠিক ও নির্ভুল সংবাদ মিত্রবাহিনী ঘরে বসে বসেই পাচ্ছিল। যার কারণে ইরাকি লক্ষ্যবস্তুর উপর রকেট ও তোপ হামলার জন্য মিত্রবাহিনীকে তেমন একটা বেগ পেতে হয়নি। এসব কাজ অত্যন্তদ্রুততার সাথে আঞ্জাম দেওয়া হয়। যখনই কোন ইরাকি ব্যাটারীর সাহায্যে কোন রাডার চালু করার চেষ্টা করা হয় তখনই কোন রকেট বা তোপের সাহায্যে তাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়। তোপ চালনায় পারদর্শী এমন অনেক ইরাকি যুদ্ধের পর জানিয়েছেন, আমরা রাডার সিস্টেম চালু করার পর একটি ফায়ার করারও সুযোগ পেতাম না ওমনি কোন রকেট, কোন তোপ এসে আমাদের পুরো কেন্দ্রটাই ধ্বংস করে দিত।

একথা ঠিক যে, ইরাকি তোপগুলি ছিল দূরপাল্লার; কিন্তু মিত্রজোটের তোপগুলি সঠিক লক্ষ্যে হামলায় যে দক্ষতার পরিচয় দেয় তার কোন বিকল্প ইরাকের কাছে ছিল না। যার ফলে দূরপাল্লার হওয়া সত্বেও ইরাকি তোপগুলি সম্পূর্ণ অকেজো হয়েড় পড়ে। ইরাকি তোপগুলি অকেজো হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল তাহলো ইরাকি তোপগুলির স্থানান্তরের গতি ছিল খুবই মন্থর। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ওগুলি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা ছিল অসম্ভব। অন্য দিকে মিত্রজোটের কাছে যে সব তোপছিল সেগুলি খুব সহজেই এক স্থান থেকে

অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া যেত। ফায়ার করার পর পরই স্থান পরিবর্তন করা ওদের জন্য ছিল খুবই সহজ। প্রতিপক্ষের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই টেকনিক ছিল খুবই কার্যকর। এ কারণে ২৬ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ইরাকি তোপের তিন ব্যাটেলিয়ান ধ্বংস করে দেওয়া মিত্রজোটের জন্য সম্ভব হয়েছিল।

মিত্রজোটের কাছে এমন অস্ত্র ও ছিল যার সাহায্যে তারা রাতের অন্ধকারেও দেখার সামর্থ্য রাখত। তাদের এই যোগ্যতা অপারেশন মেরিহীলকে সফল করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

অপারেশন ডেজার্টস্টর্মস শুরু হওয়ার তিন দিন পর কুয়েতে অবস্থিত ইরাকি সৈন্যদের বাগদাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। মিত্রজোটের হেলিকপ্টার গানশিপগুলি মরুভূমিতে ইরাকি ট্যাংক বহরের এক একটি ট্যাংককে এভাবে টার্গেটে পরিণত করছিল যেমন নাকি বনে-জঙ্গলে এক একটি হাঁস তাড়িয়ে ধরা হয়। জেনারেল শোরাজকোভের ইচ্ছা ছিল কুয়েত যখন দখলদার সেনামুক্ত করা হবে তখন মিত্রজোটে অন্তর্ভুক্ত আরব রাষ্ট্রগুলির সৈন্যরা থাকবে আগে আগে। কুয়েতকে ইরাকি সৈন্যদের থেকে স্বাধীন করার সময় আরব সৈন্যদেরকে আর আগে আগে রাখার প্রয়োজন হয়নি। কারণ, কুয়েত ইরাকি সৈন্য মুক্ত হওয়ার পূর্বে অন্তত দেড় লাখ ইরাকি সৈন্য কুয়েত ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মিত্রবাহিনী যখন কুয়েতে প্রবেশ করে তখন কুয়েত সিটি ছিল সম্পূর্ণ খালি। সেখানে কোন ইরাকি সৈন্য ছিল না। তবে শহরের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য তেলের কূপে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। কুয়েত ত্যাগের সময় ইরাকি সৈন্যরা এসব তেলকূপে আগুন ধরিয়ে দেয়। কুয়েত থেকে যে রাস্তাটি ইরাকের বছরা শহরের দিকে গেছে ইরাকি সৈন্যদের পলায়নের এটাই ছিল একমাত্র রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে তারা স্বদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু মিত্রজোটের বিমান হামলার কারণে সমস্ত ব্রীজগুলি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। রাস্তায় চলাচলের সুযোগ না থাকার কারণে অসংখ্য সাজোয়া গাড়ী এবং ট্যাংক এক জায়গায় এসে জমা হয়। মিত্রজোটের জন্য এই ট্রাফিক জ্যামকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা ছিল। খুব সহজ ব্যাপার। হাজার হাজার ইরাকি সৈন্যকে এখানে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয় এবং তাদের সাঁজোয়া বহর ও ট্যাংকগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটা ছিল মিত্রজোটের একটি গণহত্যা। যুদ্ধ শেষে কিছুসংখ্যক ব্রিটিশ কর্মকর্তা জানান, মিত্রজোটের যে সকল পাইলটরা ইরাকের দিকে পলায়নরত

হাজার হাজার মানুষের উপর হামলা চালায় তাদের সাথে ব্রিটিশ পাইলটরাও শরীক ছিল।

২৮ শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট বুশ স্থলপথে হামলা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ জারি করলেন। অপারেশন মেরীহীল ও কুয়েতকে ইরাকি দখল মুক্ত করার কাজ ১০০ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন হল। জেনারেল শোরাজকোভ মনে করেছিলেন, একাজের জন্য সময় লাগবে চার সপ্তাহ। পরে অবশ্য অনেক পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে, সাদ্দাম হোসেন তার সামরিক শক্তির বিরাট অংশ সম্পূর্ণ অক্ষত রাখতে সক্ষম হন। জেনারেল শোরাজকোভও ছিলেন এই ধারণার সাথে একমত। তাঁর বক্তব্য ছিল, আরও একদিন যুদ্ধ বলবৎ রাখা হোক। বলা হয় প্রেসিডেন্ট বুশ অনর্থক মানুষের জীবন ধ্বংস না করার জন্যই এই বীরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন; কিন্তু এখানে স্মরণ যোগ্য যে, উপসাগরীয় যুদ্ধে মিত্রজোট যে বিরাট শক্তির প্রদর্শনী করে তা দেখে বাস্তবিক কারণেই আরব জনগণ হতভম্ব না হয়ে পারেনি।

আশঙ্কা করা হয় যদি আরো কিছু দিন এই যুদ্ধ চলতে থাকত তা হলে মিত্রজোটে অন্তর্ভুক্ত আরব বাহিনী আমেরিকার বিরোধী হয়ে যেত। এই কারণেই প্রেসিডেন্ট বুশ তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলি এ বিজয়কে একটি গৌরবজনক বিজয় হিসাবে আখ্যায়িত করে। ৭ মার্চ ১৯৯১ আমেরিকান কংগ্রেস ও সিনেটের যৌথ সভায় প্রেসিডেন্ট বুশকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান হয় এবং এই বিজয়ে তার অবদানের কারণে তাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। ৯ই মার্চ জেনারেল শোরাজকোভ যখন নিউইয়র্ক এসে উপস্থিত হন তখন তাঁকে ঐতিহাসিক সাদর সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিরাট অবদান রাখার কারণে জেনারেল আইজেন হাওয়ারকে যেভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয় তারপর এই প্রথম কোন মার্কিন জেনারেলকে এভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হলো।

আরব দুনিয়ায় বিজয়ের এই উল্লাস মোটেই পরিলক্ষিত হয়নি। অনেক আরবের মতে এই বিজয়কে অনেক বাড়িয়ে চাড়িয়েপ্রচার করা হচ্ছে। তাদের বক্তব্য ছিল, তৃতীয় বিশ্বের একটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের বিরুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মিত্রজোটের এই বিজয়কে জাপান, জার্মানী বা ইটালির বিরুদ্ধে বিজয়ের সাথে তুলনা করা যায় না। অধিকাংশ আরেবের ধারণা ছিল ইরাক কুয়েতের উপর আক্রমণ করে ভুল করেছে; কিন্তু তাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা তার

অপরাধের তুলনায় ছিল অনেক বেশি। এ যুদ্ধে ইরাকের যে পরিমাণ মানবীয় জীবন ধ্বংস হয়েছে তাকে সামনে রেখে আরবদের উক্ত ধারণাকে মোটেই অত্যুক্তি মনে হয় না। একটি সাধারণ হিসাব অনুযায়ী এ যুদ্ধে ৩০ থেকে ৬০ হাজার ইরাকি সৈন্য মারা গেছে। অপর দিকে বেসামরিক মানুষ মারা গেছে প্রায় ২২ হাজারেরও বেশি। দু' একটি আরব দেশ ব্যতীত যুদ্ধের এই ফলাফলে কেউ সন্তুষ্ট ছিল না।

উপসাগরীয় যুদ্ধ যখন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন পশ্চিমা ও আরব দেশগুলির পুরোপুরি বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইরাকের ক্ষমতাসীন সরকারের গদি উল্টে দেয়া হবে। সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ আমেরিকান সরকারকে আশ্বস্ত করে বলেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইরাকে সামরিক বাহিনীতে বিরাট বিদ্রোহ দেখা দেবে এই বিদ্রোহ দমন করা সাদ্দামের জন্য মোটেই সম্ভব হয়ে উঠবে না। সেই সাথে ক্ষমতাসীন বাথ পার্টিতেও সংঘটিত হবে মারাত্মক বিপ্লব। সিরীয় নেতার আরও বক্তব্য ছিল, অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগে ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলের শিয়ারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। উল্লেখ্য, ২রা ফেব্রুয়ারী থেকেই বছরা শহরের উপকণ্ঠে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ পাওয়া যায়। অথচ ইরাকের বিরুদ্ধে স্থলপথে হামলার তখনও ৩ সপ্তাহ বাকি। উত্তর ইরাকের পরিস্থিতি তখনো ছিল শান্ত, কিন্তু মার্কিন ও বৃটিশ গোয়েন্দারা ঐ এলাকায় কুর্দি। নেতাদের সহায়তায় স্থানীয় জনগণকে সাদ্দামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েতোলে। এই পটভূমিতে প্রেসিডেন্ট বুশ দীর্ঘ দিন যুদ্ধ বলবৎ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তাঁর মতে ইরাকি জনগণের হাতে সাদ্দামের পতনই হবে বেশি আকর্ষণীয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেওয়ার সময় বুশ বলেন, মিত্রবাহিনী তাদের ডিউটি পুরো করছে। এখন ইরাকি জনসাধারণের উচিত স্বৈরশাসক থেকে তাদের পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করা।

আমেরিকা ও সৌদি আরবের যৌথ উদ্যোগে তাদের ইরাকি এজেন্টদের সমন্বয় একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের নীলনকশা তৈরি করা হয়। এই নীলনকশা কেবল তখনই কার্যকর হওয়া সম্ভব যখন সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে নতুন সরকার প্রধান হিসেবে যার নাম প্রস্তাব করা হয় তিনিও সাদ্দামের মত তাকরিতি সুন্নী মুসলমান ছিলেন। তিনি বাথপার্টির প্রাক্তন সদস্য। ঐ নীলনকশা অনুযায়ী নতুন সরকারে সমমনা বাথপার্টির সদস্য ও কিছু সংখ্যক জেনারেলের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মার্চ ১৯৯১-এর শুরুতে ইরাকের অভ্যন্তরে যে ধরনের ঘটনা ঘটে তা ছিল মিত্রজোট সদস্যদের কল্পনারও অতীত। যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই উত্তর ইরাকে কুর্দিবিদ্রোহ দাবাগ্নির মত দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। আর দক্ষিণ ইরাকে শিয়াবিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার রূপ নেয়। শিয়া বিদ্রোহীদের ইরানের উগ্রপন্থীরা মদদ জোগায়। একইসাথে ইরাকি শিয়াদের নিজস্ব পার্টি 'দাওয়াত' ও বিদ্রোহীদেরকে যথেষ্ট মদদ দেয়। কতিপয় সূত্রমতে, এসময় ইরাকি শিয়া বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্য এক থেকে তিন হাজার ইরানি বিপ্লবী গার্ড এগিয়ে আসে এবং বিদ্রোহীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারাও ইরাকের অভ্যন্তরে লুটপাট ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়। এই গৃহযুদ্ধে উভয়পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি হয়। উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহের শুরুর দিনগুলোতে খুব একটা মানুষ মারা যায়নি। কারণ সেখানে তখন কোন ইরাকি সৈন্য মজুদ ছিল না। বিদ্রোহী কুর্দিরা খুব সহজে সরকারি অফিস-আদালত দখল করে নেয়। দেখতে দেখতে এক বিরাট অঞ্চলের উপর তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। বিদ্রোহের আগুন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথেসাথে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয় পড়ল। এমতাবস্থায় ইরাকি শিয়ারা বসরা, কারবালা ও অন্যান্য এলাকার ভার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন সপ্তাহ পর কেবলমাত্র তিনটি অঞ্চল থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। বাগদাদ, মুসেল ও আম্বা- এই তিনটি অঞ্চল ছাড়া বাকিগুলো চলে যায় অন্যদের নিয়ন্ত্রণে। তবে মার্চের শেষ দিকে ধীরেধীরে অবস্থা পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়। এ সময় ইরাকি সৈন্যরা কুর্দি বিদ্রোহীদের পিছু হটতে বাধ্য করে। এ অবস্থা আমেরিকার জন্য ছিল অকল্পনীয়। কুর্দি বিদ্রোহীদের এই পশ্চাদপসারণ প্রমাণ করে, উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকি বাহিনীর ততটা ক্ষতি হয়নি, যতটা জেনারেল শেরাজকোভ মনে করেন। পরিস্থিতি প্রমাণ করে সাদ্দাম ও তাঁর বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল এখনও যথেষ্ট শক্তিধর। ইরাকে কোন বিরাট পরিবর্তন আনাই যদি বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য হতো, তবে তা সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু বিদ্রোহীরা শতধা বিভক্ত থাকায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ইরাক সরকারের কর্তৃত্ব ও বিদ্রোহীদের উপর পুনঃনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করেছে যে, সাদ্দাম ও তার সরকারের ব্যাপারে মিত্রজোটের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। ভবিষ্যৎ প্রয়োজনকে সামনে রেখে রাজধানী বাগদাদে ১৮ থেকে ২৫ ডিভিশন সৈন্য মোতায়ন করা হয়। মিত্রবাহিনী যদি রাজধানীর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই এই আগাম ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ ইরাকের বিরুদ্ধে স্থল হামলা শুরু হওয়ার পূর্বে কুয়েতে মোতায়েন ইরাকি

বাহিনীকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়। খবর পাওয়া মাত্রই তারা কালবিলম্ব না করে ইরাকে ফিরে আসে। ইরাকি বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য শিয়াপন্থী আর তাদের অধিকাংশ অফিসার সুন্নি মুসলমান। মিত্রবাহিনীর ধারণা ছিল, শিয়াবিদ্রোহ শুরু হলে অধিকাংশ শিয়াপন্থী সৈন্যরা স্বজাতী ভাইদের দলে ভিড়বে। মিত্রজোটের এ বাসনা কখনো পূরণ হয়নি। কারণ ইরাকি সৈন্যদের মাঝে সাম্প্রদায়িক প্রীতির চেয়ে দেশপ্রেম ছিল প্রবল। এজন্য তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজন থেকে রক্ষা পায়। একথা সত্য যে, দখলদার বাহিনীর যে ইউনিটগুলি সময়মত স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পায়নি তারা এই সংবাদ জানার পর চটজলদি ইরাকে ফেরার চেষ্টা করে। তাদের উদ্দেশ্যে সফল হয়; কিন্তু যারা পুরোপুরি ডিসিপ্লিনের সাথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করে তারা অধিকাংশই ইরাকে পৌঁছার পূর্বে মারা পড়ে।

কোটি কোটি ডলারের ইরাকি অস্ত্র ধ্বংস

কুয়েত থেকে প্রত্যাগমনকারী অধিকাংশ ইরাকি সেনা ছিল সাদ্দামের অনুগত। প্রেসিডেন্ট বুশ যুদ্ধবন্ধ ঘোষণা করার সময় ইরাকি জনগণকে সাদ্দামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি ইরাকি জনগণকে সাদ্দামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট বুশের ঐ আহ্বানের ব্যাখ্যায় সকলে ধরে নেয় যে, মার্কিন সরকার বিদ্রোহীদের অবশ্যই সাহায্য করবে। দক্ষিণাঞ্চলে কুর্দি বিদ্রোহীদের জন্য বুশ সরকার সাহায্যের হাত প্রশস্ত করে। অপরদিকে শিয়া বিদ্রোহীদের ইরাকি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়া হয়। তবে সরকারের বিদ্রোহ দমন পরিকল্পনা এতটা শক্তিশালি ছিল যে বিদ্রোহী দলগুলো তা প্রতিহত করতে পারেনি। এজন্য সাদ্দাম সরকার বিদ্রোহ দমনে সিদ্ধহস্ত প্রমাণিত হয়।

একথা ঠিক যে, মার্কিন কর্মকর্তারা ইরাকি বিমান বাহিনীর বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল; কিন্তু বিদ্রোহ দমনে ইরাকি হেলিকপ্টারগুলি বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেয়। হেলিকপ্টার উড্ডয়নের ব্যাপারে ইরাকি সেনা অফিসারদের একটি দল জেনারেল শোরাজকোভের সাথে সাক্ষাৎ করে আগাম অনুমতি নিয়েছিল। ইরাকি প্রতিনিধি দলের বক্তব্য ছিল, জনগণকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে হেলিকপ্টার ব্যবহার খুবই জরুরি। কারণ বোমা বর্ষণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকেজো হয় পড়েছে। আসল ঘটনা ছিল, বিদ্রোহ দমনের সহায়ত হিসেবে ইরাক সরকার হেলিকপ্টার ব্যবহার নিশ্চিত করতে চেয়েছিল, তাই এই আগাম অনুমতি নিয়ে রাখা।

সৌদি নেতাদের চাপের মুখে জেনারেল শোরাজকোভ ইরাক সরকারকে হেলিকপ্টার ব্যবহারের অনুমতি দেন। সৌদি নেতাদের শোরাজকোভকে দেয়া চাপের আসল কারণ ছিল, ইরান সরকার এ সময় সুযোগ বুঝে শিয়া বিদ্রোহীদের মাঝে বিরাট আকারে যুদ্ধের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করে। সৌদিদের ধারণায় ইরাক সরকার যদি খুব বেশি দুর্বল হয় পড়ে তাহলে এ অঞ্চলে ক্ষমতায় ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে; যা সৌদি সরকারের জন্য মোটেই অনুকূলে ছিল না। সৌদিদের আরও ধারণা ছিল ধর্ম, গোত্র অথবা বংশের ভিত্তিতে যদি ইরাকে কোন পরিবর্তন আসে তাহলে এর প্রভাব সকল উপসাগরীয় দেশের উপর পড়তে বাধ্য। এই সুবাদে উপসাগরীয় অন্যান্য দেশে শিয়াদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমান্বয়ই বেড়ে

চলবে এবং নিজ নিজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসবে। উল্লেখ্য, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলে এক বিরাট জনগোষ্ঠী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। আগস্ট ১৯৯০ পর্যন্ত ইরাকের বিপ্লবী কমান্ড কাউন্সিল ছিল ৮ জন সুন্নি, ২ জন শিয়া, ৩২ জন কুর্দি সদস্যের সমন্বয় গঠিত। গৃহযুদ্ধ বাঁধার পর মন্ত্রিপরিষদে কয়েকটি পরিবর্তন আনা হয়; কিন্তু বিপ্লবী কমান্ডে অবাক করে দেয়া পরিবর্তনটি ছিল সায়দুন হাম্মাদীর অপসারণ। সায়দুন হাম্মাদী ছিলেন তখন উপ-প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে অপসারণের পক্ষে যুক্তি পেশ করা হয় যে, তিনি কাউন্সিল নির্বাচনের সময় কোন ভোট পাননি। যদিও তিনি একটি বড় পদ আগলে রেখেছিলেন; কিন্তু আসলে একজন শিয়া। তবে তাঁর অপসারণের নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক বৈরিতা মোটেও কাজ করেনি। কারণ, তাঁর স্থলে এই পদ দেয়া হয় মুহাম্মাদ হামযাহ আল জুবাইদিকে, তিনিও একজন শিয়াপন্থী মানুষ।

মার্চের শেষদিকে বেশকিছু খুন-খারাবির পর কেন্দ্রীয় সরকার শিয়া বিদ্রোহীদের বাগে আনে। শিয়া বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া এলাকাগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিতীয়বার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। তবে কতিপয় শিয়াবিদ্রোহী বসরা অঞ্চলে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যায় এবং দক্ষিণ ইরাকের দিকে পালিয় যায় অনেকে। ইরাকের দক্ষিনাঞ্চল উপসাগরীয় যুদ্ধের পর কিছুদিন পর্যন্ত মিত্র জোটের নিয়ন্ত্রণে থাকে। পরে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। এর ফলে সরকারের জন্য সেখানকার বিদ্রোহ দমন করা সহজ হয়।

উত্তরাঞ্চলে কুর্দি আর দক্ষিণাঞ্চলের শিয়া বিদ্রোহীদের মধ্যে তেমন কোন সামঞ্জস্য ছিল না। কুর্দিদের দুইজন প্রধান নেতার একজন গিলাম তিলবানী যার সম্পর্ক ন্যাশনাল ফ্রন্ট অব ইরাকি কুর্দিস্তানের সাথে এবং দ্বিতীয়জন মাসউদ আল বারজানী, তাঁর সম্পর্ক ডেমোক্রেটিক কুর্দিশ পার্টির সঙ্গে। এই দুইজন নেতা ১৭ই জানুয়ারির পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, কুয়েত সংকট থেকে তারা কোন ফায়দা লুটার চেষ্টা করবে না। এই কারণে ইরাকি বাহিনীকে কুর্দিঅঞ্চল থেকে সরিয় আনা হয়। উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হবার পর অধিকাংশ কুর্দিদের ধারণা ছিল, খুব দ্রুত ইরাক সরকারের পতন ঘটবে। একারণে তারা তাদের অঙ্গীকার ভুলে যায়। এসময় যে সকল কুর্দি গেরিলারা দীর্ঘদিন ধরে ইরাকি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে পাহাড়ে পালিয় যায় তারাও পাহাড় থেকে নেমে আসে। আর যারা ইরান ও তুরস্কে পালিয়ে গিয়েছিল তারাও এ সময়টাকে তাদের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে আসে। সরকারি বাহিনীর অনুপস্থিতিতে

ফাঁকা ময়দানে গোল দেয়া বিদ্রোহীদের জন্য তখন কোন ব্যাপারই ছিল না। বিদ্রোহীরা তখন উত্তর ইরাকের বিরাট অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয়। মনে করা হয়, উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহীরা তাদের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হবে, কিন্তু সরকারি বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পর বিদ্রোহীদের সকল স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সে সময় এ গুজব রটে যে, সরকারি বাহিনী উত্তরাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করবে। এই গুজবের বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পুনরায় শহর ছেড়ে পাহাড়ের দিকে পালাতে শুরু করে। কুর্দি গেরিলারা অবশ্য ইরাকি বাহিনীর পথ রোধ করতে চেষ্টার কমতি করেনি; কিন্তু সরকারি বাহিনীর অস্ত্রের মোকাবেলা করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। কুর্দি নেতারা যখন দেখেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী তখন তারা ছিলেন বিদ্রোহীদের পক্ষে। যখন দেখেছেন অবস্থা বেগতিক তখন তাঁরা বিদ্রোহীদের পক্ষ ত্যাগ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগত হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়েছেন। কুদির্ রাজনৈতিক নেতাদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের আলোচনা শুরু হয় ২০শে এপ্রিল ১৯৯১। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই আলোচনা দীর্ঘায়িত হয়। ইত্যবসরে সরকারি বাহিনী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া অধিকাংশ এলাকা পুনরায় দখল করে নেয়, এদিকে দুই তিন মাসের ভিতর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। মজার ব্যাপার, মার্গারেট থ্যাচারের স্থলাভিষিক্ত বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ উভয়ই কুর্দিবিদ্রোহীদের ব্যাপক হারে শহর ছেড়ে পালানোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি। কারণ তাদের আত্মবিশ্বাস ছিল, অচিরেই সাদ্দাম সরকারের পতন ঘটবে। ওদিকে বিদ্রোহীরা বুশ-মেজরের এই নির্লিপ্ততার কারণে খুবই নিরাশ হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তারা মিছিল-মিটিংয়র পথ ধরে রাজপথে নেমে আসে। বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কুর্দিরা (৫ই এপ্রিল ১৯৯১) লন্ডনে অবস্থিত ইরাকি দূতাবাস দখল করে নেয়।

মে মাসের শুরুতে বিশ্ববাসীর নিকট এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যায়, কোন পরাশক্তির আক্রমণ ছাড়া ইরাকের ক্ষমতাসীন সরকারের পতন সম্ভব নয়। এ সময় বুশ ও মেজর কুর্দি সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। সুতরাং তখন থেকেই বৃটিশ ও মার্কিন সংবাদ মাধ্যমগুলি ইরাকের উত্তরাঞ্চলে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে একটি নোফ্লাইজোন প্রতিষ্ঠার জন্য জোর প্রোপাগান্ডা শুরু করে। বাহ্যত তখন এমন ধারণা দেয়া হয় যে, কুর্দিদের হেফাজতের জন্য এমন একটি নোফ্লাইজোন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। তবে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইরাকি

বাহিনীকে একথা বোঝানো যে, সাদ্দাম যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ইরাকের উপর ততদিন মার্কিন চাপ বলবৎ রাখা হবে।

ইরাকি সৈন্যদের ভয়ে ছয় লাখ কুর্দি জনসাধারণ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এসব কুর্দিদের অবর্ণনীয় দুর্দশার সচিত্র প্রতিবেদন পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এ ঘটনায় ইংল্যান্ড-আমেরিকা বিভিন্ন সময় ইরাকের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তবে একথা ঠিক, খুব দ্রুত পশ্চিমারা তাদের মহানুভব দৃষ্টি কুর্দিদের থেকে সরিয়ে নেয়। এই কারণে প্রেসিডেন্ট বুশ যখন (১৬ই মে) কুর্দীদেরকে সাদ্দামের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর ছাড়বে না বলে ঘোষণা করেন, তখন তিনি উত্তর ইরাকে মার্কিন সৈন্য পাঠাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, প্রত্যেকেই তাঁর এ বক্তব্যকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছে। মোটকথা, বুশ তার বক্তব্যের সম্মান রাখতে উত্তরাঞ্চলের জন্য চার হাজার মার্কিন ও এক হাজার বৃটিশ সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হন। ইরাক ও তুর্কি সীমান্তে এসব সৈন্য মোতায়ন রাখা হয়। উদ্দেশ্য ছিল কুর্দি শরণার্থীদের দুঃখ দুর্দশা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা। পরে এসব সৈন্য কুর্দিঅঞ্চলে প্রবেশ করে। এদের ছত্রছায়ায় স্থানীয় কুর্দিরা দ্বিতীয়বার সরকারি ভবনগুলি দখল নেয়। এবার কিন্তু ইরাকি সেনারা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকে। আগস্ট ১৯৯১ পর্যন্ত মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যরা উত্তরাঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। কুর্দিঅঞ্চলে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্য প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য ছিল, ইরাকের উপর ব্যাপক চাপ তৈরি করা। মিত্রজোটে অন্তর্ভুক্ত আরব মিত্রদের অধিকাংশ আমেরিকার উপর চাপ দেয় যে, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাদ্দাম সরকারের পতন ঘটানো হোক; কিন্তু মার্কিন সরকারের তখনও ধারণা ছিল, ইরাকি জনগণ খুব শীঘ্রই সাদ্দামের বিরুদ্ধে মারমুখী হয় উঠবে এবং তারাই আন্দোলন করে সাদ্দামের পতন ঘটাবে।

ইরাকের পরমাণু ও রাসায়নিক অস্ত্রের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনের অনুমতির জন্য নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব মঞ্জুর করার পিছনে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল, ইরাকের উপর চাপ সৃষ্টি করা। ইরাকের উপর উপর্যুপরি চাপ সৃষ্টি ছাড়াও এ বিষয়টির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয় যে, ইরাকের বিরুদ্ধে তেল বিক্রি নিষেধাজ্ঞা যেন সবসময় বলবৎ থাকে। ১৮ই এপ্রিল নিরাপত্তা পরিষদের দাবির প্রেক্ষিতে ইরাক তার রাসায়নিক অস্ত্রের একটি তালিকা নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রেরণ করে। এই তালিকায়

পাঁচটি স্নায়ুবিক গ্যাস তৈরির ফ্যাক্টরি ও পাঁচটি রাসায়নিক অস্ত্রের ডিপোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়। উল্লেখ্য, এসব অস্ত্রাগার মিত্র জোটের বিমান হামলার সময় ধ্বংস হয়। এই তালিকায় ১২২ মিলিমিটার ব্যাসের তোপের ৬৬২০ টি রাসায়নিক গোলা, হাজার হাজার টন স্নায়ুবিক গ্যাস আর রাসায়নিক অস্ত্রে সমৃদ্ধ ১৩৪ টি ক্ষেপণাস্ত্রের তালিকা পাঠায়; কিন্তু তারপরও ধারণা করা হয়, ইরাক নিরাপত্তা পরিষদের কাছে অনেক কিছুই গোপন করেছে। আগামী কয়েকমাস ধরে ইরাককে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের কড়া তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। ইতিহাসে এই প্রথম জাতিপুঞ্জ তার কোন সদস্য দেশের উপর এমন কড়া দৃষ্টি রাখল। এ সময় জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের ইরাকের যে কোন স্থানে অবাধ বিচরণের অনুমতি ছিল। তারা যখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পারত এবং যে কোন জিনিস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার পূর্ণ ক্ষমতা রাখত।

জাতিসংঘের প্রথম বিশেষজ্ঞ দলটি ১৪ই মে ১৯৯১ ইরাক পৌঁছে। জাতিসংঘে মঞ্জুরীকৃত প্রস্তাব নং ৬৮৭-এর অধিকার বলে এই দলটি ইরাকে পাঠানো হয়। ইরাককে মাত্র ৪৫ দিন সময় দিয়ে বলা হয়, এরমধ্যে যেন তারা বিশেষজ্ঞ দলটির তত্ত্বাবধানে সমস্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করে। একাজ পরিপূর্ণভাবে করার জন্য ইরাক সরকারকে আরও ৪৫ দিন সময় দেয়া হয়। বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, নির্ধারিত এ সময়সীমা ছিল সম্পূর্ণ ইনসাফ বিবর্জিত। ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘের রিপোর্টে বলা হয়, ইরাকের কাছে এখনও হাজার হাজার রাসায়নিক অস্ত্র মজুদ আছে। এসব অস্ত্র ধ্বংস করতে কমপক্ষে দুইবছর সময় লাগবে। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়, বিশেষজ্ঞরা অনুসন্ধান চালিয় ইরাকে কোন আনুবিক অস্ত্রের সন্ধান পাননি। ২২শে জুন জাতিসংঘের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট দ্বিতীয় দলটি ইরাকের পরমাণু প্রোগ্রাম পর্যবেক্ষণের জন্য বাগদাদ আসে। জুলাই মাসের তিন তারিখে জাতিসংঘের ২১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ আরেকটি দল ইরাকে পাঠানো হয়। তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়, তারা যেন নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ইরাকের মধ্যমপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ধবংস করে দেয়। এছাড়া ইরাকের এস্কাড মিসাইলগুলি ধ্বংস করার জন্য জাতিসংঘের অন্য একটি বিশেষ দূত দল ইরাকে প্রেরণ করা হয়। ইরাক পরমাণু পরিকল্পনা সম্পর্কে জাতিসংঘকে যে বিবরণ প্রদান করে তা ছিল অসম্পূর্ণ। ওই বিবরণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা হয়। এমনকি ইরাকি বিজ্ঞানীদের নাম পর্যন্ত গোপন রাখা হয়।

২১শে জুলাই প্রেসিডেন্ট বুশ এই রিপোর্ট অসম্পূর্ণ বলে রায় দেন এবং বলেন এই রিপোর্টের উপর তার কোন আস্থা নেই। ইরাকের উপর আবার বিমান হামলা চালানো হবে বলে তিনি সাদ্দামকে হুঁশিয়ার করে দেন। প্রেসিডেন্ট বুশ আরো বলেন, জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ দলের পূর্ণ সহযোগিতার অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত ইরাকের উপর বোমা বর্ষণ অব্যাহত থাকবে। ২৭শে জুলাই ১৫ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের আর একটি বিশেষজ্ঞদল ইরাকের পরমাণু পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য অনুসন্ধান কাজ শুরু করে।

মরার উপর খাঁড়ার ঘা

জাতিসংঘের বারবার দাদাগিরিকে ইরাক তার সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী মনে করে। সুতরাং ইরাক সরকার আক্ষেপের সুরে জানায়, জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞরা তার দেশে যথেচ্ছাচারের আশ্রয় নিয়েছে। ইরাক সরকার দাবি জানায়, দেশের সার্বভৌমত্বের খেলাফ যে কোন কার্যকলাপ থেকে জাতিসংঘ কর্মীদের অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। ইরাক সরকারের আরো দাবি ছিল যে, বিশেষজ্ঞরা নিজস্ব কোন হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারবেনা, ইরাক সরকারের সর্বরাহকৃত হেলিকপ্টারই তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকের এসব দাবিতে অগ্নিশর্মা হয় ওঠেন। তিনি বলেন, ইরাক সরকার যদি এসব দাবি রাখে তার উপর পুনরায় বি-৫২ বিমানের সাহায্যে মারাত্মক ধরণের আক্রমন শুরু করা হবে। মিঃ বুশের এমন আচরণে ইরাক নতুন করে দাবির ব্যাপারে জোর দেয়নি।

সেপ্টেম্বর মাসে ইরাক থেকে পালিয় যাওয়া জনৈক সরকারি কর্মকর্তার সাহায্যে সিআইএ (বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থা) ইরাকের পরমানু পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইরাকি বিজ্ঞানীদের নামের তালিকা সংগ্রহ করে। সিআইএ কর্তৃক দেশটির পরমাণু বিজ্ঞানীদের নামের তালিকা সংগ্রহের পর জাতিসংঘ ইরাকে তাদের আরেকটি বিশেষজ্ঞদল প্রেরণ করে। এই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪২ জন। 'ডিউডকে' নামক একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ ছিলেন দলের প্রধান। ২২শে সেপ্টেম্বর ইরাকের শ্রম মন্ত্রণালয়ের বিল্ডিং থেকে এই দলটি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র উদ্ধার শেষে বের হওয়ার সময় ইরাকি কর্মকর্তারা তাদের পথ অবরোধ করে দাড়ায়।

তাদের গাড়িগুলি দীর্ঘক্ষণ মন্ত্রণালয়ের সামনে দাঁড়িয় থাকে। পাঁচদিন পর্যন্ত এই সংকট চলতে থাকে। এ সময় মিঃ বুশ কয়কবার ইরাককে সাবধান করে দিয় বলেন, ইরাক যে কাজ করছে তা মোটেই ভাল হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত মীমাংসার পথ বের করা হয় এভাবে যে, সকল নথিপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুতের পর জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ দলকে ঐসব নথিপত্র সঙ্গে নিয় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। এসব পত্রে ইরাকি বিজ্ঞানীদের নাম-ঠিকানা যোগ্যতাসহ বিস্তারিত বিবরণ দেয়া ছিল। এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিশেষজ্ঞ দলটি এ সব নথিপত্র জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের হাতে না দিয়ে মার্কিন কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয়। ফলে, জাতিসংঘকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ইরাক অভিযোগ

করে বলে, জাতিসংঘ আমেরিকার জন্য কাজ করছে। প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানসহ জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের আরেকটি দল ২৯ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত ইরাক সফর করে। এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় বোম্বিংয়ের কারণে এবং যুদ্ধ পরবর্তী শিয়া-কুর্দী বিদ্রোহের ফলে ইরাকের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা সামনে রেখে বর্তমান পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া। মানবিক মমত্ববোধকে কেন্দ্র করে ইরাকে এই সফর করা হয়। জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল প্রিন্স সদরুদ্দিনের রিপোর্ট ১৭ই জুলাই জারি করেন। উক্ত রিপোর্ট মোতাবেক ইরাকবাসী এই যুদ্ধে যে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা ছিল বিশ্ববাসীর কল্পনারও অতীত। ইরাকি জনসাধারণ তাদের কষ্ট থেকে কীভাবে মুক্তি পেতে পারে সে ব্যাপারে নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুকে যথেষ্ট চিন্তায় ফেলে দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৫ ই আগষ্ট নিরাপত্তা পরিষদে ৭০৬ নং প্রস্তাবটি মঞ্জুর করা হয়। এই প্রস্তাবের অধীনেও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ইরাককে ১.৬ বিলিয়ন ডলারের তেল বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়। এই অনুমতির সাথে এ শর্তও জুড়ে দেয়া হয় যে, তেল বিক্রয়লব্ধ অর্থ কেবলমাত্র খোরাক ও পুনর্বাসন কাজে ব্যবহার করতে হবে। ইরাক সরকার জাতিসংঘের এই প্রস্তাবকে তার দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর শামিল আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে দেয়; যার ফলে ইরাক সরকার তেল রফতানীতে ব্যর্থ হয়। এদিকে ইরাকি জনগণের দুর্দশা বর্ণনাতীত হারে বৃদ্ধি পায়।

ইরাকের জন্য তেল রফতানী করা তেমন কঠিন ছিল না; কিন্তু জাতিসংঘের তরফ থেকে তার উপর শর্ত আরোপ করা হয় যে, তেল বিক্রির অর্ধেক অর্থ জাতিসংঘ তহবিলে জমা দিতে হবে। এই অর্থ দিয়ে জাতিসংঘ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ইরাকি জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের খেদমত আঞ্জাম দিতে চেয়েছিল। ইরাক জাতিসংঘের কাছে পাঁচ বছরের ছাড় দেওয়ার অনুরোধ জানায়, যা প্রত্যাখ্যান করা হয়। জাতিসংঘের পরিকল্পনার বিপরীত ইরাক সরকার তার তেলের আয় দিয়ে দেশের পুনর্গঠনের কাজ করতে চেয়েছিল। সেপ্টেম্বর ১৯৯১ ইরাক সরকার নিরাপত্তা পরিষদে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়, কালবিলম্ব না করে যদি এই মুহূর্তে ইরাক সরকার তেল রফতানী শুরু করে আর জাতিসংঘ তহবিলে এক পয়সাও না দেয় তাহলে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দেশটি ৬৫ বিলিয়ন ডলার অর্জন করতে সক্ষম হবে, যা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। ইরাকের আর একটি সমস্যা ছিল ঋণ পরিশোধ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উপায় খুঁজে বের করা। ১৯৯৫ সাল নাগাদ ইরাকের প্রয়োজন ছিল ২১৪ বিলিয়ন ডলার। এই সময়

পর্যন্ত ইরাক যদি জাতিসংঘ তহবিলে এক কানাকড়িও জমা না দিত তারপরও সে তেল বিক্রি থেকে উপার্জন করত ৬৫ বিলিয়ন ডলার। এই হিসেবে ইরাককে ভর্তুকি দিতে হয় ১৫৯ বিলিয়ন ডলার। কারণ ১৯৯৫ পর্যন্ত ইরাক ৬৫ বিলিয়ন ডলারের তেল বিক্রি করতে পারবে। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ইরাক ৬৫ বিলিয়ন ডলারের তেল বিক্রি করতে পারবে এটাও ছিল তাদের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। ইরাকের ধারণায় ১৯৯১ সালের দ্বিতীয় ষান্মাসিকে দেশটি প্রতিদিন ৬ লাখ ব্যারেল তেল উত্তোলনে সক্ষম হবে। ১৯৯৫ পর্যন্ত এই পরিমান গিয়ে দাঁড়াবে প্রতিদিন ২৯ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল। যেকোন কারণে হোক উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হবার পর সাত মাস পর্যন্ত ইরাক বহির্বিশ্বে তেল সরবারহ করতে পারেনি। ফলে, ইরাকি জনগণের মধ্যে এর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

২৭ শে সেপ্টেম্বর যখন ইরাকি জনসাধারণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে, তখন তারা তাদেরই আহমদী নামক সমুদ্রবন্দর থেকে দু'টি তেলে পরিপূর্ণ কুয়েতি অয়েল ট্যাংকারকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করতে দেখে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কুয়েত তেল রফতানী প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করে দিয়ছে। কুয়েতি তেলমন্ত্রী ড. হামুদ আল-রকাবার ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের তেল কূপগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার ফলে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তেল রফতানী করতে না পারার কারণে কুয়েতের ৭৫ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি য়েছে। তবে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, ইরাক কুয়েত দখল করে তার যে ক্ষতি সাধন করে সেই তুলনায় এই ক্ষতি ছিল খুব নগণ্য। কুয়েতের পুনর্গঠন প্রক্রিয়াও ছিল কল্পনাতীত আশাব্যঞ্জক। এর পিছনে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়ারদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। কুয়েত থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ইরাকি সেনারা কুয়েতের ৭৩০ টি তেলের খনিতে আগুন ধরিয় দেয়। দুইটি আমেরিকান কোম্পানি এসব তেল খনির আগুন নিভানোর কন্ট্রাক্ট নেয়। এছাড়া পরিবেশদূষণ থেকে পরিত্রাণের জন্য মার্কিন প্রযুক্তি কাজে লাগানো হয়। কুয়েতকে নতুন করে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান কোম্পানিগুলির সাথে যেসব চুক্তি হয় তার ফলে কুয়েত পুরোপুরি আমেরিকা-ইউরোপ নির্ভর হয়ে পড়ে। আগষ্ট ১৯৯০-এর পূর্বে কুয়েত তার স্বাধীন স্বকীয়তা বজায় রাখতে ছিল বদ্ধপরিকর; কিন্তু যুদ্ধের পর কুয়েতের জন্য স্বাধীনতা বজায় রাখা ছিল অসম্ভব। কারণ কুয়েতকে দখলদার সৈন্যমুক্ত করার ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলির সৈন্যরা সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে কুয়েত সরকারের জন্য তার প্রাক্তন

পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখা ছিল অসম্ভব। এই কারণে যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটবৃটেন তাদের কিছু সৈন্য কুয়েতে মোতায়ন রাখে। অথচ কুয়েত সরকার তাদের বিরুদ্ধে টু শব্দ পর্যন্ত করেনি। একথা ঠিক যে, কুয়েতের বিরোধীদলীয় নেতারা মাতৃভূমিকে বিদেশি সৈন্যমুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন; কিন্তু তাদের এই দাবি কখনও আন্দোলনের রূপ ধারণ করেনি, এমনকি কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি।

উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হবার পর সৌদি আরবে পূর্বের ন্যায় পশ্চিমা সৈন্য মোতায়ন রাখা হয়; কিন্তু এদের সংখ্যা কত সে সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত কোন তথ্য দেয়া হয়নি। কারণ, এটা একটি স্পর্শকাতর বিষয়। তবে ২৯শে এপ্রিল মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডিকচেনি তার এক বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করে বলেন, সৌদি সরকার নির্দেশ দেয়ার সাথেসাথে আমেরিকা সৌদি আরব থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য। সময়ের পরিবর্তনের সাথে বিশ্বের দৃষ্টি সৌদি আরবে মার্কিন সেনা উপস্থিতির প্রতি নিবদ্ধ না থেকে চলে যায় আরব-ইসরায়েল সমস্যার দিকে। বিশ্ববাসীর কামনা ছিল, এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে ঘটা করে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হোক। উল্লেখ্য, উপসাগরীয় সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণে আরব-ইসরায়েল সংকট নিষ্পত্তির ব্যাপারে সোভিয়ত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর কুটনৈতিক প্রচেষ্টা মাঝ পথেই বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য কুয়েত সমস্যাকে আরব-ইসরায়েল সমস্যার সাথে সংযুক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র মোটেই প্রস্তত ছিল না। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আরব মিত্রদেরকে প্রেসিডেন্ট বুশ একথা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, আরব-ইসরায়েল সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সে খুবই আন্তরিক; এ ব্যাপারে সে অতীতেও চেষ্টার ত্রুটি করেনি এবং আগামীতেও করবে না। মার্চ ১৯৯১ থেকে অক্টোবর ১৯৯১ পর্যন্ত জেমস বেকার আরব দেশগুলোর আটটি দেশ সফর করেন। এ সকল সফরের উদ্দেশ্য ছিল, আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের ইসরায়েলের সাথে আলোচনার টেবিলে একত্র করা। জেম্‌স বেকারের এসব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ, ইসরায়েলের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নীতিতে তেমন কোন বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত ছিল না। আমেরিকানদের ধারণায় উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নদিকে মোড় নিয়েছে। কারণ এই যুদ্ধে সিরিয়া ও মিশরের মত দু'টি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। অপরদিকে ইরাকের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে ইসরায়েল পাল্টা জবাব না দিয়ে মিত্রজোটের ঐক্য অটুট রাখতে সাহায্য করেছে।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, আরব ইসরায়েল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জেমস বেকারের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা কোন নতুন প্রচেষ্টা ছিল না। ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কয়কবার এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় একবার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও তুরস্কের সমন্বয় একটি বিচারবিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিকে এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই কমিটির য়েকটি সভা লুজানে অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল এসেম্বেলীর প্রস্তাব নং ১৮১ কে ভিত্তি বানিয়ে ঐ কমিটি তার কার্যক্রম চালাতে থাকে। জেনারেল এসেম্বেলীর প্রস্তাবে দু'টি স্বাধীন দেশের কথা বলা হয়। একটি হবে ফিলিস্তিনিদের, অপরটি ইহুদিদের। এই কমিটি উক্ত সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ব্যর্থতার একটি কারণ হলো, ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইহুদিরা আরবদের একটি বিরাট এলাকা দখল করে নেয়। জেনারেল এসেম্বেলীর প্রস্তাব যদি ইসরায়েল মেনে নিত তাহলে সে অনেক কম এলাকার অধিকারী হতো। এই যুদ্ধের মাত্র কিছুদিন পূর্বে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তখন তার বক্তব্য ছিল, আরব দেশগুলি মিলে তার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। মোটকথা, উক্ত কমিটি ১৯৫৭ পর্যন্ত তার কার্যক্রম চালায়। কমিটির প্রতিটি বৈঠকের রিপোর্ট জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বেলীকে পেশ করা হয়। মজার কথা হলো, এই কমিটির দ্বারা কোন কাজ হোক আর না হোক আজও তার অস্তিত্ব টিকে আছে, এখনও পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়নি। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব নং ২৪২ কে ভিত্তি করে এ ধরনের আরেকটি উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত প্রস্তাবে ইসরায়েলের উপর জোর দেয়া হয়, সে যেন অধিকৃত আরব ভূমি খালি করে দেয়। এছাড়া ঐ অঞ্চলের সকল দেশের উপর জোর দেয়া হয় যে, তারা যেন প্রত্যেকে একে অপরের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এই প্রস্তাবটি কার্যকর করার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট, ইংল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা ছিল ঐক্যবদ্ধ; কিন্তু একমাত্র ইসরায়েলের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে সকল প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। ইসরায়েল দখলকৃত আরব এলাকা খালি করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর এ ধরনের বহু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু এর প্রত্যেকটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। একথা ঠিক যে, ১৯৭৮ সালে মিসর ও ইসরায়েলের মধ্যে ক্যাম্পডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; কিন্তু তারপরও আরব-ইসরায়েল সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। আশির দশকেও কয়েকবার

শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা চালানো হয়; কিন্তু কোন সেসব ফলদায়ক হয়নি। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর অবস্থা খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আরব-ইসরায়েল সমস্যাকে কেন্দ্র করে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠান তখনও ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। মিঃ জেমস বেকার কর্তৃক আরব দেশগুলি সফরের সময় সিরিয়া সম্মেলনের পক্ষে মোটামুটি ইতিবাচক সাড়া দেয়।

সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ বরাবরই আমেরিকানদের সন্দেহের চোখে দেখেন; কিন্তু এবার তাঁর কাছে আমেরিকানদের আরব-ইসরায়েল সমস্যা সমাধানের ব্যাপারটি আন্তরিক মনে হয়। হাফেজ আল আসাদের মতে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যতীত এই সমস্যা সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। ওদিকে উত্তর আফ্রিকার পাশ্চাত্যপন্থী রাষ্ট্রগুলিও উক্ত সম্মেলনের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দেয়। তবে তাদের মাঝে তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি। মুয়াম্মার কাযাফীর (গাদ্দাফী) বক্তব্য ছিল, এধরনের সম্মেলন বয়কট করা উচিৎ। কারণ, তাঁর ভাষায়, এ ধরনের সম্মেলন সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাঁর আরো বক্তব্য ছিল, এ ধরনের সম্মেলনের অর্থ ইসরায়েলের সামনে আরবদের নত শিকার হওয়া। তবে অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানরা তাঁকে বাগে আনার চেষ্টা করেন এবং বুঝানো হয় যে, এই মুহূর্তে সম্মেলন বয়কট করা তার জন্য ঠিক হবে না; বরং প্রস্তাবিত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করাই লাভজনক। এই মুহূর্তে কেউ যদি সম্মেলনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে শান্তিপ্রক্রিয়ায় বাধা প্রদানকারী হিসাবে চিহ্নিত করবে। সময়ের তালেতালে আরব রাষ্ট্রগুলি নিজেদের দাবি-দাওয়া ভুলে সম্মেলনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে। আরবদের এই সম্মতি প্রকাশের একটি কারণ ছিল যে, কোন দেশই আগেভাগে সম্মেলনে অংশগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে অপরাধী বানাতে প্রস্তুত ছিল না। এছাড়া বলা হয়, তখন কোন আরব দেশ আমেরিকা বাহাদুরকে অসন্তুষ্ট করার মত পজিশনেও ছিল না।

বিশ্বের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের চাবিকাঠি আরবদের হাতে

যে কোন কারণেই হোক বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক আরব দেশ একথা স্বীকার করেছিল যে, প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন শান্তিপ্রতিষ্ঠায় মাইলফলকের কাজ করবে। সেই সাথে এই মুহূর্তে এটা যে একটা সাহসিকতাপূর্ণ উদ্যোগ এ ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। উক্ত সম্মেলন সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থাপনার কাজ বেকারের মধ্যপ্রাচ্য সফরের শেষদিনগুলিতে সেরে নেয়া হয়।

সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যেসব বিষয় সন্দেহের সৃষ্টি হয় সেগুলি দূর না করে মিঃ বেকার প্রস্তাবিত সম্মেলনের কার্যপ্রণালী ও কর্ম পদ্ধতি নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে থাকেন। এসব বিষয়ের প্রতিই তিনি সবচে' বেশি গুরুত্বারোপ করেন। কারণ, আরব-ইসরায়েল সংলাপ নতুন করে শুরু করাটাই একটা বিরাট সফলতা মনে করা হয়। জেম্‌স বেকারের প্রচেষ্টা তখন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয় যখন আমেরিকার কাছে ইসরায়েলকর্তৃক প্রদত্ত ১০ বিলিয়ন ডলারের আবেদনের দরখাস্তটি সাময়িকের জন্য ফেরত নিতে হয়। ইসরায়েল সরাসরি মার্কিন প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। এই অর্থ দিয়ে ইসরায়েল সরকার রাশিয়ান ইহুদিদের ইসরায়েলে পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিল। অপরদিকে আরবদের আশঙ্কা ছিল, এই অর্থ অধিকৃত আরব এলাকায় ইহুদিবসতি স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত হবে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইসলায়েলকে বলা হয়, যেন আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর দেশটি ১০ বিলিয়ন ডলারের দরখাস্ত পেশ করে; কিন্তু ইসরায়েল তার দাবিতে ছিল অনড়। ১২ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন, মার্কিন কংগ্রেস যদি ইসরায়েলের দেয়া ঋণের দরখাস্তটি মঞ্জুর করে তা হলে তিনি তার ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করবেন।

মিঃ বুশের উক্ত বিবৃতিটি ছিল একশ ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ, ইতিপূর্বে কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইহুদিদের বিরুদ্ধে এভাবে সরাসরি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেনি। পরে অবশ্য মার্কিন কংগ্রেস ইসলায়েলি দরখাস্তটির ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে, মিঃ বুশ তার ভেটো পাওয়ার প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত আরব বিশ্বে বাহবা পায়নি। কারণ, ইসলায়েলি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান না করে কংগ্রেস ঐ দরখাস্তের ব্যাপারে পরে চিন্তা-ভাবনা করা হবে বলে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাতে আরব নেতারা মোটেই সন্তুষ্ট হতে

পারেনি। সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিদের তুলনায় ইসরায়েলের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বুশের ভাবমূতি ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। তবে সার্বিকভাবে যদি মার্কিন নীতির পর্যালোচনা করা হয় তবে দেখা যাবে পূর্বের ন্যায় বুশের যুগেও মার্কিনীদের ইসরায়েল তোষণনীতি অব্যাহত থাকে। ১৮ই অক্টোবর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জেমস বেকার সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ বোরিস-পেংকিনের সাথে ইসরায়েলে সাক্ষাৎ করে আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে কীভাবে চূড়ান্ত রূপ দেয়া যায় সে ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন। এই সুযোগে ইসলায়েলি নেতারা উভয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে তাদের স্বার্থে দাবি মানিয়ে নেয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান। ফলে, জেমস বেকার সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েন। মিঃ বেকার ও ইসলায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আইজ্যাক কামিরের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসলায়েলি প্রধানমন্ত্রীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। মিঃ বোরিস পেংকিন তাঁর প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সফল হন। তার সফলতার কারণ হিসাবে ধারণা করা হয় যে, হয়ত সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসলায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন যে, প্রস্তাবিত সম্মেলনে অংকগ্রহণের উপর তাঁর দেশের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। ভিতরকার অবস্থা যাই থাক সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ইসলায়েলি প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের কয়েক ঘণ্টা পর ইসলায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের সম্মতি প্রকাশ করেন। মিঃ কামিরের এই ঘোষণা অনেককে অবাক করে দেয়। তার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ডানপন্থীদের ছোট ছোট দল কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করে। সম্মেলনের ইনভাইটেশন কার্ডে উভয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থাৎ মিঃ বেকার ও মিঃ পেংকিন স্ব-স্ব দেশের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে নিজেদের স্বাক্ষরসহ কার্ডগুলি বিতরণ করেন। এটা এজন্য করা হয় যে, যাতে বিশ্ববাসী বুঝতে পারে, সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উভয় পরাশক্তিই আন্তরিক।

এই সম্মেলনটি স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ ও ৩১শে অক্টোবর মাদ্রিদ সম্মেলনের শেষ দু'টি বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বুশ ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ বক্তৃতা করেন। উভয় নেতার বক্তৃতার সার কথা ছিল, আরব-ইসরায়েলের মাঝে দীর্ঘমেয়াদী সংলাপের সূচনা করা। অনেক আরব নেতা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র চায় এই সংলাপকে অন্তত এক বছর দীর্ঘায়িত করা হোক। অর্থাৎ, আমেরিকায় আগামী বছরের নির্বাচন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখাই ছিল প্রেসিডেন্ট বুশের আসল উদ্দেশ্য। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাঁচ বছর

মেয়াদী একটি অন্তর্বর্তীকালীন শান্তি ফর্মুলা পেশ করেন। মাদ্রিদ সম্মেলনে যদি আমেরিকার দেয়া এই প্রস্তাব মঞ্জুর করা হতো তাহলে আগামী বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিঃ বুশের জন্য উক্ত প্রস্তাবের সাফল্যকে সামনে রেখে যথেষ্ট ফায়দা লুটবার সম্ভাবনা ছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধের পর জর্ডানের প্রেসিডেন্ট হাসান একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের জন্য আরবদের কোন নতুন পথ খুঁজে বের করতে হবে; কিন্তু হাসান আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অনৈতিক উন্নতি ও অন্যান্য বিষয় আরবদের পূর্ণাঙ্গ ঐকমত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর ভাষায়, ইসরায়েলও আরবদেশের মধ্যে শান্তি আলোচনা, লেবানন সমস্যার সমাধান, নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরাণি¦^তকরণ, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রোগ্রামকে কার্যকর করা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি জর্ডানি প্রেসিডেন্টের দেয়া প্রস্তাব থেকে অনেক কিছুই গ্রহণীয় ছিল; কিন্তু তার আগে প্রয়োজন ছিল আরব দেশগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় একথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ অঞ্চলের আঞ্চলিক বিষয়ে নাক গলানো থেকে আমেরিকাকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। তেল সাপ্লাই বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই যুক্তরাষ্ট্র আরবদের ব্যাপারে নাক গলাবেই। এই পরিস্থিতিতে আরবরা কেবল এতটুকু করতে পারে যে, তারা আমেরিকা বাহাদুরকে আশ্বস্ত করে বলবে, তার জন্য তেল সাপ্লাই কোন অবস্থাতেই বন্ধ হবে না। আরবরা যদি আগামীতে আমেরিকার নাক গলানর সম্ভাবনাকে তিররাহিত করতে চায় তাহলে তাদের উচিত তেল বিক্রেতা ও ক্রেতাদের একটি কমিটি গঠন করা, যার কাজ হবে তেলের দাম নির্ধারণ করা ও তেল সাপ্লাই ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করা। যদি এই ধরনের কোন কমিটি গঠন করা সম্ভব হয় তাহলে এটা হবে উভয় পক্ষের জন্য কল্যানকর। মধ্যপ্রাচ্যের পারস্পরিক দ্বন্দ ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির অবশ্যবিভিন্ন কারণ রয়েছে তবে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর সেখানে মার্কিন সেনা উপস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির অন্যতম কারণ। অধিকাংশ আরবের ধারণা, তাদের অনেকগুলি সরকার মার্কিন প্রভাব বলয়র অক্টোপাশে আবদ্ধ। যুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনা উপস্থিতির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কিছুসংখ্যক আরব গোত্রপ্রধান ছাড়া অধিকাংশ আরব জনগণের অভিমত, ভিনদেশী সৈন্যদের আরব ভূখণ্ড ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

আগষ্ট ১৯৯০ থেকে মার্চ ১৯৯১ পর্যন্ত আরবদের সামাজিক জীবনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তা ঠিক করতে প্রচুর সময় দরকার। সামাজিক জীবন ছাড়াও শারীরিক ও আর্থিক জীবনও তাদের ক্ষত-বিক্ষত হয় পড়ে। কুয়েত দখলের খেসারত দিতে গিয়ে ইরাক মিত্রজোটের হামলায় যেভাবে ধবংস পরিণত হয় সে দৃশ্যও আরবদের জন্য বড়ই ভয়ংকর। আমেরিকানরা ভেবেছিল, ইরাকের আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ার পর এবং তার রাসায়নিক ও অন্যান্য অস্ত্রভাণ্ডার ধবংসাত হওয়ার পর আরবরাষ্ট্রগুলি নিজেদের চিন্তামুক্ত মনে করবে, তাদের এই ধারণাও ভুল প্রমাণিত হয়। আমেরিকানরা জানত না, আরবদের আত্মমর্যাদাবোধের ব্যাপার; কোন কিছুর বিনিময় তারা নিজেদের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেওয়ার জন্য মোটেই প্রস্তুত নয়। উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে কুয়েত তার স্বাধীনসত্তা বজায় রাখতে ছিল বদ্ধ পরিকর; কিন্তু যুদ্ধের পর আর সে সম্ভাবনা অবশিষ্ট রইল না। এখন সে পাশ্চাত্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। একারণে ইরাকের বিরুদ্ধে স্থল হামলার মাত্র পাঁচ দিন পর সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে করতে বাধ্য হয়।

আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ আরবদেশগুলোর বিরুদ্ধে বরাবরই এ অপবাদ দিয়ে এসেছে যে, তাদের ভেতর সন্দেহের প্রবণতা খুব বেশি; কিন্তু বাস্তব সত্য হলো এই যে, পাশ্চাত্য দেশগুলি ইসরায়েল ও আরবদের সঙ্গে কখনও সমতার ভিত্তিতে আচরণ করেনি, তারা সর্বদাই ইসরায়েলের পক্ষ টেনে কথা বলেছে। এমনসব ব্যাপারে তারা ইসলায়েলকে সমর্থন দিয়েছে, যেসব বিষয়ের সাথে আরবদের অস্তিত্ব ছিল নির্ভরশীল। কে না জানে আরব ও ইসরায়েলের সমরশক্তির ব্যাপারে আমেরিকার দুমুখোনীতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। একটি সাধারণ ধারণা অনুযায়ী এই মুহূর্তে ইসরায়েলের কাছে একশ' থেকে তিনশ' পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। অথচ আমেরিকার এ ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই, তার যত মাথাব্যথা ইরাকের পরমাণু শক্তির ব্যাপারে। যে কোন উপায়ে ইরাকের পরমাণু শক্তি ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয় ওঠে মার্কিন সরকার। অথচ ইসরায়েলের পরমাণু শক্তির সাথে ইরাকের পরমাণু শক্তির কোন তুলনাই হয় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা দোসররা সব সময় আরব-ইসরায়েল সংকটকালে নির্লজ্জভাবে ইসরালায়েলকে সমর্থন দেয়। তবে বর্তমান বিশ্বের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের আসল চালিকাশক্তি অফুরন্ত তেল। আর এই অস্ত্রের মালিক আরবরা নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখেছে।

অথচ তারা যদি চায়, আমেরিকা ও তার পশ্চিমা দোসরদের কুপোকাত করতে পারে নিমিষেই। তাদের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার মাত্র। আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থন ৭০-এর দশকে পাওয়া গেছে। তেলঅস্ত্র তখন গোটা বিশ্বকে নাজেহাল করে ছেড়েছে। ১৯৭৩-এর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে মিসরের বিজয় আমাদের এ দাবির আরেকটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ইরাক, কুয়েত দখল করে যদি মারাত্মক ভুল করে থাকে তাহলে সৌদি আরব ও অন্যান্য আরবদেশ যুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্য দেশসমূহকে নিজেদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আমন্ত্রণ জানিয়ে তার থেকেও মারাত্মক ভুল করেছে। এটা ঠিক যে, ইরাক কুয়েত দখল করে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে পশ্চিমাদের মাথা ঘামানোর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে; কিন্তু সেই সাথে এ কথাও ঠিক যে, সৌদি আরব ও কুয়েত চাইলে পশ্চিমারা মধ্যপ্রাচ্যে কখনো হাঁটু গেড়ে বসার সুযোগ পেত না। আরববিশ্ব যদি ইরাকের দাবির ব্যাপারে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে দেখত তাহলে ইরাক-কুয়েত সংকট নিষ্পত্তির উপায় খুঁজে বের করা তেমন কোন কষ্টসাধ্য কাজ ছিল না। যদি বলা হয়, এ সংকটকালে ইরাক যথেষ্ট স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছে তাহলে পাল্টা প্রশ্ন হিসাবে দ্বিধাহীন চিত্তে একথা বলা যায় যে, সৌদি আরব, কুয়েত, মিসর এবং সিরিয়াও কি কম স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়ছে? সৌদি আরবকে তার রাজতন্ত্রের খুঁটি উপড়ে যাওয়ার ভয় পেয়ে বসে আর মিসর তার ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মিত্রজোটে অংশগ্রহণ ছাড়া কোন উপায় খুজেঁ পায়নি। বাকি রইল সিরিয়া, সাদ্দামের সাথে ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে হাফেজ আল আসাদ ইসরায়েলের মুরুব্বি আমেরিকা ও তার পশ্চিমা দোসরদের সাথে হাত মিলানোর ভিতরই নিজের কল্যাণ দেখতে পান।

আমাদের এ বক্তব্যের সাথে অনেকে হয়ত একমত নাও হতে পারেন, কারণ প্রতিটি বিষয় অন্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। তবে একটা কথা সবাইকে স্বীকার করতেই হবে তা হচ্ছে, এই যুদ্ধে আমেরিকা আরবদের যেভাবে পুতুলনাচ নাচিয়েছে তা অনেককাল স্মরণ রাখার যোগ্য। কী আশ্চর্যের ব্যাপার দেখুন! উপসাগরীয় যুদ্ধ পুরোটাই লড়া হয়েছে আরবদের পয়সায়, এদিকে যুদ্ধের পুরো খেসারতও দিতে হয়ছে আরবদেরই। যুদ্ধের সকল ক্ষয়ক্ষতিও মাথা পেতে নিতে হয়েছে তাদেরকেই। অথচ যুদ্ধোত্তর সকল ফায়দা লুটছে আমেরিকা ও তার পশ্চিমা সহযোগী বন্ধুরা। কারণ, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কর্মকাণ্ডের সকল কন্ট্রাক্ট পেয়েছে পশ্চিমারা। যেকোন আরব-ইসরায়েল সমস্যার সময় যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল তোষণের পক্ষপাতদুষ্ট নীতি গ্রহণ করেছে। ইরাকের

ভুলটাকে সে খুব বড় করে দেখেছে আর সুযোগ পেয়েই অমনি ইরাকের সকল সমরশক্তি ধ্বংস করতে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। অথচ ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদী নীতির বিরুদ্ধে, তার উত্তর উত্তর সমরশক্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, যুক্তরাষ্ট্র কখনও টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

ইরাকের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের কুর্দি ও শিয়া বিদ্রোহীদের জন্য তার মায়া যেন উপচে পড়ে। অথচ কাশ্মীর ও বসনিয়ায় যখন মুসলমানদের উপর অত্যাচার চলতে থাকে, মুসলমান নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে যখন নির্বিচারে হত্যা করা হয় তখন আমেরিকা বাহাদুর যেন কিছু দেখেও দেখে না। শুনেও না শোনার ভান করে। তৃতীয় বিশ্ব; ও মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে আমেরিকার এই দুমুখো ও পক্ষপাতমুলক নীতি তাদের চোখু খুলে দেওয়ার ও সাবলম্বী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের গুরুত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ইরাকের ভুল পদক্ষেপ আর অন্যান্য আরব দেশের অদূরদর্শিতার কারণে পুরো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র জেঁকে বসার সুযোগ পেয়েছে। এখন দেখার ও চিন্তার বিষয় এই যে, বর্তমান শতাব্দীর ন্যায় একবিংশ শতাব্দীতেও গোটা বিশ্বের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে চালিকাশক্তি আরবদের তেল আমেরিকা কুক্ষিগত করে রাখে না আরবরা নিজেদের সমস্থ মতপার্থক্য ভুলে নিজেদের সম্পদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তা স্বাধীনভাবে ব্যবহারের সৌভাগ্য অর্জন করে।

সমাপ্ত

বই কেনার
সামর্থ্য
থাকলে
বইটি
কিনে পড়ুন

মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল আরব বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি ও পর্যবেক্ষক। তিনি ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল আহরাম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির ওপর বেশকিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্য : রাজনীতি যুদ্ধ বাস্তবতা বইটি তার এ বিষয়ের ওপর সপ্তম বই, যা ইংরেজি ভাষায় Illusions of Triumph: An Arab View of the Gulf War নামে প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের দৃষ্টিতে উপসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতি ও যুদ্ধ পরিস্থিতির ওপর লেখা সবচেয়ে সুন্দরতম বই এটি।

মুহাম্মদ হাইকল এ বইয়ে উপসাগরীয় যুদ্ধে আরবদের দ্বিধাভক্তি, ইরাকের বিরুদ্ধে মিত্র জোটের সামরিক হামলার পেছনের অন্তর্নিহিত কারণ, মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ে পশ্চিমা স্বার্থবাদী রাজনীতির সমীকরণ, আরব নেতাদের পারস্পারিক দ্বন্দ ও বোঝাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে তার কলম চালিয়েছেন। এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি উপসাগরীয় যুদ্ধনাটকের রহস্যভেদ করতে যথেষ্ঠ পরিশ্রম করেছেন। পশ্চিমা বিশ্লেষণ ও মিডিয়ার বক্তব্য থেকে যা সম্পূর্ণই আলাদা।

এসব যুদ্ধ কেন সংঘটিত হলো, কে কীভাবে বিজয় লাভ করল, বিজয়ের ধরণ ও প্রকৃতি কী ছিল, এসব বিষয়ের প্রতিও যথেষ্ঠ ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সবশেষে মধ্যপ্রাচ্যের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন-উত্তরের ক্লাইমেক্স পাঠককে হতাশ করবে না।

Cover: Masud Hossain | 01883-566747